তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৪২
রকিব হাসান
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৪২

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1436-7
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ. ২০০১
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-42
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা প্রকাশনী
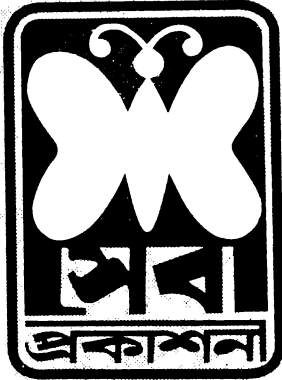
ছত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪১/-

তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োস্লো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩০/-

এখানেও ঝামেলা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

জানুয়ারির এক ঠাণ্ডা বিকেলে গোবেল বীচ রেল স্টেশনে চলেছে মুসা, রবিন আর জিনা। খুশিমনে লেজ দোলাতে দোলাতে আগে আগে হাঁটছে রাফিয়ান। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কত্তবড় বাহাদুর। মাঝে মাঝে ফিরে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ছে। বলছে যেন, 'আরে এত আস্তে কেন! সাগু খাও! ট্রেন চলে গেলে স্টেশনে গিয়ে লাভ নেই। দেখা যাবে আমরা গেলাম এক দিক দিয়ে, কিশোর চলে গেল আরেক দিক।'

কিশোরের আসার কথা আজ।

মুসা আর রবিন আগেই এসে বসে আছে জিনাদের বাড়িতে। মেরিচাচীর সঙ্গে তাঁর এক বোনের বাড়িতে যেতে হয়েছিল বলে কিশোরের আসতে দেরি হলো এবার।

তাকে এগিয়ে আনতে স্টেশনে চলেছে ওরা।

প্ল্যাটফরমে যখন ঢুকল, একটা ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এটাতে আসেনি কিশোর। পরেরটার অপেক্ষা করতে হবে।

ভীষণ ঠাণ্ডা। বাইরে থাকার চেয়ে ওয়েইটিং রুমে বসে থাকা অনেক আরামের। কিন্তু কুকুর ঢোকানো নিষেধ। বাধ্য হয়ে তাই রাফিয়ানকে প্ল্যাটফরমের একটা বেঞ্চের পায়ে বেঁধে রাখল জিনা। বাঁধতে হতে পারে ভেবে চেন নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

খাউ খাউ করে প্রতিবাদ জানাল রাফিয়ান। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ওকে একটু সহ্য করতে বলল জিনা।

মিনিটখানেক পর ওয়েইটিং রুমের জানালা দিয়ে দেখল ওরা, স্টেশনের বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। পেছনে থামল আরও একটা। সামনের গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে একজন লোক স্টেশনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা কুলিকে কাছে যেতে ইশারা করল।

কুলি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে লোকটা বলল, 'মাল নামাও। জলদি করো।'

জোরাল কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট শুনতে পেল গোয়েন্দারা।

সামনের গাড়ি থেকে দুটো সুটকেস বের করে দুই হাতে ঝুলাল কুলি। গাড়ি থেকে নামল সেই লোকটা। সঙ্গে একজন মহিলা। ফ্যাকাসে সোনালি চুল। মহিলার কোলে একটা ছোট পুডল জাতীয় কুকুর। ঠাণ্ডার ভয়ে কুকুরটাকে নিজের কোটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে মহিলা।

পেছনের গাড়ি থেকে নামল চার-পাঁচজন লোক। বেশভূষা ভাল। আগের

গাড়ির দুজনকে এগিয়ে দিতে এসেছে।

বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। ওয়েইটিং রুমের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল লোকগুলো কি করে। স্বাভাবিক কৌতূহল।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, জন?' মহিলা বলল, 'টিকেট নিয়ে এসো। গাড়ি চলে আসবে তো।'

একটা ট্রেন আসতে দেখে টিকেট কাউন্টারের দিকে দৌড় দিল লোকটা।

উত্তেজিত হয়ে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। চিৎকার করে জনকে তাগাদা দিচ্ছে জলদি করার জন্যে। আরও কাছে এলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'নাহ্, এটা আমাদের ট্রেন নয়। আরও কিছুক্ষণ তোর সঙ্গে থাকতে পারব রে, কোরি। তোকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।'

এত বেশি চেঁচামেচি শুরু করে দিল লোকগুলো, ওয়েইটিং রুমে আর থাকতে পারল না গোয়েন্দারা। জানালা দিয়ে দেখে মন ভরছে না। প্ল্যাটফরমে বেরিয়ে এল।

জনের পিঠে কষে এক থাপ্পড় মেরে বলল লাল চুল এক লোক, 'যেখানে যাচ্ছ, আশা করি ভালই থাকবে।'

এত আন্তরিকতা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল জনের জন্যে। কাশতে আরম্ভ করল।

'গিয়েই ফোন কোরো,' বলল এগিয়ে দিতে আসা এক মহিলা। 'তোমাদের জন্যে খারাপই লাগছে, সত্যি! এত পার্টি, এত আনন্দ, এত হই-চই...'

রাফিয়ানকে বেঁধে রাখা হয়েছে যে সীটটায়, তাতে গিয়ে বসল কুকুরওয়ালা মহিলা। কুকুরটাকে নামিয়ে দিল মাটিতে। ছাড়া পেয়েই গিয়ে রাফিয়ানের গা শুঁকতে আরম্ভ করল পুডলটা। সঙ্গে না নেয়াতে এমনিতেই রেগে আছে রাফিয়ান, মোটেও সহ্য করল না কুকুরটার শোঁকাশুঁকি। ঘাউ করে এমন এক হাঁক ছাড়ল, লাফ দিয়ে গিয়ে মহিলার পায়ের কাছে পড়ল খুদে কুকুরটা। প্রায় ছোঁ দিয়ে ওকে কোলে তুলে নিল মহিলা।

ঠিক এই সময় ব্যাপারটাকে আরও গোলমেলে করে দিতেই যেন বিকট গর্জন তুলে স্টেশনে ঢুকল ট্রেন। ভয়ে চোখ উল্টে দেয়ার জোগাড় হলো পুডলটার। দিশেহারা হয়ে লাফ দিয়ে মনিবের কোল থেকে নেমে পাগলের মত দিল দৌড়। চেনের কথা ভুলে তেড়ে গেল রাফিয়ান। গলায় লাগল হ্যাঁচকা টান। দম আটকে মরার অবস্থা। পুডলটাকে ধরার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল মহিলা, তার পায়ে পেঁচিয়ে গেল চেন। টানের চোটে উল্টে পড়ে গেল সে। আর্তনাদ করে উঠে চেঁচাতে শুরু করল, 'আরি, ধরো ধরো! ধরো না কোরিকে! মেরে ফেলল তো!'

ধরতে ছুটল মুসা আর রবিন। জিনা ছুটে গেল রাফির চেন খুলে দিতে। যে ভাবে পেঁচিয়ে গেছে, দম আটকে মরবে বেচারা।

মহিলা ওদিকে চিৎকার করেই চলেছে, 'আরে কে কোথায় আছ, পুলিশকে খবর দিচ্ছ না কেন এখনও! কেউ নেই নাকি! আরে আমার কুকুরটা গেল কোথায়!'

'আহ্, কি শুরু করলে, ক্লোরিন! থামো না!' মহিলাকে তুলতে এগিয়ে এল জন।

ট্রেনটা যে স্টেশনে ঢুকেছে খেয়ালই করছে না যেন কেউ, এমনকি গোয়েন্দারাও না। সবাই কুকুর দুটোকে নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং ট্রেন থেকে কিশোরকে নামতেও দেখতে পেল না।

জিনার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর।

ক্লোরিন আর জনের কাছে তখন ক্ষমা চাচ্ছে জিনা। রাফিয়ানকে মাপ করে দিতে বলছে। রাফিয়ানের কলার ধরে টেনে সরানোর চেষ্টা করছে মহিলার কাছ থেকে।

কোরিকে ধরতে না পেরে ফিরে এসেছে রবিন আর মুসা।

আচমকা জিনার হাত থেকে ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রাফিয়ান। খেক খেক করতে করতে ছুটে গেল কিশোরের দিকে।

'যাক,' হেসে বলল কিশোর, 'একজন অন্তত আমাকে চিনতে পেরেছে। কেমন আছিস, রাফি?'

কিশোরের গলা শুনে একসঙ্গে ফিরে তাকাল জিনা, মুসা আর রবিন। আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে রাফিয়ান। স্টেশন মাথায় তুলেছে। সামনের পা দুটো কিশোরের বুকে তুলে দিয়ে ওর গাল চেটে স্বাগত জানাল।

'কার কুত্তা ওটা?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল জন। 'অত বদরাগী কুত্তা জীবনে দেখিনি আমি! গায়ে তো দৈত্যের জোর। আমার স্ত্রীকে টান দিয়ে ফেলে দিল, ময়লা লাগিয়ে আমার কোটটার বারোটা বাজাল...এ কি জাতের কুত্তা! দাঁড়াও, পুলিশকে রিপোর্ট করছি আমি। আমাদের কুকুরটাকে তাড়া করেছে, আমার স্ত্রীকে ফেলে দিয়েছে...ওই যে, পুলিশ! এই মিস্টার, আসুন, আসুন তো এদিকে।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল গোয়েন্দারা। স্বয়ং ফগর‍্যাম্পারকট। নিশ্চয় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হই-চই শুনে দেখতে এসেছে। গোয়েন্দাদের দেখেই আঁচ করে নিল কি ঘটেছে। আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখে। দুই লাফে কাছে চলে এল।

'ঝামেলা! কি হয়েছে, স্যার?' রাফিয়ানকে দেখিয়ে জনকে বলল সে, 'নিশ্চয় এই শয়তান কুত্তাটা কিছু করেছে?'

লাফ দিয়ে তার হাতে বেরিয়ে এল নোটবুক আর পেন্সিল। খুশিতে বাগ বাগ। অভিযোগ পাওয়া গেছে আজ। কুকুরটাকে খোঁয়াড়ে ভরার এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয় সে।

ট্রেনটা কখন বেরিয়ে গেল, সেটাও খেয়াল করল না কেউ। অস্থির হয়ে পেন্সিলের পেছন কামড়াচ্ছে ফগ। প্ল্যাটফরমের সবাই পায়ে পায়ে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে গোয়েন্দা আর অভিযোগকারীদের।

ফগের সাড়া পেয়ে উত্তেজনা চরমে উঠল রাফিয়ানের। লাফ দিয়ে কিশোরের বুক থেকে পা নামিয়ে ছুটে গেল ফগের দিকে। তার বুকে পা তুলে দেয়ার জন্যে। তবে কিশোরের মত গাল চেটে স্বাগত জানাবে না, কানের কাছে হাঁক ছেড়ে ভড়কে দেবে। প্রথম দেখে যেদিন দিয়েছিল।

রাস্তায় হাঁটছিল সেদিন জিনা। পথের মোড় ঘুরে সাইকেলে চেপে আচমকা বেরিয়ে এল একজন পুলিশম্যান। জাম্বুরার মত গোল মুখ, পেটটা মোটা। সে যে গ্রীনহিলসের এক সময়কার বিখ্যাত পুলিশ কনেস্টবল হ্যারিসন ওয়াগনার

ফগরয়্যাম্পারকট ওরফে 'ঝামেলা', গোবেল বীচে বদলি হয়ে এসেছে, তখনও জানত না জিনা।

ব্রেক কষেও থামাতে পারল না ফগ। সাইকেল তুলে দিল রাফিয়ানের গায়ে। আর যায় কোথায়। প্রচণ্ড চিৎকার করে তার পায়ে কামড়ে দিতে গেল রাফি। সাইকেল নিয়ে গড়িয়ে পড়ল ফগ। সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ওর বুকে পা তুলে দিল রাফি। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার জোগাড়।

'ঝামেলা! আহ্, ঝামেলা! এই, সরো, ভাগো! অ্যাই, কুত্তা সরাও!' বলে চিৎকার করতে লাগল ফগ।

সরিয়ে আনল জিনা।

কোনমতে সাইকেলে চেপে পালাল ফগ। এরপর থেকে যখনই জিনা আর রাফিকে দেখে, ওদের দিকে গোলআলু চোখের অগ্নিবর্ষণ করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়ে সে। মনে মনে চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে কুকুরটার। কি করে খোঁয়াড়ে ভরে ওটার কবল থেকে নিস্তার পাওয়া যায় সেই সুযোগ খোঁজে। আজ পেয়েছে সুযোগ।

'অ্যাই, সরাও, সরাও!' চিৎকার করে উঠল ফগ। 'সরাও কুত্তাটাকে! ওর শাস্তি বাড়বে বলে দিলাম...'

তার চিৎকারকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ক্লোরিন, 'এসে গেছে, এসে গেছে, আমার কোরি এসে গেছে!...ক্রেগ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ!'

নাম যেমন অদ্ভুত, ক্রেগের চেহারাটাও তেমনি। পা টেনে টেনে হাঁটে। চর্বি থলথলে দেহ। মোটা ওভারকোটে ঢাকা ভারী, বেঢপ শরীরটাকে লাগছে একটা পিপার মত। গলায় জড়ানো স্কার্ফ। চোখে ভারী লেন্সের চশমা। টুপির সামনের দিকটা চশমার ওপর টেনে নামানো। কোলে করে আনছে কোরিকে।

'ঝামেলা!' ভুরু কুঁচকে ক্রেগের দিকে তাকাল ফগ। তার গোলআলু চোখে বিস্ময়। 'কে ও?'

'ও আমাদের ক্রেগ,' ক্লোরিন বলল। 'সী বীচ রোডে যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম আমরা, ওটার কেয়ার টেকার।'

কুকুরটাকে কোলে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করে আবার ক্রেগের হাতে তুলে দিয়ে বলল মহিলা, 'ভালমত দেখো কিন্তু। কোন কষ্ট যেন না হয় ওর। যা যা বলে গেলাম, ঠিক সেইমত করবে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসার চেষ্টা করব। যাও, চলে যাও এখন। ট্রেন এলে শব্দ শুনে আবার ভয় পাবে।'

একটা কথাও না বলে কুকুরটাকে হাতে নিল ক্রেগ। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা তার বিশাল কোটের নিচে। পা টেনে টেনে গেটের দিকে এগিয়ে চলল সে।

অধৈর্য হয়ে উঠল ফগ। হাতে ধরা নোটবুকে পেন্সিল ঠুকে রাফিয়ানকে দেখিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, এটার কথা বলুন এবার।...আগে আপনার নাম-ঠিকানাটা, প্লীজ!'

'ওহ্! ওই যে, আমাদের ট্রেন এসে গেছে!' কনুইয়ের গুঁতোয় ফগকে সরিয়ে এগিয়ে দিতে আসা বন্ধুদের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করল ক্লোরিন। তারপর ট্রেনে উঠে পড়ল।

জোরে জোরে হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো বন্ধুরা। মহিলাও তুমুল বেগে হাত নেড়ে তার জবাব দিল।

'ঝামেলা!' প্রচণ্ড হতাশায় ঝটকা দিয়ে নোটবুক বন্ধ করে ফেলল ফগ। ভুরু কুঁচকে তাকাতে গেল কুকুরটার দিকে।

কিন্তু রাফি তখন নেই ওখানে। তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে। এগিয়ে চলেছে গেটের দিকে।

দুই

'ভাগ্যিস এক্কেবারে সময়মত এসে হাজির হয়েছিল ট্রেনটা!' রাস্তায় নেমে বলল মুসা।

'ফগটাও মরতে আসার আর জায়গা পেল না!' মুখ কালো করে বলল জিনা। 'গ্রীনহিলস থেকে বদলি হয়ে একেবারে গোবেল বীচ! তোমাদের "ঝামেলা" এবার আমার আর রাফির কপালেও এসে জুটল।'

'তা জুটল,' মাথা দোলাল রবিন। 'গ্রীনহিলসে ছিলাম আমরা, সে তো বহুকাল আগে। এতদিন পর ঝামেলাটা যে আমাদের পেছন পেছন গোবেল বীচেও এসে হাজির হবে, কল্পনাই করিনি কখনও!'

'লুকিয়ে পড়া দরকার,' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রবিন, 'সাইকেলে আসবে। আমাদের দেখলে আবার কোন্ ঝামেলা বাধায় কে জানে!'

'ইস্, ঝামেলা বাধাবে!' ঝাঁঝিয়ে উঠল জিনা। 'আসুক না খালি কিছু করতে...'

'থাক,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'শুধু শুধু ঝামেলা বাধিয়ে লাভ নেই...'

রাস্তার মোড়ে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল। রবিনের কথাই ঠিক। ফগ আসছে। সামনে একটা পরিত্যক্ত ছাউনি দেখে তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। রাফিয়ানকে চুপ করে থাকতে বলল জিনা।

জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল ওরা, শাঁই শাঁই প্যাডাল ঘুরিয়ে যেন উড়ে চলেছে ফগ। বোধহয় ওদেরকে ধরার জন্যেই। ধরতে পারলে দশটা কটু কথা শোনানোর লোভে। ওর সে আশায় গুড়ে বালি। মুচকি হাসল কিশোর।

ফগ চলে গেলে ছাউনি থেকে বেরোল ওরা।

কিশোর বলল, 'কি হয়েছিল, বলো তো? কি নিয়ে হই-চই করছিলে তোমরা?'

সব কথা খুলে বলল রবিন।

'এহ্হে, মিস করলাম!' আফসোস করে বলল কিশোর, 'ট্রেনটা যদি আরেকটু আগে আসত!' রাফির দিকে তাকাল সে, 'তবে, রাফি, তোকে কিন্তু বাহবা দিতে পারছি না। ওরকম ভীতুর ডিম একটা খুদে কুকুরকে তাড়া করতে গিয়ে কাজটা তুই ভাল করিসনি। কাপুরুষের কাজ।'

যেন কিশোরের কথা বুঝতে পেরে লজ্জা পেল রাফিয়ান। মুখ নিচু করে, জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে নীরবে হেঁটে চলল।

'দু'চারদিন ফগের সামনে পড়া চলবে না আমাদের,' হাঁটতে হাঁটতে বলল

রবিন। 'অত সহজে ভুলবে না ও। রাফিকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে। বলা যায় না, কোন ছুতোনাতা করে আজ রাতেই চলে আসতে পারে জিনাদের বাড়িতে।'

কিন্তু রাতে এল না ফগ। পরদিন সকালেও রাস্তায় বেরিয়ে দেখা পাওয়া গেল না তার। অবাক হলো গোয়েন্দারা। তবে কি বদলে গেছে ফগ? গ্রীনহিলসের সেই কুচুটে স্বভাবটা আর নেই তার?

সাগরের কিনার দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। জানুয়ারির চমৎকার সহনীয় রোদ। প্রচুর সী-গাল উড়ছে।

একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গেটের ভেতরে চোখ পড়তে কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'দেখো দেখো, ওই কুত্তাটা না? কাল স্টেশনে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড হলো?'

গেটে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল সবাই। ভালমত দেখে গম্ভীর হয়ে মাথা দুলিয়ে বলল মুসা, 'পুডলই, তবে এটা নয়। ওটা আরও ছোট।'

'এক্ষুণি প্রমাণ করে দেয়া যায় ওটা নাকি,' কিশোর বলল। 'ওটার নাম কি ছিল, কোরি না?' কুকুরটার দিকে তাকিয়ে চুটকি বাজিয়ে জোরে জোরে ডাকল সে, 'এই কোরি, কোরি!'

মুহূর্তে কান খাড়া করে ফেলল কুকুরটা। দৌড়ে এল গেটের কাছে। রাফিয়ানকে দেখে কুঁকড়ে গেল।

কিন্তু আজ আর খারাপ কিছু করল না রাফিয়ান। গেটের কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করে ডাকতে লাগল পুডলটাকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে সন্দেহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল খুদে কুকুরটা। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল গেটের কাছে। শিকের ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে ওটার নাক চেটে দিল রাফিয়ান। পুডলটাও ওর নাক চেটে দিল। ব্যস, ভাব হয়ে গেল।

'রাফি আজ এত তাড়াতাড়ি খাতির করে ফেলল যে?' অবাক হয়ে বলল রবিন।

'কাল কিশোরের কথায় লজ্জা পেয়েছে আরকি,' হেসে বলল মুসা। 'তাই আজ মিটমাট করে নিল।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিনা, 'উঁহু, তা নয়। কাল ইচ্ছে করে গণ্ডগোল করেনি রাফি। ওকে বেঁধে রেখে না গেলেই আর এই অঘটন ঘটত না।...কিন্তু পুডলটা এমন মন খারাপ করে আছে কেন?'

'মালিক নেই তো, আদর করার কেউ নেই,' রবিন বলল। 'যার হাতে ওকে দিয়ে গেছে মহিলা, লোকটাকে আমার একদম পছন্দ হয়নি। দেখেই মনে হয়েছে, লোক ভাল না।'

'আমারও না,' কিশোর বলল। 'বেশি দেখিনি, তবে যতটুকুই দেখেছি, যথেষ্ট।...থাকে কোনখানে? এ বাড়িতেই নাকি? ওই যে ওদিকের ওই কটেজটায়?'

বাগানের ধারে ছোট একটা বাড়ি দেখা গেল। যত্নটত্ন তেমন নেয়া হয় মনে হলো না। ওটার কাছ থেকে খানিক দূরে বেশ বড় একটা বাড়ি। সম্ভবত ওটাতেই ভাড়া থাকে কোরির মালিক সেই মহিলা, যার নাম ক্লোরিন। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, তারমানে বাড়িতে এখন নেই কেউ। তবে কটেজের চিমনি দিয়ে একনাগাড়ে ঘন ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নিশ্চয় গলায় মাফলার পেঁচিয়ে. কোট গায়ে দিয়ে

কুঁজো হয়ে এখন আগুনের সামনে বসে আছে ক্রেগ। দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারল সবাই।

কোরির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো রাফিয়ানের সঙ্গে খেলতে চায়। দৌড়ে সরে যাচ্ছে, পরক্ষণে লাফাতে লাফাতে এসে দাঁড়াচ্ছে আবার গেটের কাছে। রাফিয়ানের নাক চেটে দিয়েই লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে। যেন ওকে ভেতরে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

গেটের গায়ে আঁচড়াতে শুরু করল রাফিয়ান। সে-ও ঢুকতে চাইছে।

'থাক থাক, রাফি, চুপ!' বাধা দিল জিনা। 'তোর আর ঢোকা লাগবে না। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলা বাধিয়েছিস। ফগ দেখলে সর্বনাশ করে ফেলবে।'

সরে আসার জন্যে ঘুরেছে ওরা, কটেজ থেকে ডাক শোনা গেল, 'কোরি! এই, কোথায় তুই? জলদি আয় এখানে!'

এক দৌড়ে গিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল কোরি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

'গেল কোথায় শয়তানটা?' গজগজ করে বলল কণ্ঠটা। পা টেনে টেনে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ক্রেগকে। আগের দিনের পোশাকগুলোই পরা। গলায় মাফলারটা নেই শুধু।

খুঁটিয়ে দেখছে কিশোর। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। ভারী, মোটা ভুরু ছোটখাট দুটো ঝোপের মত হয়ে আছে। টুপির নিচ দিয়ে ঘাড়ের পেছনে বেরিয়ে থাকা চুলের অর্ধেকের রঙ ধূসর। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। তাকানো দেখেই বোঝা যায় চোখে কম দেখে।

'কোরি! কোরি! হারামীটা গেল কোথায়!' অস্থির হয়ে উঠেছে লোকটা। 'দাঁড়া, আগে ধরে নিই। তারপর বোঝাব মজা। চাবকে আজ সব ছাল না তুলেছি তো আর কি বললাম…'

তীক্ষ্ণ আরেকটা কণ্ঠ শপাং করে আছড়ে পড়ল যেন চাবুকের মত। 'জর্জ! কোথায় গেলে? আলুগুলো কেটে দিয়ে যেতে বললাম না।'

'আরে আসছি, রাখো!' সমান তেজে জবাব দিল ক্রেগ। 'হারামী কুত্তাটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। কই গেল কে জানে!'

'এজন্যেই গেট বন্ধ রাখতে বলি। দেখো বেরিয়ে গেল কিনা। হারালে বিপদে ফেলে দেবে।'

বেরিয়ে এল মহিলা। রোগা-পাতলা শরীর। ঢলঢলে স্কার্টের ওপর লাল শাল জড়িয়েছে। অদ্ভুত চুল। হাঁ করে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা। আসল চুল, নাকি পরচুলা? পাটের আঁশের মত রঙ। অতিরিক্ত কোঁকড়া। বিশ্রী লাগছে।

'পরচুলাই হবে মনে হয়,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'টেকো নাকি?'

চেহারাটাও ভাল না মহিলার। তার ওপর পরেছে বেঢপ সাইজের একটা কালো সানগ্লাস। ঘন ঘন কাশছে। গলার সবুজ স্কার্ফটা চিবুকের ওপর টেনে দিল। হাঁচি দিল একসঙ্গে গোটা পাঁচ-ছয়েক।

'জর্জ ক্রেগ! ঘরে চলো। এই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে বকবক করে সর্দিটা আর বাড়াতে পারব না। এসো।'

ঝোপে লুকিয়ে থাকা কুকুরটাকে দেখে ফেলল ক্রেগ। হাত ঢুকিয়ে ঘাড় চেপে ধরল ওটার। আতঙ্কে কোঁ-কোঁ শুরু করল কুকুরটা। বেরোতে চাইছে না।

রাগে গজরাতে লাগল ক্রেগ, 'আয়, ঘরে আয়, মজা কাকে বলে আজ টের পাবি! একটা হাড্ডিও আস্ত রাখব না!'

'শুনুন,' আর কথা না বলে পারল না কিশোর, 'এত ছোট একটা প্রাণীকে মারবেন কেন শুধু শুধু?'

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্রেগ। লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখতে লাগল ওদের। এতক্ষণ লক্ষ করেনি। গরগর করে উঠল রাফিয়ান।

'অ তোমরা,' কঠিন কণ্ঠে বলল ক্রেগ। 'কাল স্টেশনে তোমাদের কুকুরটাই না গোলমাল বাধিয়েছিল? মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট কাল দেখা করে গেছে আমার সঙ্গে। তোমাদের বাঘা কুত্তাটাকে হাজতে ঢোকানোর একটা ছুতো খুঁজছে হন্যে হয়ে...যাও, ভাগো এখন। আমি কি করব না করব সেটা তোমাদের এসে বলে দিতে হবে না। যাও। ফাজলেমি করলে সোজা গিয়ে ফগের কাছে রিপোর্ট করব বলে দিলাম।'

লোকটার কণ্ঠস্বর পছন্দ হলো না রাফিয়ানের। গরগরানি বেড়ে গেল। জিনাও গেল রেগে। পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল, গণ্ডগোলের ভয়ে তাড়াতাড়ি রাফিয়ানকে ধমক দিল কিশোর, 'এই, থাম্! চুপ কর্!'

চুপ হয়ে গেল রাফিয়ান।

কোরিকে বেড়াল ছানার মত ঘাড় ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে চলল ক্রেগ।

নিচু স্বরে রবিন বলল, 'এই লোকটা আর ফগ মিলে রাফিকে ফাঁসানোর শিওর কোন মতলব করছে। সুযোগ দিলে আর ছাড়বে না।'

'ভাল জোড়া তৈরি হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল জিনা। 'কিন্তু আমাকে ওরা চেনে না। রাফিকে কিছু করতে এসে দেখুক না খালি...'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, জিনা। রাফি বেআইনী কিছু করে বসলে ওকে বাঁচাতে পারব না। চলো, যাইগে। এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের।'

গেটের কাছ থেকে সরে এল ওরা। রাস্তায় উঠতে যাবে, এই সময় কানে এল কুকুরের আর্তনাদ। কোন সন্দেহ নেই, কোরিকে পেটাচ্ছে ক্রেগ।

আবার গরগর শুরু করল রাফিয়ান।

থমকে দাঁড়াল জিনা। 'সত্যি সত্যি হাড্ডি ভেঙে দেবে নাকি?'

'না দিলেও কম করবে না,' মুসাও রেগে গেছে। পারলে ঢুকে গিয়ে ক্রেগকে বাধা দেয়। রবিনও মুখ কালো করে ফেলেছে।

কিন্তু মাথা গরম করল না কিশোর। বলল, 'চলো, এখানে আমাদের কিছু করার নেই। ভাবছি, ফগের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করব। যদিও মনে হয় না ওকে বলে কোন লাভ হবে।'

তিন

বাড়ি ফিরে জানা গেল ফগ ওদের খোঁজ করেছিল। আগামী দিন সকাল দশটায় তার

অফিসে গিয়ে দেখা করতে বলেছে ওদেরকে।

আসতে না আসতেই পুলিশের খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। অবাক হলেন না কেরিআন্টি। তবে কৌতূহল দমাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুলিশ তোদের দেখা করতে বলে কেন?'

স্টেশনে কি হয়েছিল, খুলে বলল জিনা।

'অন্যায়টা তো তাহলে রাফিরই,' আন্টি বললেন। 'মহিলাটি কে?'

'জানি না। সে আর তার স্বামী বোধহয় কোথাও বেড়াতে গেছে। স্টেশনে পাঁচ-ছয়জন লোক ওদের এগিয়ে দিতে এসেছিল। সী বীচ রোড দিয়ে গেলে হাতের ডানে একটা বাড়ি পড়ে, জনসন হাউস; ওয়াগনারদের পরের বাড়িটা। ওটাতে থাকে।'

'ও, ওরা!'

'মনে হয় চেনো?'

'বাড়িটার আসল মালিক জনসনরাই। মিসেস ওয়াগনারের কাছে শুনলাম, জনসনরা শহরে চলে যাওয়ার পর ওই নতুন লোকগুলো এসে ভাড়া নিয়েছে। আচার-আচরণ ভাল না। প্রায়ই হুল্লোড় করে পার্টি দেয়। রাতের বেলা বোট নিয়ে বেরিয়ে যায়। শুনেছি, বাড়ি ভাড়া, বোটের ভাড়া কোনটাই দিতে চায় না। অনেক টাকা বাকি পড়েছে। কি যেন নাম ওদের?...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হুফার।'

'হুঁ। জন হুফার আর ক্লোরিন হুফার।...সে যাই হোক, ফগের কাছে ওরা কোন রিপোর্ট করেনি। আমাদের সামনেই তো ট্রেনে উঠে চলে গেল।'

'শুনেছি,' আন্টি বললেন, 'ওরা সিনেমায় অভিনয় করে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। চতুর্থ শ্রেণীর অভিনেতা। বড় কিছু না। কিন্তু ওরা যদি কুকুরের ব্যাপারে রিপোর্ট করে না গিয়ে থাকে ফগ তোদের যেতে বলবে কেন?'

'সেটা গেলেই বোঝা যাবে। তবে কোন শয়তানির মতলব যদি করে থাকে, ফগের কপালে দুঃখ আছে, এটা বলে দিলাম।'

আঁতকে উঠলেন কেরিআন্টি। 'না না! খারাপ কিছু করিসনে! পুলিশের সঙ্গে...'

'পুলিশ বলেই অন্যায় করবে নাকি?'

'আগে করুকই না...'

'ফগের যা স্বভাব-চরিত্র,' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর, 'ও করবে। আমাদের সঙ্গে তো আর নতুন পরিচয় নয়। গ্রীনহিলসে যখন থাকতাম, আমার একটা কুকুর ছিল, টিটু। ওর সঙ্গে কি কম করেছে। কুকুর দু'চোখে দেখতে পারে না ও। বাগে পেলে রাফিকেও ছাড়বে না।'

'কি করে সেটাই দেখতে চাই আমি!' ফোঁস ফোঁস করতে লাগল জিনা।

পরদিন সকালে দশটা বাজার আগেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চার গোয়েন্দা। না না, পাঁচ। রাফিও আছে সঙ্গে। পাশে পাশে দৌড়ে চলল সে। ওর যাতে বেশি পরিশ্রম না হয় সেজন্যে সাইকেল আস্তে চালাল ওরা।

যে বাড়িটাতে থাকে ফগ, সেটাতেই ওর অফিস। ফাঁড়িটার দায়িত্বে আছে ফগ। কোন সহকারী নেই। সে একাই কাজ করে। গ্রীনহিলসের মত। তার বস

শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশানের অফিস কয়েক মাইল দূরের রেডহিল টাউনে।

ফগের বাড়ির সামনে এসে সাইকেল থেকে নামল সবাই। সামনের দরজায় টোকা দিল কিশোর।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে দিল এক মহিলা। ফগের কাজ করতে আসে। বাড়িঘর পরিষ্কার করে, রান্না করে দেয়।

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট আছেন?' ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন সকাল দশটায়।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'ঠিক দশটা বাজে এখন।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মহিলা। 'তাই নাকি? তিনি তো নেই। আধঘণ্টা আগে খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। হয়তো এখুনি চলে আসবেন। তোমাদের যখন দেখা করতে বলেছেন তখন...'

'তাহলে তাঁর অফিসে বসি আমরা?'

'কিন্তু ওখানে তো মূল্যবান জিনিসপত্র আছে...জরুরী কাগজ, ফাইল...আমাকেই ঢুকতে দেন না মিস্টার ফগ,' তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'থুড়ি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। ধুলো পড়ে সাদা হয়ে থাকে। ঝাড়তে দেন না।'

'তাহলে আর কি। বারান্দায়ই দাঁড়াই। উফ্, কি গন্ধরে বাবা! তামাকের মনে হচ্ছে। আজকাল কি পাইপ টানার বাবুগিরি ধরেছেন নাকি মিস্টার ফগ...থুড়ি, ফগর‍্যাম্পারকট। দরজাটা খোলা রেখেই দাঁড়াতে হবে। বাতাস আসুক।'

'ঠিক আছে, থাকো,' বারান্দায় থাকতে দিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করছে মহিলা। 'আমি বাগানে আছি। কাপড় রোদে শুকাতে দেব। মিস্টার ফগ...থুড়ি, ফগর‍্যাম্পারকট এলে তাঁকে বলব তোমাদের কথা।'

'আচ্ছা।'

মহিলা চলে গেল।

ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে সবাইকে আসতে ডাকল কিশোর।

চারপাশে তাকাতে লাগল ওরা। বারান্দায় দাঁড়িয়েই হলঘরের ভেতরটা দেখা যায়। ম্যানটেলপিসের ওপর রাখা বড় একটা ছবি। তাতে বাবা-মা আর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে রয়েছে ফগ। ছোটবেলার।

'খাইছে!' হেসে ফেলল মুসা। 'এক্কেবারে তো কোলাব্যাঙ। ছোটবেলায়ও কম মোটকা ছিল না ফগ। চোখ দুটো খুলে নিলে মার্বেল খেলা যেত।'

'ভাতিজার সঙ্গে ওর অস্বাভাবিক মিল,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'আমি ববের কথা বলছি।'

'কেবল স্বভাবে অমিল। ববটা চাচার মত এত পাজি না।'

'বব এখন আছে কোথায় কে জানে,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কিশোর, গত বড়দিনে না তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। গোবেল বীচে আসবে-টাসবে নাকি?'

'এবারের ছুটিতেই তো আসার কথা। এখানে জিনাদের বাড়ি আছে শুনে তো লাফিয়ে উঠল। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমরা কবে আসছি।'

গেটে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল। দরজার কাছে এসে ভেতরে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল ফগ। বিড়বিড় করে বলল, 'ঝামেলা!' ধমকে উঠল

পরক্ষণে, 'এই, এখানে কি তোমাদের!'

'কেন, আপনি না আসতে ফোন করেছেন,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'ঠিক দশটায় এসে বসে আছি আমরা, মিস্টার ফগ···মানে, দাঁড়িয়ে আছি, মিস্টার ফগ-র‍্যাম-পার-কট।' ফগকে রাগানোর জন্যে ইচ্ছে করে নামটা ভেঙে ভেঙে বলল সে।

ঠিকই রাগল ফগ। ঘোঁৎঘোঁৎ করে কি বলল বোঝা গেল না।

আগের মতই কণ্ঠস্বরটাকে নিরীহ রেখে বলল কিশোর, 'আপনি তো কথা দিলে কথার ঠিক রাখেন। দশটায় এসে পেলাম না যখন, শুনলাম তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছেন, বুঝলাম জরুরী কোন কাজে গেছেন। জনসনদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?'

গোল চোখ দুটো আরও গোল হয়ে গেল ফগের। 'তুমি জানলে কি করে?'

'অনুমান। স্রেফ অনুমান। রাফিকে ফাঁসানোর জন্যে আপাতত ওদিকেই ঘোরাফেরাটা একটু বেশি হওয়ার কথা আপনার। আপনাকে তো চিনি···'

'ঝামেলা! ওহ্, গড, এই বিচ্ছুগুলো গোবেল বীচেও এসে হাজির হবে জ্বালাতে, কে জানত!' টকটকে লাল হয়ে গেল ফগের গাল।

ফগের কথা যেন কানেই যায়নি এমন ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'কাল নাকি কুকুর নিয়ে স্টেশনে কি একটা গণ্ডগোল হয়েছিল? রাফিকে কামড়াতে গিয়েছিল কোরি নামে হুফারদের একটা বাঘা কুত্তা···'

'উল্টোটা বলছ কেন?' চেঁচিয়ে বলল ফগ। 'কোরিকে কামড়াতে গিয়েছিল রাফি! আর কোরিটা বাঘা নয়, ছোট্ট একটা পুডল।'

'ও, তাই নাকি। তাহলে তো খুবই অন্যায় করে ফেলেছে রাফি। ওর শাস্তি হওয়া উচিত···'

'ইয়ার্কি মারছ নাকি! ফাজলেমি হচ্ছে!' ফেটে পড়ল ফগ।

'না না, সত্যি বলছি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। ইকটুও ইয়ার্কি না।' মিনতির সুরে বলল কিশোর, 'এবারের মত ওকে মাপ করে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও এ রকম শয়তানি করবে না রাফি।'

কিশোরের মিনতিটা আসল না অভিনয়, বুঝতে পারল না ফগ। তবে নরম হয়ে এল কিছুটা। দুচোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। 'হুফারদের কথা তো জানো দেখছি। অবশ্য তোমার অজানা থাকে না কোন কিছুই। ছবিটার কথা কি কি জানো?'

মনে মনে চমকে গেল কিশোর। ছবি! কিসের ছবি! রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেল সে। কোনও ছবির কথা যে সে জানে না, বুঝতে দিল না ফগকে। তাহলে আর কথা আদায় করতে পারবে না। ওই স্রেফ বোবা হয়ে যাবে ফগ।

গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল কিশোর, 'জানি, তবে খুব বেশি কিছু না। আপনি যতটুকু জানেন ততটুকুই।'

তাতেই খুশি হলো ফগ। কিশোর যে ওর চেয়ে বেশি জানে না, শুনে সন্তুষ্ট হলো। এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল। রাফির ওপর স্থির হলো দৃষ্টিটা। তারপর আবার কিশোরের দিকে ঘুরল। মাথা কাত করে বলল, 'ঠিক আছে, যাও,

দিলাম এবারকার মত মাপ করে। তবে ভবিষ্যতে আর যেন কোন শয়তানি না করে কুকুরটা। যাও এখন, বেরোও। আমার অনেক কাজ আছে।'

'কাজটা কি হুফারদের ব্যাপারে? আমাদের বললে সাহায্য করতে পারতাম…'

'তোমাদের কোন সাহায্য লাগবে না আমার। আমি একাই পারব। তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, পুলিশের কাজে নাক গলাতে এসো না এবার। আরও একটা কথা মনে রেখো, এখানে ক্যাপ্টেন রবার্টসন নেই যে তোমাদের কথা শুনবেন…'

'ক্যাপ্টেন নেই,' ফস করে বলে বসল জিনা, 'কিন্তু শেরিফ আছেন।'

'মানে?' চোখের পাতা সরু করে তাকাল ফগ।

'শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান। আমার বাবার বন্ধু। শেরিফ আঙ্কেল ডাকি আমরা তাঁকে। গোবেল বীচে অনেকগুলো রহস্যের সমাধানে তিনি সহায়তা করেছেন আমাদের।'

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ফগ। হতাশ ভঙ্গিতে ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। বিড়বিড় করে বলল, 'উফ্, বড্ড ঝামেলা!'

চার

জনসনদের বাড়িতে কি রহস্য আছে, সারাটা দিন সেই আলোচনাতেই মেতে রইল গোয়েন্দারা। কিছু জানতে পারল না। রবিন পরামর্শ দিল, ওবাড়িতে গিয়ে ক্রেগের সঙ্গে কথা বলার। নাকচ করে দিল কিশোর। বোঝা যাচ্ছে ফগের সঙ্গে খাতির করে নিয়েছে ক্রেগ। ওরা গেলেই ফগকে খবর দেবে। কোন কথাই ফাঁস করবে না।

ঘটনাটা কি, জানার জন্যে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ওদের। নাস্তার টেবিলে এসে খবরের কাগজের হেডিং দেখেই চিৎকার করে উঠল রবিন, 'এই দেখো, কি লিখেছে!'

হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে এল সবাই। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজের ওপর। যা লিখেছে তার সারমর্ম:

বিখ্যাত গ্যালারি থেকে অমূল্য ছবি চুরি গেছে। চোরদের প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিল পুলিশ। শেষ মুহূর্তে ওদের ফাঁকি দিয়ে জাল কেটে বেরিয়ে গেছে চোর। ওদের কুকুরটাকে ফেলে গেছে। হুফারদের সন্ধানে সমস্ত এলাকা চষে ফেলছে পুলিশ।

টেবিলে নাস্তা রাখতে এসে খবরটা কেরিআন্টির নজরেও পড়ল। ভুরু কুঁচকে ফেললেন তিনি। 'দেখো কাণ্ড! হুফাররা তাহলে এই! লোকে যা অনুমান করে তার কিছু না কিছু ঠিক হয়েই যায়। আসলেই খারাপ বলে গোবেল বীচে কেউ ওদের দেখতে পারত না।'

নাস্তার পর বাগানে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

জিনা বলল, 'রহস্য তাহলে একটা পেয়েই গেলাম।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর, 'তাই তো মনে হচ্ছে। ছবিটা খুঁজে বের করতে পারলে একটা কাজের কাজ হত।'

'কিন্তু কোথায় পাবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'চোরেরা তো পালিয়েছে।'

'দুজন গেছে। আমার ধারণা, সহকারী রেখে গেছে এখানে। ভাবছি, ক্রেগ আর ওই বদমেজাজী মহিলাটার সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা।'

'গেলেই কি আর ওরা আমাদের সঙ্গে কথা বলবে?'

গেটের দিকে তাকিয়ে খুফ্ খুফ্ করে হাঁক ছাড়ল রাফি।

ফিরে তাকাল সবাই।

'আরি, একি!' রীতিমত চমকে গেছে জিনা, 'এ তো পিচ্চি ফগ!'

সবার আগে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা, 'খাইছে! বব!'

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে হাসিমুখে এগিয়ে এল ববর‍্যাম্পারকট। কাছে এসে মুখের হাসিটা আরও ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'চলেই এলাম।' জিনার দিকে তাকাল, 'তুমি নিশ্চয় জিনা?' হাতে বড় একটা প্যাকেট। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও, ক্রিসমাস প্রেজেন্ট। তোমার জন্যে আমি নিজে বানিয়েছি।'

হাত মেলানো, পিঠ চাপড়ানো শেষ হলে কিশোর বলল, 'তুমি আসাতে খুশি হয়েছি, বব। জব আর পাব কেমন আছে?'

'ভাল।'

'জব কি এখনও টফি চোষে?' জানতে চাইল মুসা।

'চোষে, তবে পিটুনি খেয়ে খেয়ে অনেক কমিয়েছে।'

'আঁ আঁ করে এখনও, তাই না?'

'করে, মাঝে মাঝে। টফিতে মুখ আটকে গেলে তখন আর কি করবে?'

'তা বটে,' মাথা দোলাল মুসা। 'তোমার কবিতা লেখার বাতিক আছে নাকি এখনও?'

'বাতিক' বলাতে একটুও মন খারাপ করল না বব। তবে আগের মত আর কবিতার কথায় মুখও উজ্জ্বল হলো না। মাথা নেড়ে বলল, 'এখনও লিখি মাঝে মাঝে। তবে কম।'

ববের ব্যাপারে তিন গোয়েন্দা যতখানি জানে, না দেখেও জিনাও ততখানিই জানে, ওদের মুখে শুনে শুনে। 'ভিনদেশী রাজকুমারের' যে গল্পটাতে ববের ভাই জব আর পাব ছিল, সেটাও তার মুখস্থ। তাই আলোচনায় যোগ দিতে কোন অসুবিধে হলো না। বলল, 'কালকেই তোমার কথা হচ্ছিল, বব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমার চাচার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে তোমার চাচার ছোটবেলার একটা ছবি দেখে তোমার কথা মনে পড়ল ওদের,' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল জিনা। 'তোমার চাচার ছোটবেলার চেহারা আর তোমার চেহারা অবিকল এক।'

'দূর, চাচার চেহারার সঙ্গে কে মেলাতে যায়!' হাসি সামান্য কমল ববের, তবে উত্তেজনা বাড়ল, 'ওখানে গিয়েছিলে কেন? কোন রহস্য পেয়েছ নাকি?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'কি রহস্য পেলে!' উত্তেজনা বেড়ে গেল ববের।

ছবি চুরির কথা জানানো হলো ওকে। ক্রেগ আর রোগাটে মহিলার কথা

জানাল। স্টেশনে গিয়ে যে কোরিকে নিয়ে গোলামাল হয়েছে, সেটাও বলা হলো।

ঘন ঘন ঢোক গিলে বব তাকাল জিনার দিকে, 'এক গ্লাস পানি খাওয়াবে? আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এসেই এ রকম একটা রহস্যের খবর শুনব, ভাবতেই পারিনি।'

পানি আনতে ঘরে চলে গেল জিনা। জগ আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল।

পানি খেয়ে গলার শুকনো ভাবটা কাটিয়ে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিল বব।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার চাচার ওখানে উঠেছ নাকি?'

'মাথা খারাপ!' আঁতকে উঠল বব। 'ওর মাইলখানেকের মধ্যে যেতে রাজি নই আমি। স্টেশনে নেমে খোঁজ করলাম পেয়িং গেস্ট কারা কারা রাখে। চমৎকার একটা জায়গা পেয়ে গেলাম। এক মহিলার বাড়ি। তার ওখানে উঠেছি। ক্রিসমাসে বেড়ানোর জন্যে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে জমিয়েছি। খরচের অসুবিধে হবে না।'

'ইচ্ছে করলে আমাদের এখানে এসেও থাকতে পারো,' জিনা বলল। 'পয়সা লাগবে না।'

'সে তো জানিই। এখন তো এক জায়গায় উঠেই পড়েছি। ঠেকায় পড়লে তখন দেখা যাবে।...তোমার উপহারটা দেখলে না? পছন্দ হলো নাকি জানা দরকার।'

'এখুনি খুলছি।'

প্যাকেট খুলতে শুরু করল জিনা। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। রাফি ভাবল কোন খাবার-টাবার হবে বুঝি। তার চোখে আগ্রহ বেশি।

প্যাকেট খুলতে বেরোল খুদে একটা কাঠের টেবিল। ছয় ইঞ্চি টপ।

হেসে বলল বব, 'স্কুলের কার্পেন্ট্রি ক্লাসে আমি নিজের হাতে বানিয়েছি। ভাল নম্বর পেয়েছি এটার জন্যে। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে নতুন পরিচয় হবে। ক্রিসমাসে নতুন কিছু দেয়া দরকার, যেটা কখনও তুমি পাওনি।...পছন্দ হয়েছে?'

'খুউব। সত্যি একটা নতুন জিনিস দিয়েছ তুমি। থ্যাংক ইউ।'

কথাবার্তা আর আলোচনা সব এরপর একটা ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রইল—ছবি চুরি আর হুফার-ক্রেগদের রহস্যময় আচরণ।

'তাহলে বুঝতেই পারছ, বব,' কিছুক্ষণ আলোচনার পর বলল কিশোর, 'কোন্‌টা ধরে যে এগোব, এখনও বুঝতে পারছি না। কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল বব, তবে হতাশ হলো না। 'নেই, তো কি হয়েছে? পাওয়া যাবে। তুমি যখন আছ, সূত্র আর লুকিয়ে থাকবে কতক্ষণ?...ক'টা বাজে? ঘড়ি ফেলে এসেছি। লাঞ্চের সময় বেঁধে দিয়েছে মিসেস ঠুস, এরপর গেলে আর পাওয়া যাবে না...'

'মিসেস ঠুস! এটা আবার কেমন নাম হলো?' হাসতে লাগল মুসা। 'মিসেস ঠুস! মিসেস ঠুস!'

'ঠুস ঠুস' করতে লাগল সবাই। হাসাহাসি চলল। রাফি কি বুঝল কে জানে। বোধহয় ভাবল যোগ দেয়া দরকার। খেঁক খেঁক করে কুকুরে-হাসি হাসতে লাগল।

'এতকাল ধরে আছি এখানে,' হাসতে হাসতে বলল জিনা, 'কিন্তু ওরকম অদ্ভুত নামের কোন মহিলা যে থাকে, জানতাম না। বাড়িটা কোনখানে?'

'মিসেস ঠুসও ভাড়া বাড়িতে থাকে। হাই চিমনিতে মিসেস ওয়াগনার নামে এক মহিলার কটেজে। মিস্টার ঠুস মিসেস ওয়াগনারের মালীর কাজ করে। পাব আর জবের বয়েসী দুটো মেয়েও আছে ওদের, টিন আর ঢিন। পরিবারে খাওয়ার লোক অনেক, কিন্তু আয় কম, তাই মিসেস ঠুস পেয়িং গেস্ট রেখে...' কিশোরের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল বব, 'অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?'

'কি নাম বললে? ওয়াগনার?'

'হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে?'

'তুমি যে এসেই এ রকম একটা সাহায্য করে বসবে, কে জানত! ওয়াগনারদের পড়শী জনসনদের বাড়িটা কারা ভাড়া নিয়েছিল জানো? হুফাররা। তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে খুব সহজেই নজর রাখা যাবে বাড়িটার ওপর...'

'বলো কি! তারমানে ক্রেগদের ওপর নজর রাখতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'উফ্, কি সাংঘাতিক একটা কাজ পেয়ে গেলাম! খুশিতে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে! উফ্, কোন্ শুভক্ষণে যে থাকার জন্যে ঠুসদের ঘরটা বেছে নিয়েছিলাম...' উত্তেজনা আর আনন্দে আরেকবার সবার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে লাগল বব। এমনকি রাফির থাবা ধরে ঝাঁকানোও বাদ রাখল না। গোল গোল চোখ দুটো আরও গোল হয়ে গেছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে বোয়াল মাছের মত। ঝাঁকানো শেষ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি যাব আর আসব। খেয়ে আর একটা সেকেন্ডও দেরি করব না। কি কি করতে হবে আমাকে, বোলো তখন।'

পাঁচ

দুটো দিন কেটে গেল। কিছু ঘটল না আর। নতুন কিছু আর জানতে পারল না গোয়েন্দারা। জনসন হাউসের ওপর সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে বব। পাতাবাহারের বেড়ার কাছে উঁচু, ঘন ডালপালাওয়ালা একটা গাছ পেয়ে গেছে সে। ওটাতে উঠে বসে থাকে। সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছে টিন আর ঢিনকে। গাছ বাওয়ার ওস্তাদ মেয়ে দুটো। গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেয়ে ববের ভক্ত হয়ে গেছে ওরা। মনে মনে তাকে রীতিমত হিরো বানিয়ে বসে আছে।

কিন্তু একটুও এগোতে পারেনি বব। যা দেখেছে, যা জেনেছে, আগে থেকেই জানে তিন গোয়েন্দা। কোরিকে ধরে নিষ্ঠুরের মত পেটায় ক্রেগ আর ওই রোগাটে মহিলা। দেখে শুনে ববের ধারণা হয়েছে মহিলা মিসেস ক্রেগই হবে। তার চুলটা যে আসল নয়, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া গেছে।

নিয়মিত এসে তিন গোয়েন্দার কাছে রিপোর্ট করে বব।

তৃতীয় দিনও যখন দেখল খবরের কাগজে নতুন কিছু লেখেনি, সেই পুরানো খবর—পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হুফারকে, আর বসে থাকতে রাজি হলো না কিশোর।

উধাও হয়ে গেছে হুফাররা।

কিশোরের ধারণা, কুকুরটাকে যে রকম ভালবাসে মিসেস হুফার, ওটাকে চিরকালের জন্যে ফেলে যেতে পারবে না। নিতে আসবেই। ওরা অভিনেতা। ছদ্মবেশে এসে হাজির হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং কড়া নজর রাখা দরকার।

তবে সবার আগে একটু তদন্ত হওয়াও দরকার।

বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে লাগল সে। লম্বা এক টুকরো কাপড় দিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধল। গোঁফ লাগাল, গালের মধ্যে প্যাড ঢোকাল, দুমড়ানো একটা ওভারকোট পরল, ঢোলা, অতিরিক্ত ময়লা একটা পুরানো প্যান্ট পরল। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল নিজের চেহারা, কোথাও খুঁত আছে কিনা। তারপর বেরিয়ে এল নিচে।

হলঘরে বসে আছে মুসা, রবিন, জিনা আর রাফিয়ান। কেরিআন্টি রান্নাঘরে। জিনার বাবা মিস্টার পারকার নিজের ঘরে গবেষণায় ব্যস্ত।

সিঁড়ি বেয়ে কিশোরকে নামতে দেখেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।

'কে আপনি? বাড়িতে ঢুকলেন কি করে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'আমি একজন বিদেশী,' ভারী ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জবাব দিল কিশোর। 'বাড়ি হিমালয়ের গোড়ায় এক অখ্যাত গাঁয়ে। আলাউদ্দিনের আশ্চর্য চেরাগ আছে আমার কাছে। দৈত্য এসে আলগোছে নামিয়ে দিয়ে গেছে দোতলার ঘরে।'

কণ্ঠস্বর চেনা না গেলেও কিশোরের বলার ঢঙে চিনে ফেলল সবাই।

'খাইছে! কিশোর!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ছদ্মবেশ নিয়েছ কেন? যাবে নাকি কোথাও?'

'হ্যাঁ। আর কত বসে থাকব। যাই, হুফারদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। ক্রেগের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে কিছু জানে।'

'আমরা আসব?'

'না। তাহলে আর ছদ্মবেশ নেয়ার অর্থ কি? তোমাদের তো চিনেই ফেলবে।'

সামনে দিয়ে বেরোলে যদি কেরিআন্টি কিংবা জিনাদের কাজের বুয়া আইলিনের চোখে পড়ে যায়, শুরু হবে চেঁচামেচি, হট্টগোল। সেজন্যে জানালা গলে চুপচাপ সটকে পড়তে চাইল কিশোর। কিন্তু তা-ও কেরিআন্টির চোখে পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'কে গেলরে! চোর নাকি?' রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলেন হলঘরের দরজায়। 'এই, লোকটা যে বেরোল দেখলি না? চোরই তো মনে হলো।'

তাড়াতাড়ি বলল জিনা, 'না না, চোর হবে কেন? আমাদের এক বন্ধু। জেটির ধারে দেখা হয়েছিল। আসতে বলেছিলাম...'

'পাগল নাকি লোকটা? জানালা দিয়ে বেরোয়!'

'ও খানিকটা খেপাটে স্বভাবেরই।'

'হুঁ! কোত্থেকে কি সব পাগল-ছাগল বন্ধু জোগাড় করিস না তোরা!...সাবধান, দেখিস, তোর বাবার চোখে যাতে না পড়ে।'

'না না, পড়বে না। তুমি যাও তো এখন।'

কিশোর ওদিকে একদৌড়ে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠেছে। কেরিআন্টির চিৎকার ঠিকই শুনেছে সে, কিন্তু দাঁড়ায়নি। বাইরে এসেই সাগরপাড়ের রাস্তা ধরে

দ্রুত হেঁটে চলল। জনসনদের বাড়ির কাছে পৌছতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। সামনের বিশাল গেটটার কাছে না গিয়ে চলে এল পেছনের ছোট গেটটার সামনে, যেটা দিয়ে সৈকতে বেরোনো যায়।

নির্জন সৈকত। কাউকে চোখে পড়ল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে গেট টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল বিরাট প্রাসাদটার দিকে। নিঃসঙ্গ, শূন্য বাড়ি। শীতকালেও চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। কেমন মরা মরা লাগে দেখতে।

সামনে যে জানালাটা পড়ল, সেটা দিয়েই ভেতরে উঁকি দিল। বড় একটা ঘর। ঘরের ঠিক মাঝখানে বড় একটা টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। সব কিছুতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। টেবিলে রাখা গামলার মত বড় ফ্লাওয়ার ভাসে প্রচুর ফুল, শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিশোরের নজর। ঘরে চেয়ার-টেবিল আরও আছে। একটা টুল কাত হয়ে পড়ে আছে। ওটার পাশে পড়ে আছে ধূসর রঙের একটা অদ্ভুত জিনিস।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর।

জিনিসটা কি?

হঠাৎ বুঝে ফেলল। রবারের তৈরি নকল হাড়। কোরির খেলনা। বসে বসে চোষার জন্যে।

ঘরে আর কিছু দেখার নেই। জানালার কাছ থেকে সরে এল সে। একটা গোলাপ ঝাড়ের ধার দিয়ে চলে অন্যপাশে আসতে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে ক্রেগ। হাতে এক আঁটি জ্বালানি কাঠ।

কিশোরের চেয়েও বেশি চমকে গেল ক্রেগ। এতটাই, হাত থেকে পড়ে গেল কাঠগুলো।

কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো আবার আতঙ্কিত ক্রেগের হাতে তুলে দিল কিশোর। তারপর বিদেশী ভঙ্গি নকল করে বলল, 'এক্সকিউজ মী, প্লীজ! হুফারদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি। ওরা আমার পুরানো বন্ধু। ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম দরজা-জানালা সব বন্ধ। কাউকেই চোখে পড়ল না। আপনাকে তো ভাল মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। আমার বন্ধুরা কোথায় গেছে বলতে পারবেন?'

'চলে গেছে। পেপার দেখেননি? ওরা খারাপ লোক। আপনার বন্ধুরা ভাল লোক নয়।'

'খারাপ লোক?' অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর। 'কোথায় গেল?'

'কোথায় গেছে জানি না। তবে গেছে, এটুকু জানি,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল ক্রেগ। সেই একই পোশাক পরনে। চশমার লেন্সের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। চোখে সন্দেহ।

'অপরিচিত কাউকে এখানে ঢুকতে দিই না আমরা,' ক্রেগ বলল। কিশোরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে পরাস্ত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ করেই মনে পড়ল পুলিশ বলে গেছে, অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দেখলেই নাম-ঠিকানা রেখে দিতে। বলল 'আপনার নামটা বলে যান। বিদেশী, তাই না? কোথায় উঠেছেন?' পকেট

থেকে একটা ময়লা নোটবুক বের করল সে। কাঠগুলো আবার মাটিতে ফেলে দিয়ে আরেক পকেট ঘেঁটে বের করল একটা পেন্সিল, তিন-চতুর্থাংশই শেষ হয়ে গেছে ওটার।

'আমার নাম দুর্গেশ্বর মরণেশ্বর গুরুতর সিং,' কিশোর বলল। 'বাড়ি ইন্ডিয়ায়। হোঙ্গাবং জেলার আটিরং গাঁয়ের ভাটিচং দুর্গে।'

কোনমতেই নামটা উচ্চারণ করতে পারল না ক্রেগ। ইংরেজি বানানটা বিদেশীকে জিজ্ঞেস করার জন্যে মুখ তুলে দেখে সে নেই। কোনখানেই দেখা গেল না আর ওকে।

ভীষণ বিরক্ত হলো ক্রেগ। পুলিশ এসে তার শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। নইলে কে যেত ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে অপরিচিত লোকের সঙ্গে বকর বকর করতে। হুফারের সঙ্গে যে-ই দেখা করতে আসত, বলে দিতে পারত সে নেই। ব্যস, ঝামেলা খতম।

বয়লার হাউসটার কথা ভেবে কষ্টে ভরে গেল মনটা। কবে যে আবার জনসনরা আসবেন, আবার চালু হবে বয়লার! চালু থাকলে এখন গরম বয়লার হাউসে বসে আরাম করে খবরের কাগজ পড়তে পারত। কাজ নেই কর্ম নেই, শীতের মধ্যে বসে বসে একটা খুদে কুত্তার খবরদারি করো, তা-ও মালিকের নয়, তার ভাড়াটের! কিন্তু করতেই হবে। উপায় নেই। চাকরি চাকরিই।

একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ক্রেগকে দেখতে লাগল কিশোর। পা টেনে টেনে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে সে। ওকে অনুকরণ করা সহজ। ওই পোশাক পরে ছদ্মবেশ নেয়া আরও সহজ। ক্রেগের অনুপস্থিতিতে ক্রেগ সেজে এসে সহজেই ফাঁকি দিতে পারবে ওর স্ত্রীকে। কথা আদায়ের চেষ্টা করতে পারবে।

ঢুকেই যখন পড়েছে, বাড়িটার কোথায় কি আছে ভালমত না দেখে যাবে না। ছাউনি, গ্রীনহাউস, বয়লার হাউস, সামার হাউস, কোনখানে উঁকি দেয়া বাদ রাখল না সে। সাবধান রইল যাতে কারও চোখে না পড়ে যায়।

ও যখন ঘোরাঘুরি করছে, ওই সময় আরও একজন এসে হাজির হয়েছে। ফগর‍্যাম্পারকট। কটেজে বসে জেরা করছে ক্রেগের বউকে। কাশির জ্বালায় প্রায় কথাই বলতে পারছে না মহিলা। খক্-খক্ খক্-খক্ করে কেশে চলেছে। কাশি যদিও বা কোনমতে একটু থামে, তখন হাঁচি চলতে থাকে একের পর এক। সেইসাথে গোঙানি তো আছেই।

ফগ ছাড়াও আরও দুজনকে দেখতে পেত কিশোর, যদি বেড়ার ওপাশে পাশের বাড়ির উঁচু ফার গাছটার ডালের দিকে তাকাত। দুই জোড়া চোখ কড়া নজর রাখছে এ বাড়ির ওপর। টিন আর ঢিন। দুই ঘণ্টা ধরে গাছে বসে আছে ওরা। বব ওদেরকে পাহারায় লাগিয়ে দিয়ে সাইকেলের দোকান থেকে ভাড়া করে আনা পুরানো সাইকেলটার ব্রেক মেরামত করছে।

গেট ডিঙানোর সঙ্গে সঙ্গে কিশোরকে দেখে ফেলেছে টিন। কনুইয়ের গুঁতো মেরে বোনকে দেখিয়েছে। তারপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও ওর ওপর থেকে চোখ সরায়নি দু'বোন। ঠিকমত রিপোর্ট দিতে হবে ওদের বব-ওস্তাদের কাছে। কোন রকম ভুলচুক হওয়া চলবে না। স্পষ্ট বলে দিয়েছে বব, ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে

চাকরি খতম, সহকারীর পদ থেকে বাদ দিয়ে দেবে। বেতন ছাড়া বিনে পয়সাতেই খাটছে ওরা। বব যে ওদের দয়া করে কাজে লাগিয়েছে এতেই কৃতজ্ঞ হয়ে গেছে।

ছয়

তাড়াহুড়া করে নামতে গিয়ে আরেকটু হলে গাছ থেকেই পড়ে যাচ্ছিল টিন আর ঢিন। দৌড়ে এসে ঢুকল ছোট ছাউনিটায় যেটাতে সাইকেল মেরামতে ব্যস্ত বব।

'বব!' কেউ যাতে না শোনে সেজন্যে ফিসফিস করে বলল টিন। কিন্তু ফিসফিসানিটাও এত জোরে হয়ে গেল, বাগানে যে-ই থাকত, শুনে ফেলত। 'একটা লোককে দেখে এলাম!'

ঝট করে সোজা হলো বব, 'কে? কোথায়?'

চোখ বড় বড় করে, হাত নেড়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে জনসনদের বাগানে দেখা বিদেশী লোকটার কথা ববকে বলতে লাগল দুই বোন।

সবটা শোনার ধৈর্য হলো না আর ববের। ছাউনি থেকে বেরিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে এসে নামল জনসনদের বাগানে। পা টিপে টিপে কটেজটা ঘুরে চলে এল সামনের দিকে। দরজার দিকে চোখ পড়তেই ধড়াস করে উঠল বুক। আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে লাগল হাত-পা। কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস ক্রেগের সঙ্গে কথা বলছে তার চাচা ফগর্যাম্পারকট।

ফগও দেখে ফেলল ভাতিজাকে। দুজনকে দেখে দুজনের চোখই বড় বড় হয়ে গেল। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন মাঝারি সাইজের দুই জোড়া গোলআলু। এত জোরে গর্জে উঠল ফগ, ভীষণ চমকে গিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল মিসেস ক্রেগ। আর ববের পায়ে যেন শেকড় গজিয়ে গেছে।

রাজকীয় চালে হেলেদুলে এগিয়ে এল ফগ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো অসহায় কাঠবিড়ালীকে গিলে খেতে আসছে ভয়ানক অজগর।

'ঝামেলা!' অবশেষে বেরিয়ে এল ফগের মুখ দিয়ে। 'এখানে কি তোর? এলি কোত্থেকে? আয় আমার সঙ্গে। আরও প্রশ্ন আছে।'

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না বব। আর কিছু শোনার অপেক্ষাও করল না। আচমকা ঘুরেই দিল দৌড়। অন্ধের মত ছুটতে গিয়ে পড়ল ক্রেগের গায়ের ওপর। ধাক্কা লেগে ক্রেগের হাত থেকে কাঠগুলো পড়ে গেল আবার। সে-ও পড়তে পড়তে বাঁচল। খপ করে হাত চেপে ধরল ববের। 'অ্যাই ছেলে, অ্যাই, অ্যাই!'

'ছাড়বেন না! ধরে রাখুন!' হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বলল ফগ।

মোড়ামুড়ি করে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল বব। পারল না। পৌঁছে গেল তার চাচা। কাঁধ চেপে ধরে এত জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল, ববের মনে হলো ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে।

'এখানে কি?' গর্জে উঠল ফগ। 'বল্ জলদি! নিশ্চয় ওই কোঁকড়াচুলো বিচ্ছুটাও এসেছে! কোথায় ও?'

'ও আসেনি।'

'তাহলে কে এসেছে?'
'একজন বিদেশী এসেছে, মিস্টার ফগ,' ক্রেগ বলল।
'ফগর‍্যাম্পারকট!' চেঁচিয়ে বলল ফগ।
'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট! বিদেশী লোকটা...কি যে একটা খটমটে নাম বলল...দর্গা গরতর সিং।'
'আগে বলনি কেন?' ধমকে উঠল ফগ। 'কোথায় ও?'
'বলার সুযোগ পেলাম কোথায়?'
ববের হাতের রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ককিয়ে উঠে বলল, 'ছাড়ো, চাচা। আমিও ওর পেছনেই লেগেছি। ধরতে সাহায্য করব তোমাকে।'
'তুইও পেছনে লেগেছিস মানে?' এমন করে চতুর্দিকে তাকাতে লাগল ফগ, যেন বাগানটা বোঝাই হয়ে আছে বিদেশীতে।
'ছেড়ে দিন ছেলেটাকে,' ক্রেগ বলল। 'ছোটরা বড়দের চেয়ে অনেক বেশি ছোটাছুটি করতে পারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। লোকটাকে যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে, ও-ই পারবে।'
জোরে এক ঝাঁকানি দিয়ে ফগ বলল, 'পারবি তো? মনে রাখিস, শয়তানি করলে ধরে এনে এমন চাবকান চাবকাব, জিন্দেগীভর মনে রাখবি।'
'শয়তানি করব না।'
ঝোপ থেকে ঝোপে ঘুরে বেড়াতে লাগল বব। মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে এ রকম সব জায়গায় উঁকি দিতে লাগল। শেষে পেছনের একটা ঝোপের মধ্যে দেখতে পেল একটা ছায়ামূর্তিকে। বিচিত্র পোশাক পরা মূর্তিটা নিঃশব্দে বেরিয়ে এগিয়ে চলল পেছনের গেটের দিকে। চাচাকে ডাকবে কি ডাকবে না দ্বিধা করতে করতেই অনেকখানি এগিয়ে গেল মূর্তিটা।
ঠিক করল বব, ডাকার আগে পিছু নেবে। কোথায় যায়, কি করে, দেখে গিয়ে কিশোরকে জানাবে। কাজের কাজ হবে। এখন চাচাকে ডাকলে আর ধরে ফেললে লোকটা কোনখান থেকে এসেছে, কোথায় যায়, জানতে পারবে না। তা ছাড়া ধরার সমস্ত কৃতিত্বটাও তার চাচাই নিয়ে নেবে। তা নিক। কিছু যায় আসে না ববের। তবে আগে জানতে হবে...

সাগরপাড়ের রাস্তা ধরে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছে কিশোর। বুঝতেই পারেনি তার পিছু নিয়েছে বব আর ফগ। তবে বেশিক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকল না। টের পেয়ে গেল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখল না। একটা ঝোপ নড়তে দেখল সামান্য। যা বোঝার বুঝে নিল সে। একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে দৌড় দিল বাড়ির দিকে। ফগ পিছু নিয়ে থাকলে কোনমতেই তার হাতে ধরা পড়া চলবে না।
মূর্তিটাকে জিনাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখল বব। ফগ অনেক পেছনে থাকায় দেখতে পেল না। কাছে এসে ভাতিজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গেল? ধরলি না কেন?'
নীরবে হাত তুলে জিনাদের বাড়িটা দেখাল বিমূঢ় বব, 'ওখানে ঢুকেছে।'

সোজা এসে জিনাদের বাড়ির দরজায় থাবা মারতে শুরু করল ফগ।
দরজা খুলে দিল আইলিন।
গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফগ, 'কিশোর পাশা আছে বাড়িতে?'
জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল আইলিন, 'দরজায় এত জোরে আপনি থাপ্পড় দিয়েছেন?'
'ঝামেলা!···আঁ, বোধহয় দিয়েছি! জোরে হয়ে গেছে, না? সরি!' মিস্টার পারকারকে চেনা আছে তার। ওই বদমেজাজী বিজ্ঞানীকে এড়িয়ে চলে সে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'একজন বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'
'কে ওখানে?' বাজখাঁই কণ্ঠস্বর যেন ফেটে পড়ল। 'আইলিন, কার সঙ্গে কথা বলছ?'
মিস্টার পারকার! কুঁকড়ে গেল ফগ। যেখানে বাঘের ভয়···
'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট এসেছেন, স্যার।'
'কি চায়?' বলতে বলতে দরজায় এসে দাঁড়ালেন জিনার বাবা।
'ঝামেলা!···'
'ঝামেলা বলে কেউ থাকে না এখানে,' রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার পারকার।
'ঝামেলা নয়, ঝামেলা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল ফগ, 'একজন বিদেশী। দর্গা গরতর···' বলতে গিয়ে কি ভেবে চেপে গেল সে। বলল, 'কিশোর পাশা আছে?'
পেছন ফিরে গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন মিস্টার পারকার, 'কিশোর! এসো তো এখানে।'
কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'কি, আঙ্কেল?'
'দেখো তো, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট কোন এক বিদেশীকে খুঁজছেন। অদ্ভুত এক নাম বলছেন···'
মুচকি হাসল কিশোর। ফগের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনি ওরকম কাঁপছেন কেন?'
'পাগড়ী পরা এক বিদেশীকে দেখেছ?'
'না। দেখলে মনে থাকত।'
'কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম···মানে, আমার ভাতিজা দেখেছে···'
'কে, বব? ও তো উল্টোপাল্টা কত কিছুই দেখে।'
'তা দেখে। কিন্তু···'
'কিন্তু কি?' গর্জে উঠলেন মিস্টার পারকার, 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমাদের কথা? বাড়ি সার্চ করতে চান?'
'অ্যাঁ! হ্যাঁ!···না না, মানে···ঝামেলা···'
'তাহলে যান এখন,' ঠাস করে ফগের মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দিলেন মিস্টার পারকার।
ফগ চলে যাওয়ার পর হলরুমে বসে হাসাহাসি করছে কিশোররা, এই সময় জানালা দিয়ে ফিসফিস করে ডাক শোনা গেল, 'কিশোর! এই, কিশোর!'
'কে?···ও, বব। কি ব্যাপার? এসো, এসো, ভেতরে এসো।'

জানালা টপকে ভেতরে ঢুকল বব। এদিক ওদিক তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'কিশোর, চাচা ভুল বলেনি। সত্যি একটা বিদেশী লোক জনসনদের বাড়িতে ঢুকেছিল। ওকে ফলো করে এসেছি আমি···'

'জানি। এ বাড়িতে ওর ঢুকে যাওয়া দেখেও কিছু আন্দাজ করতে পারোনি?'

বোয়াল মাছের মত হাঁ হয়ে গেল ববের মুখ। আবার ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো মাঝারি সাইজের গোলআলু দুটো। 'তু-তু-তুমি···ছদ্মবেশ···'

মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

সাত

পরদিন বিকেলের কাগজে একটা খবর জানা গেল:

হেরিং বীচে দেখা গেছে হুফারদের। তবে ধরতে পারেনি পুলিশ। খবর পেয়ে গিয়ে দেখে দুজনেই গায়েব।

খবরটা রবিনের নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরকে দেখাল। সবাই মিলে আলোচনায় বসল ওরা। ববও রইল ওদের সঙ্গে।

কিশোর বলল, 'গোবেল বীচের পাশের গ্রাম হেরিং বীচ। ওখানে দেখা গেছে, তার মানে কুকুরটাকে নিতে ফিরে এসেছে হুফাররা। গায়েব যখন হয়ে গেছে, আমার বিশ্বাস, আজ রাতেই জনসন হাউসে ঢুকবে ওরা। ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে কিনা কে জানে!'

'যদি না পড়ে থাকে?' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল বব।

'নজর রাখতে হবে।'

'ঢুকল কিনা জানব কি করে?'

'জানার দরকার নেই। আজ থেকে নজর রাখা শুরু করব,' কিশোর বলল। 'সন্ধ্যার আগে আগেই গাছে উঠে বসে থেকো। অন্ধকার হলে আমিও যাব। লুকিয়ে থাকব ঝোপের মধ্যে। ওপর থেকে তুমি নজর রাখবে। নিচে থেকে আমি।'

'আমরা কেউ যাব না?' জানতে চাইল মুসা।

'না, ঝামেলা হয়ে যাবে,' মুচকি হাসল কিশোর। 'আমি শিওর, মিস্টার ঝামেলা র‍্যাম্পারকটের নজরেও পড়বে খবরটা। আমাদের মতই লুকিয়ে গিয়ে নজর রাখবে বাড়ির ওপর। আমরা দল বেঁধে গেলে তার নজরে পড়ে যাব।'

কথামত সন্ধ্যার আগেই তৈরি হয়ে গিয়ে গাছে উঠে বসল বব। সারারাতও থাকতে হতে পারে। তাই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে গরম কাপড় পরে নিয়েছে। দুই পকেট ভর্তি করে নিয়েছে বিস্কুট আর টফি।

পশ্চিম দিগন্তে সাগরের বুকে তখন অস্ত যাচ্ছে সূর্য। সী-গাল উড়ছে। ওদের কর্কশ চিৎকার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। এঞ্জিনের পুটপুট পুটপুট শব্দ তুলে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে মাছধরা বোটগুলো। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ববের মনে হলো, এত আনন্দের মুহূর্ত জীবনে আর আসেনি।

সাঁঝ হলো। রাত নামল। চাঁদ উঠল আটটার পর। সাড়ে ন'টার দিকে সাগরের

দিকের পথ ধরে আসতে দেখল একটা ছায়ামূর্তিকে। কোন পোশাকে থাকবে, আগেই বলে দিয়েছে কিশোর। তাই আজ আর ওকে চিনতে অসুবিধে হলো না ববের।

পেছনের গেট দিয়ে বাগানে ঢুকেই ফার গাছটার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে দুইবার পেঁচার ডাক ডাকল কিশোর। তিনবার ডেকে জবাব দিল বব। এই সঙ্কেতের কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছে। একে অন্যকে জানান দিল–দুজনেই হাজির। জায়গামতই আছে।

আরও ঘণ্টাখানেক বাদে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখা গেল ফগকে। ঢুকে পুরো বাগানটা চক্কর দিয়ে এল একবার। তারপর লুকিয়ে বসল একটা ঝোপের মধ্যে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। পুডলটার ডাক শোনা গেল কয়েকবার। তারপর চুপ।

মাঝরাতের দিকে ঢুলুনিমত এসেছিল ববের। হঠাৎ হই-চই শুনে জেগে গেল। দেখে, কিশোরের হাত চেপে ধরেছে ফগ। ধরা পড়ে গেছে এবার কিশোর। ফাঁকি দিতে পারেনি ফগকে। কি সব বাকবিতণ্ডা হলো দুজনের মধ্যে। গাছের ওপর থেকে ঠিকমত বুঝতে পারল না বব। তবে কয়েক মিনিট পর কিশোরকে সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে অনুমান করে নিল, কিশোরের আজকের নৈশ অভিযানের এখানেই ইতি। চাচার চোখ এড়িয়ে আজ রাতে আর ঢোকা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

সতর্ক হলো বব। নজর রাখার পুরো দায়িত্ব এখন ওর ওপর এসে পড়েছে। কিশোর বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বয়লার হাউসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল চাচাকে।

কিছুক্ষণ পর একটা এঞ্জিনের শব্দ কানে এল। কান খাড়া করল বব। প্লেনের শব্দের মত লাগছে। বাড়তে লাগল শব্দটা। সাগরের দিকে হচ্ছে। মাছধরা বোটও হতে পারে। মনে পড়ল, অনেকক্ষণ থেকে কোন বোট বা জাহাজ যেতে শোনেনি সে। বেশি ঠাণ্ডা পড়লে রাতের বেলা সাধারণত মাছ ধরে না জেলেরা।

রাত বাড়তে লাগল। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বব, বলতে পারবে না। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে মোটা দড়ি দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে বেঁধে নিয়েছিল গাছের সঙ্গে। নইলে গাছ থেকে পড়ে মরত। আবার হট্টগোল শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। দেখল টর্চ হাতে দৌড়ে বেরোচ্ছে ক্রেগ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে বয়লার হাউসের দিকে।

বয়লার হাউসের দরজায় কে যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে। খুলে দিল ক্রেগ। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল বব, দমকা হাওয়ার মত ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল তার চাচা। বেরিয়েই হম্বিতম্বি শুরু করল ক্রেগের ওপর। গাছের ওপর থেকে এবারেও সব কথা বুঝতে পারল না বব। তবে এটুকু বুঝল, কোন কারণে বয়লার হাউসে গিয়ে ঢুকেছিল তার চাচা–বোধহয় শীত থেকে বাঁচার জন্যেই, আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এই সুযোগে কে যেন তালা লাগিয়ে আটকে ফেলেছিল তাকে।

কিশোর পাশা না তো? মনে হয় না। কিশোরকে ফিরে আসতে দেখেনি বব।

আর এলে নিশ্চয় পেঁচার ডাক ডেকে ওকে সঙ্কেত দিত। তা ছাড়া ফগকে বয়লার হাউসে তালা দিয়ে আটকানোর কোন কারণও নেই কিশোরের।

বাকি রাতে আর কিছু ঘটল না। ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে ভোরের দিকে গাছ থেকে নেমে এল বব। মনে হলো, ফ্রিজে থেকে জমে গেছে সে। আস্ত একটা বরফের টুকরোতে পরিণত হয়েছে তার শরীর। তাড়াতাড়ি লেপের নিচে ঢোকার জন্যে দৌড় দিল সে।

কিশোরকে ওদিকে ভোরবেলায়ই লেপ ছাড়তে বাধ্য করল আইলিন। দরজায় ডাকাডাকি করে জানাল, ফগর‍্যাম্পারকট দেখা করতে এসেছে। মিসেস পারকারের সঙ্গে বসে আছে হলঘরে।

বিরক্ত হয়ে লেপের নিচ থেকে বেরোল কিশোর। চোখ ডলতে ডলতে নিচে নামতেই রাগ করে জিজ্ঞেস করলেন কেরিআন্টি, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে কাল রাতে বয়লার হাউসে আটকে রেখেছিলি কেন?'

আকাশ থেকে পড়ল কিশোর, 'আমি!'

'কেন, কাল রাতে যাসনি জনসনদের বাড়িতে?'

'গেছি। দেখাও হয়েছে মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটের সাথে। তারপর তার সামনেই তো চলে এলাম। আর যাইনি।'

'সত্যি বলছিস?'

'মিথ্যে বলব কেন? তোমার সঙ্গে তো বলবই না।'

ফগের দিকে তাকালেন কেরিআন্টি, 'আপনি ভুল করেননি তো, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট?'

দ্বিধায় পড়ে গেল ফগ, 'ঝামেলা! ভুল করব কেন? ও ছাড়া আর কে আটকাবে?'

'ওকে তালা দিতে দেখেছেন আপনি?'

'তা দেখিনি, তবে...'

'আন্দাজে কথা বলছেন আপনি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' কিশোর বলল। 'সত্যি বলছি, আর ফিরে যাইনি আমি। আপনাকে তালা দিয়ে রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার মনে হয় আমি চলে আসার পর অন্য কেউ তালা দিয়ে আপনাকে আটকে রেখে জরুরী কোন কাজ সেরে চলে গেছে। মস্ত একটা চান্স গেল আপনার, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। কাছে থেকেও জানতে পারলেন না।...আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

আস্তে আস্তে গোল হয়ে যেতে শুরু করেছে ফগের ঠোঁট। 'তার মানে...তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, হুফাররা এসেছিল। গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুনগে, কুকুরটা আছে নাকি? না নিয়ে গেছে!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফগ। হাতের ক্যাপটা সশব্দে মাথায় বসিয়ে মিসেস পারকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি, ম্যাডাম! বিরক্ত করলাম আপানাকে! ঝামেলা!'

বলেই আর দাঁড়াল না। বিশাল বপুর তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দৌড়ে

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই বাইরে তার সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে পড়েছে।

আট

ফগ যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বব এসে হাজির। আগের রাতে যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল।

বেলা বাড়লে নাস্তা সেরে কিশোররাও দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল কুকুরটা আছে কিনা দেখার জন্যে।

জনসনদের গেটের কাছে এসেই দাঁড়িয়ে গেল। বাগানে খেলা করছে কোরি। তাড়া করে প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করছে। হাসিখুশি মেজাজ। আজ তাকে ডাক দিল না ক্রেগ। ধমক দিল না। তার বা তার স্ত্রীরও দেখা পাওয়া গেল না।

রাফিয়ানকে চুপ করে থাকতে বলল কিশোর। কোরিকে ডাকতে নিষেধ করল।

ভুরু কুঁচকে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে তাকাল সহকারীদের দিকে, 'চলো, এখানে আর কিছু দেখার নেই।'

আপাতত আর কিছু করার নেই, বাড়ি ফিরে বাগানের কোণের ছাউনিতে আলোচনায় বসা ছাড়া। সেটাই করল ওরা।

ছাউনিতে ঢুকেই একটা বাক্সের ওপর বসে বলল, 'কুকুরটার এমন হাসিখুশি মেজাজ কেন, বলো তো?'

'কুকুরের মন ভাল থাকে তখনই,' জবাব দিল জিনা, 'যখন তার মনিব কাছাকাছি থাকে।'

'কারেক্ট!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'কটেজটায় দেখতে পারলে হত।'

'তোমার ধারণা,' মুসা বলল, 'হুফাররা এসে লুকিয়ে রয়েছে কটেজে?'

'অসম্ভব না।'

'কি করে দেখবে?'

'সেটা পরে ভাবব। আগে গোড়া থেকে সব খতিয়ে দেখা যাক। এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'শুরুটা হয়েছে স্টেশনে, যেদিন হুফারদের এগিয়ে দিতে গিয়েছিল ওদের বন্ধুরা। কোরি ছিল মিসেস হুফারের কাছে। ট্রেনে ওঠার আগে ওকে ক্রেগের হাতে তুলে দিয়েছিল মহিলা। বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছিল। কোটের নিচে ভরে কুকুরটাকে নিয়ে গিয়েছিল ক্রেগ। ঠিক?'

'ঠিক,' সমস্বরে বলল সবাই।

'বেশ। তারপর আমরা শুনলাম ছবি চুরির অভিযোগে হুফারদের খুঁজছে পুলিশ। ওটা নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে ওরা, বিক্রির চেষ্টা করবে। ঠিক?'

'ঠিক।'

'তারপর থেকে ওরা গায়েব। পুলিশের সন্দেহ ছবিটা ওদের কাছেই আছে।'

'কিন্তু, কিশোর,' রবিন বলল, 'স্টেশনে আমরা যেদিন দেখলাম, সেদিন ওদের সঙ্গে ছিল দুটো ছোট ছোট সুটকেস। ফ্রেম লাগানো ছবির ওগুলোতে জায়গা হওয়ার কথা নয়। ওই সুটকেসে ছবি ভরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

'নিয়ে যায়ওনি। চুরি করার পর সোজা চলে এসেছিল গোবেল বীচে। জনসনদের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল। যতদিন নিরাপদ ভেবেছে, থেকেছে এখানে। পুলিশের নজর পড়েছে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছে। ছবিটা রেখে গেছে ওদের কোন বন্ধুর কাছে। ওদের মতই অসৎ কোন লোক। ওরা যাওয়ার পর ঠিকানামত বাক্সটা পাঠিয়ে দিয়েছে সেই লোক। পোস্ট অফিসের মাধ্যমেও হতে পারে এটা।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'বড় একটা চ্যাপ্টা বাক্স এখন বয়ে বেড়াতে হবে হুফারদের। যেটা সহজেই চোখে পড়ে। পুলিশের তাড়া খেয়ে ছোটাছুটি করার সময় সেটা কি সম্ভব?'

'খুব কঠিন। আবার লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে ওরা। বাক্সটা নষ্ট করে ছবিটা আবার এমন কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে, যেখানে পুলিশের নজরও পড়বে না, নিরাপদেও থাকবে। এটা হলো একটা সম্ভাবনা,' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। তারপর বলল, 'আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা হলো, ছবিটার কথা বন্ধুদেরকেও জানায়নি হুফাররা। দামী জিনিস। যাকে জানাবে সে-ই লোভী হয়ে উঠতে পারে, কারণ ওরাও অসৎ। পুলিশের সন্দেহের কথা বুঝতে পেরে ছবিটা লুকিয়ে ফেলে সবার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেছে ওরা। তারপর গোপনে ফিরে এসেছে আবার।'

'এটাই করেছে, কারণ এতে ঝুঁকি কম,' জিনা বলল। 'কাল রাতেই এসেছে ওরা। হেরিং বীচ থেকে চলে আসাটা কিছুই না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মনে হয়। এসেছে দুটো কারণে–ছবিটা লুকানো এবং কোরিকে নিয়ে যাওয়া; কিংবা ছবি এবং কুকুর, দুটোকেই নিয়ে যাওয়া।'

'কিন্তু কোরিকে তো নেয়নি,' মুসা বলল।

'নেয়নি একটা বিশেষ কথা ভেবে। যেই ক্রেগদের এখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবে কুকুরটা, পুলিশ নজর রাখতে শুরু করবে। দেখবে, কোন্ দম্পতির কাছে চমৎকার একটা পুডল আছে। মানুষ লুকানো সহজ, কিন্তু কুকুর লুকানো অত সোজা নয়। কারণ কুকুর সহজে চোখে পড়ে।'

'কুকুরটাকে রঙ করে নিতে পারে,' রবিন বলল। 'সাদাকে কালো করা কোন ব্যাপারই নয়। কালো কুকুরের ওপর নজর থাকবে না পুলিশের।'

'রঙ করার কথা আমাদের মাথায় যদি আসতে পারে, পুলিশের না ভাবার কোন কারণ নেই। পুডল দেখলেই চোখ রাখবে ওরা। আর সেই কুকুরের মালিক যদি হয় একজোড়া দম্পতি, তারা হোটেল কিংবা বোর্ডিং হাউসে ওঠে, ঘন ঘন জায়গা বদল করে, তাহলে তো কথাই নেই। ক্যাঁক করে গিয়ে ধরবে। অতবড় ঝুঁকি এক্ষুণি নিতে চায়নি হুফার দম্পতি। প্রথমে ছবিটা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ওটা নিরাপদ জায়গায় রেখে আবার ফিরে আসবে। কোরিকে নিতে আসবেই মিসেস হুফার।'

'তা তো বুঝলাম,' এতক্ষণে কথা বলল বব। 'এখন বলো, কাল রাতে কিভাবে

এসে ছবিটা নিয়ে গেল ওরা? নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ?'

'আগে বলো, কাল রাতে কি কি ঘটেছে?'

'একবার তো বললাম তখন।'

'আবার বলো।'

'উঠে দাঁড়ানো লাগবে? ক্লাসের মত?'

'ইচ্ছে হলে দাঁড়াও। পা ঝিঁঝি ধরে গিয়ে থাকলে।'

পা ঝাড়া দিয়ে দেখল বব। ধরেনি। দাঁড়াল না আর। বসে বসেই বলল, 'তোমাকে যখন বের করে দিল চাচা, মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল আমার। মনে মনে প্রচুর গালাগাল করলাম। এর যে কোন একটা শুনলেই হয় হার্টফেল করবে চাচা, নয়তো আমার পিঠের ছাল আস্ত তুলে নেবে...'

'কি বক্তৃতা শুরু করলে!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা, 'আসল কথা বলো।'

'তাই তো বলছি। কিশোর চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ আর কিছু ঘটল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...'

'অত ঠাণ্ডার মধ্যে! গাছের ওপর বসে!' জিনা অবাক।

'গায়ে গরম কাপড় ছিল তো। তা ছাড়া নিজেকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম গাছের সঙ্গে।...কিন্তু এত বাধা দিলে আসল কথা বলব কি করে?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলো। আর দেব না।'

'ও, বলতে ভুলে গেছি। দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটা শব্দ শুনেছিলাম, এঞ্জিনের শব্দ...'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, 'প্রথমবার ঘুমিয়েছিলে কখন?'

'তুমি ঢোকার পর। জাগলাম তোমাকে যখন চাচা বের করে দিচ্ছে সেই সময়। হট্টগোল শুনে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বলো, এঞ্জিনের শব্দ শুনলে। তারপর?'

'প্রথমে মনে হলো ছোট প্লেন,' বব বলল। 'সাগরের দিক থেকে আসছিল। এরপর বুঝলাম, বোট। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে মাছ ধরা শুরু করেছিল বোধহয় জেলেরা। অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুই ঘটছে না দেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম...ও হ্যাঁ, এর মধ্যে একবার কোরির ডাক শুনেছি বলে মনে হয়েছে...পাগলের মত চেঁচাচ্ছিল...কাউকে দেখে খুশিতে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল যেন...'

'পাগল আর উন্মাদের মধ্যে তফাতটা কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'টিটকারি মারছ!' রেগে গেল বব, 'যাও, আর বলবই না!'

'আরে না না, এমনি বললাম। কথার কথা। বলো।'

এক মুহূর্ত গাল ফুলিয়ে রেখে আবার বলা শুরু করল বব, 'আর কি বলব? সব তো বলেই ফেলেছি। কিছুক্ষণ পর চেঁচামেচি শুরু করল চাচা। ব্যস, এইই। আর কিছু ঘটেনি।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর, 'হুফারদের আসার সম্ভাবনাটা আরও জোরদার হচ্ছে...কোরির চিৎকার শুনেছ...অকারণে রাত দুপুরে চেঁচাবে কেন সে?'

'চোর এলে কুকুর চেঁচায়।'

'অনেকদিন পর মনিবের সাড়া পেলেও চেঁচায়,' জিনা বলল। 'যাই হোক, কোরির যেহেতু মন ভাল, ধরেই নেয়া যায় কাছাকাছিই রয়েছে তার মনিব। কটেজেই লুকিয়ে আছে।'

'কিংবা মূল বাড়িটাতে,' বব বলল।

'ঢুকবে কি করে?' মুসা বলল, 'দরজায় তো তালা দেয়া।'

'ওই বাড়িতে ভাড়া ছিল হুফাররা, ভুলে যাচ্ছ কেন?' কিশোরের ধাঁধার জট ছাড়ানোর ভঙ্গি নকল করে বলল বব। 'চাবি হাতে পেয়েছে। যাওয়ার সময় আসল চাবি ক্রেগের কাছে ফেরত দিয়ে গেলেও ডুপ্লিকেট থাকাটা স্বাভাবিক। প্রয়োজন হতে পারে ভেবে আগে থেকেই বানিয়ে রেখেছিল হয়তো হুফার,' একটা জোরাল যুক্তি দিতে পেরেছে মনে করে সমর্থনের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল বব, 'কি বলো, কিশোর?'

'আমিও সেকথাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'কিংবা এমনও হতে পারে, ক্রেগ আর তার বউই ওদের লুকিয়ে রেখেছে। এটাও একটা পয়েন্ট। ওদের দুজনের সাহায্য ছাড়া ওবাড়িতে ঢুকে লুকিয়ে থাকাটা খুবই কঠিন হবে হুফারদের জন্যে, প্রায় অসম্ভব। ধরা পড়ে যাবে।'

'তারমানে আগে কটেজেই খুঁজতে হবে আমাদের,' জিনা বলল। 'যে কোনভাবেই হোক। হুফারদের দেখা যদি পেয়ে যাই, কেল্লা ফতে, ফগের আগেই রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা। তারপর ফগকে না জানিয়ে শেরিফ আঙ্কেলকে ফোন করব।'

'তার মানে, বোঝা যাচ্ছে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে উপসংহার টানল কিশোর, 'কটেজে ঢোকাটাই এখন আমাদ্দের প্রধান কাজ।'

'কি করে ঢুকবে?' জানতে চাইল মুসা, 'প্ল্যানটা কি তোমার?'

নয়

কিশোরের চোখে চকচকে উত্তেজনা।

'প্ল্যানটা অতি সহজ,' বলল সে। 'বিদ্যুতের মিটার দেখার ছুতো করে চলে যাব কটেজে। মিটার রীডারের ছদ্মবেশ নেয়া কোন ব্যাপারই না।'

'জাদুকর!' ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেল বব। 'এক কথাতেই সমাধান করে দিলে! তারমানে ঢোকাটাও কোন ব্যাপারই হবে না তোমার জন্যে। আর একবার ঢুকতে পারলে কটেজে কে আছে সেটা দেখাও সহজ। বড় জোর তিনটে ঘর আছে ওই কটেজে। সব নিচতলায়। দোতলা নেই।'

'মিসেস ক্রেগ অসুস্থ না হলে আজই যেতে পারতে,' রবিন বলল।

'ও, ভাল কথা মনে করেছ। ভুলেই গিয়েছিলাম। মহিলা বিছানায় শুয়ে থাকলে সরাসরি ঘরে ঢোকা যাবে না। আর ঢুকলেও খোঁজা যাবে না।'

'আমি গিয়ে গাছে উঠে বসে থাকতে পারি,' বব বলল। 'দরকার হয় সারাদিন বসে থাকব। দেখব, মহিলা বিছানা থেকে উঠে বেরোয় কিনা।'

'সারাদিন থাকার দরকার নেই, দুপুরের পর উঠলেই হবে। আমি কাছাকাছিই থাকব। মিসেস ক্রেগ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনবার পাখির ডাক ডেকে আমাকে সঙ্কেত দেবে। অন্য কেউ এলে—এই যেমন তোমার চাচা এলে দুবার, অপরিচিত কেউ এলে একবার ডাকবে।' এক এক করে সবার দিকে তাকাল সে। 'আর কারও কিছু বলার আছে?'

'আচ্ছা,' রবিন বলল, 'হুফাররা কাল রাতে এল কিসে করে?'

'ট্রেনে আসতে পারে। বাসে আসতে পারে।'

'তারপর? স্টেশন থেকে?'

'গাড়ির কথা বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। ট্যাক্সি নিয়ে আসতে পারে। যাওয়ার দিন যেমন গিয়েছিল। ওদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে ড্রাইভার।'

'এটা অবশ্য একটা কথা,' কিশোর বলল। 'বাড়ির আশেপাশে, বিশেষ করে গেটের কাছে তাহলে গাড়ির চাকার দাগ খুঁজতে হয়।'

'আরেকটা কথা,' মুসা বলল, 'মূল বাড়িটায় ওরা ঢুকেছে নাকি, সেটা দেখা যায় না কোনভাবে? ওবাড়িতেও ছবিটা লুকানো যেতে পারে।'

'তা পারে। সেটাও দেখতে হবে আমাদের।...আর কোন প্রস্তাব? জিনা, তুমি কিছু বলবে?'

রাফির গলা জড়িয়ে ধরে বসে আদর করছে জিনা। মাথা নাড়ল, 'নাহ্। আর কি বলব? সবই তো বলা হয়ে গেছে।'

আড়াইটা নাগাদ তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাগানে নামল। ওখানে বসে আছে জিনা, মুসা, রবিন আর রাফি। মিটার রীডারের ছদ্মবেশ চমৎকার হয়েছে, স্বীকার করল সবাই।

দল বেঁধে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। হেঁটে গেলে দেরি হবে। সাইকেলের পাশে পাশে দৌড়ে চলল রাফি। ওর যাতে কষ্ট না হয় সেজন্যে আস্তে চালাল সবাই।

জনসন হাউসটা দেখা গেল। সাইকেল ওটার বেশি কাছে নিল না ওরা। রাস্তার ধারে ঝোপের আড়ালে কাত করে ফেলে রেখে সৈকতে নেমে হেঁটে চলল।

বাড়ির পেছনের গেটের কাছে এসে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'এবার কি?'

এদিক ওদিক তাকাল কিশোর। কেউ নেই। ফার গাছটার দিকে তাকাল। ববকে দেখা গেল না। যাওয়ার কথাও নয়। পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে।

জোরে জোরে পাখির ডাক ডাকল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল।

সহকারীদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর। 'কর্তব্য পালনে কোন অবহেলা করেনি বব।'

'গোয়েন্দাগিরির নেশায় পাগল হয়ে আছে সে। ঠিকমত খায়দায়ও না বোধহয়,' মুসা বলল। 'কিন্তু আমরা এখন কি করব? কখন ঘর থেকে বেরোয় মিসেস ক্রেগ, তার তো কোন ঠিক নেই। ততক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

'চলো, সামনের গেটের কাছে গিয়ে দেখে আসি চাকার দাগ আছে নাকি।'

ঘুরে বড় গেটটার কাছে চলে এল ওরা। রাফিকে চুপ করে থাকতে বলল

জিনা।
বিশাল গেটটা বন্ধ। মোটা শিক লাগানো বড় বড় পাল্লা দুটোর দুই ধারে নিচের দিকে ছোট ছোট দুটো গেট, শুধু মানুষ ঢোকার জন্যে। গাড়িটাড়ি কিছু ঢুকতে হলে বড় পাল্লা খুলতে হয়।
অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গেটের আশেপাশে চাকার নতুন দাগ চোখে পড়ল না। যা আছে, বহু পুরানো। তারমানে গাড়িতে করে আসেনি হুফাররা।
সবাইকে নিয়ে আবার পেছনের গেটের কাছে চলে এল কিশোর। তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। জেলেদের বোট যাতায়াত করছে তীর থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে। কেউ কেউ থেমে জাল ফেলে মাছ ধরছে জিনার দ্বীপটার কাছাকাছি।
চিন্তিত ভঙ্গিতে বোটগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'হুঁ, কি করে ঢুকেছে, এতক্ষণে বুঝেছি। বোট! রাতের বেলা মোটর বোট নিয়ে এসেছিল ওরা। প্লেন নয়। তাহলে ওটাকে নামতেও শুনত বব। আশেপাশে ছোট প্লেন নামার একমাত্র জায়গা এই সৈকত। বালিতে চাকার দাগও থাকত। নেই। গাড়িতে আসেনি, প্লেনে আসেনি, বাকি রইল একটাই সম্ভাবনা–বোট।'
'বোটটা কোথায়?' মুসার প্রশ্ন। 'ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে?'
'ওই যে, বোট হাউস। চলো, দেখে আসি,' বলেই রাফিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল জিনা।
তিন গোয়েন্দাও চলল জিনার পিছে পিছে।
বোট হাউসে ঢোকার দরজাটা লাগানো। তালা দেয়া নাকি?
তিন গোয়েন্দার আগেই গিয়ে ঠেলা দিল জিনা। খুলে গেল দরজা। তালা নেই। ভেতরে উঁকি দিয়েই চাপা গলায় বলে উঠল, 'আছে!'
দরজায় দাঁড়িয়ে তিন গোয়েন্দাও দেখল, ছোট একটা নৌকা মৃদু ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। কাছে থেকে দেখার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে কিশোর, এই সময় শোনা গেল পাখির ডাক। জোরে জোরে ডেকে উঠল একটা দাঁড়কাক। কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার ডাকল তিনবার।
বব। কোন সন্দেহ নেই।
ঘুরে দৌড় দিল কিশোর। বালি মাড়িয়ে ছুটল সামনের গেটের কাছে যাওয়ার জন্যে।

দশ

বারান্দাওয়ালা টুপিটা চোখের ওপর টেনে দিল কিশোর। আঙুল দিয়ে টিপে দেখল জায়গামত রয়েছে কিনা নকল গোঁফজোড়া। গলার চারপাশে পেঁচিয়ে নিল কাঁধে ফেলে রাখা মাফলারটা।
কিছুদূরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মুসা। 'দেখো অবস্থা। সত্যি সত্যি মিটার রীডার। ও যে নকল, কেউ বুঝতে পারবে না।'

'ওর সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত,' আফসোস করে বলল রবিন, 'কি করে, কি কি কথা বলে, দেখতে পারতাম।'

'গেলেই পারতে।'

জোরে শিস দিতে দিতে বাঁ পাল্লার নিচের গেটটা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকে গেল কিশোর। ওপাশে গিয়ে আবার সোজা হয়ে হেঁটে চলল। রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে মিসেস ক্রেগ। তাকে ঘিরে নাচানাচি করছে কোরি।

কিশোরকে দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস ক্রেগ। পরচুলা, মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ, কালো চশমায় অদ্ভুত লাগছে তাকে। হাঁচি দিল জোরে জোরে দু'বার।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

'কি চাই?' খসখসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মহিলা। কেশে উঠল। থামেই না আর। অনেক কষ্টে থামানোর পর ময়লা রুমাল বের করে মুছে নিল নাক-চোখের পানি। রুমালটা সরাতে না সরাতে আবার শুরু হলো কাশি। তাড়াতাড়ি ওটা মুখের ওপর চেপে ধরল, যেন খোলা মুখ দিয়ে ঢুকে যাওয়া বাতাস আটকে ফেলার জন্যে।

'সাংঘাতিক ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন তো, ইস্,' মোলায়েম আন্তরিকতার সুরে বলল কিশোর। 'সরি, আপনাকে একটু কষ্ট দেব। মিটারটা দেখতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। রোদে শুকানোর জন্যে দড়িতে দেয়া কাপড় নামাতে শুরু করল। এই সুযোগে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। ক্রেগ এখন ঘরে না থাকলেই হয়।

সামনের ঘরটায় দ্রুত চোখ বোলাল কিশোর। একপাশের দেয়ালে নিচের দিকে লাগানো রয়েছে মিটার। লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই এখানে। পেছনের ঘরে চলে এল। ছোট একটা শোবার ঘর। এক বিছানাতেই ভরে গেছে। এখানেও কেউ নেই। বিছানার নিচে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। কতগুলো মলাটের বাক্স পড়ে আছে কেবল। জঞ্জালে ভরা।

হঠাৎ ছুটে ঘরে ঢুকল খুদে কুকুরটা। সামনের দু'পা কিশোরের উরুতে তুলে দিল। মাথা চাপড়ে আদর করে দিতেই লেজ নাড়তে লাগল।

বাইরে থেকে ডাক দিল মিসেস ক্রেগ, 'কোরি! কোরি!'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল কুকুরটা।

আবার খোঁজায় মন দিল কিশোর।

তৃতীয় ঘরটা দেখল। রান্নাঘর দেখল। তারপর দেখল ভাঁড়ার। বড়ই করুণ দশা। জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই। আর ভীষণ নোংরা।

'কি জায়গা!' ভাবল কিশোর। 'নাহ্, এখানে হুফারদের লুকিয়ে রাখেনি ক্রেগ। এ রকম জায়গায় হুফাররাও থাকতে চাইবে বলে মনে হয় না। যা দুর্গন্ধ!'

তিনটে ঘরেরই ছাত দেখল সে। ওপরে বক্সটক্স বা চিলেকোঠা আছে কিনা, যেখানে মানুষ লুকানো যায়–দেখল। ট্র্যাপ ডোর বা কোন ধরনের ফাঁকফোকর চোখে পড়ল না। তারমানে সত্যিই নেই এখানে হুফাররা।

সামনের ঘরটায় বেরিয়ে এল সে। এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল মিসেস ক্রেগ। 'কি, তোমার হয়নি এখনও?' খসখসে কণ্ঠস্বর। কানে লাগে। দু'বার হাঁচি

দিল। গায়ের লাল চাদরের কোণাটা গলায় পেঁচাল।

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে,' বলে আরেকবার তাকাল দেয়ালে বসানো মিটারের দিকে। 'মিটার দেখা যে কি ঝামেলার কাজ।'

বাগানে বেরিয়ে এল কিশোর। ফিরে তাকাল। দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। বড় বাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটার মিটারটা দেখা যাবে?'

'না, চাবি নেই,' আর দাঁড়াল না মহিলা। ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দিল।

বাড়ির চাবি চাওয়াতে এ রকম করল কেন! একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে গেটের দিকে এগোল। কটেজে কেউ লুকিয়ে নেই। মূল বাড়িটাতে আছে?

গেটের বাইরে অপেক্ষা করছে বব। গাছ থেকে নেমে চলে এসেছে বহু আগে। ওর দায়িত্ব শেষ। গাছে থাকার আর প্রয়োজন নেই। কিশোরের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ কি গোঁফ লাগিয়েছ! বিচ্ছিরি লাগছে!... ভেতরে কি দেখলে? আছে কেউ?'

'না।...ওরা গেল কোথায়?'

হাত তুলে একটা ঝোপ দেখাল বব।

হাঁটতে শুরু করল কিশোর। ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'বেরিয়ে এসো। বোট হাউসে যাব।'

সৈকতে এসে রবিন বলল, 'কিছু তো বলছ না। তারমানে হুফাররা কটেজে নেই।'

'না, নেই,' বলে বোট হাউসে ঢুকে গেল কিশোর। পেছন পেছন ঢুকল সবাই। 'মিসেস ক্রেগের অনুমতি নিয়ে,' বলল সে, 'মিটার দেখতে ঢুকলাম। মাত্র তিনটে ঘর। হুফারদের কোন চিহ্নও নেই। আর মহিলার যা অবস্থা। শরীর খুব খারাপ।'

'তারমানে কোন লাভ হলো না,' দমে গেল মুসা। 'হুফারদের পাওয়া গেল না। ওদের খুঁজে বের করতে হলে এখন নতুন কিছু ভাবতে হবে আমাদের। এমন হতে পারে না–হয়তো এসেছে, কাজ সেরে চলেও গেছে, কোরিকে নিয়ে যায়নি?'

নৌকায় উঠল কিশোর। বলল, 'এসো, ওঠো সবাই। আরাম করে বসেই কথা বলি।'

সবাই উঠল। মৃদু ঢেউয়ে দুলছে নৌকা।

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল, 'কাল রাতে যদি এসেই থাকে হুফাররা, ক্রেগদের সঙ্গে কথা বলে কেন চলে গেল? আর নৌকা নিয়ে এসেছেই বা কোনখান থেকে?'

'অবশ্যই হেরিং বীচ,' জিনা বলল। 'আর কোনখান থেকে আসবে?'

'হ্যাঁ, আমিও সেকথাই ভাবছি। হেরিং বীচে গিয়েছে অনেকগুলো সুবিধে পাবে বলে। ওখানে জেটি আছে, নৌকা ভাড়া করতে সুবিধে, গোবেল বীচও কাছে।'

'কিন্তু কাছে মানেও তো বহুদূর। ঢেউয়ের মধ্যে এতখানি পথ রাতের বেলা দাঁড় বেয়ে আসা সহজ কথা নয়। এটাতে এঞ্জিনও নেই। অথচ শব্দ শুনেছে বব।'

'মোটর বোটে করে এসেছিল,' বলল কিশোর। 'হুফারদের নৌকায় নামিয়ে

দিয়ে চলে গেছে।'

'ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল বব। 'মোটর বোটেই এসেছে। রাতের বেলা এতখানি পথ দাঁড় বাওয়া নৌকায় করে আসার কষ্ট আর ঝুঁকি ওরা নেয়নি। যেখানে সহজেই মোটর বোট ভাড়া করা যায়, ঝুঁকি নিতে যাবেই বা কেন?'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বব। কাত হয়ে গেল নৌকা। ডুবিয়ে দিত আরেকটু হলেই। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল।

'নৌকাটাকেও বোটের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে কাউকে না কাউকে,' মুসা বলল। 'নৌকায় করে হুফারদের আনতে হয়েছে। কাজ সারার পর আবার ওদের নিয়ে গিয়ে বোটে তুলে দিয়ে আসতে হয়েছে। সেই লোকটা কে?'

'সেই লোকটা ক্রেগ ছাড়া আর কেউ নয়,' রবিন বলল। 'কটেজে যেহেতু পাওয়া যায়নি হুফারদের, আমার বিশ্বাস, ওরা আবার হেরিং বীচেই ফিরে গেছে।'

'তারমানে হয়ে গেল রহস্যের সমাধান!' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে বব।

ওর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল সবাই।

কিশোর বলল, 'কই আর রহস্যের সমাধান হলো? অনেক বাকি। এখনও জানিই না হুফাররা কোথায় আছে, ছবিটা কোথায় লুকিয়েছে।'

'ও!' ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল বব।

'ছবিটা নিশ্চয় বড় বাক্সে করে আনা হয়েছে,' মুসা বলল। 'অত বড় বাক্স লুকানো সহজ নয়। মাটি চাপা দিয়ে দেয়নি তো?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'এখন আর খুঁজতে যাওয়ার সময় নেই।'

'একবার চোখ বুলানো তো যায়?' একেবারেই না দেখে যেতে ইচ্ছে করল না জিনার। 'গ্রীন হাউস আর ছাউনি-টাউনিগুলোতে উঁকি দিয়ে যেতে পারি।'

'তা যায়।...এই বব, আস্তে! ডুবিয়ে দেবে তো! আস্তে নামো। অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

পেছনের গেটের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ক্রেগদের দেখা গেল না বাইরে। কটেজের জানালায় আলো। নিশ্চয় ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডার মধ্যে আর ওদের বেরোনোর সম্ভাবনা নেই।

গেট টপকে গেলে রাফিকে ঢোকাতে কষ্ট হবে। তাই সামনের গেটে চলে এল ওরা। খানিক আগে কিশোর যেটা দিয়ে ঢুকেছিল, খোলাই পড়ে আছে ওই গেটটা। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল সকলে।

বাগানের এককোণে ঝোপঝাড়ে ঘেরা একটা জায়গায় আগুন জ্বলছে।

'খাইছে! আগুন জ্বালল কে!' বলে উঠল মুসা। 'চলো তো দেখি?'

এগারো

অগ্নিকুণ্ডের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আগুনের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল কিশোর। ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। তারপর একটা মরা ডাল এনে খোঁচাতে লাগল

আগুনে। হঠাৎ বলে উঠল, 'দেখে বুঝতে পারছ কিসের কাঠ? বাক্সের। কেটে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। যাতে কোন চিহ্ন আর না থাকে। তাড়াতাড়ি পোড়ানোর জন্যে প্যারাফিন ঢেলে দেয়া হয়েছে।'

সস্তা কাঠের টুকরো। কোন জিনিস প্যাকিং করার জন্যে বাক্স বানাতে ব্যবহার করা হয় এ ধরনের কাঠ। কি জিনিস প্যাকিং করা হয়েছিল, সেটা অনুমান করতেও অসুবিধে হলো না ওদের।

'খাইছে!' উৎকণ্ঠা চাপা দিতে পারল না মুসা, 'কিশোর, ছবিটা গেল তারমানে! বাক্সের সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই?'

'আরে নাহ্! অত বোকা নাকি ওরা। ছবিটা বের করে নিয়ে চলে গেছে যারা যাওয়ার। তারপর নষ্ট করা হয়েছে বাক্সটা।'

'কে করল? ক্রেগ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। আর কে?'

'প্রচুর পয়সা খেয়েছে ব্যাটা, হুফারদের কাছ থেকে।'

এখানে দাঁড়িয়ে আগুন পোহানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। হতাশই হয়েছে। হুফাররাও গেছে। ছবিটাও গেছে। কোরিকে নিতে কবে আবার ফিরে আসবে ওরা কোন ঠিক নেই। না এলে ধরার আশাও শেষ।

কিন্তু সত্যি কি নিয়ে গেছে ছবিটা? সন্দেহ যাচ্ছে না কিশোরের। নাকি ছবিটা বাক্স থেকে বের করে আরও কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেছে? পুলিশের খোঁজাখুঁজি কমে এলে আবার ফিরে এসে ছবি এবং কোরি, দুটোই নিয়ে যাবে?

'কিসের মধ্যে আঁকা ছিল ছবিটা, জানতে পারলে সুবিধে হত,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে আপনমনে বলল কিশোর। 'বাক্সটা দেখে যতদূর মনে হচ্ছে, ছবিটা বেশ বড়ই। ক্যানভাসে আঁকা। তারমানে গোল করে পাকিয়ে ফেলা সম্ভব।'

'গোল করতে পারলে লুকানোও সহজ,' রবিন বলল। 'ক্রেগরা ওদের ঘরের যে কোনখানে ফেলে রাখতে পারবে। জানা না থাকলে নজরে পড়বে না কারও।'

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না। ক্রেগদের মত নোংরা লোকের হাতে এ রকম একটা জিনিস দেবে না হুফাররা। নষ্ট করে ফেলার ভয়ে।'

এখন আর খোঁজাখুঁজির সময় নেই। গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সৈকত ধরে ফিরে চলল জিনাদের বাড়িতে। ববও ওদের সঙ্গেই চলল।

আগে আগে হাঁটছে কিশোর। কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে হাত তুলে ফিসফিস করে বলল, 'বব, তোমার চাচা। কারও পিছু নিয়েছে মনে হচ্ছে।'

গোধূলির অস্পষ্ট আলোতেও দেখতে অসুবিধে হলো না, আগে আগে হাঁটছে একজন লোক। হাতে একটা ব্যাগ।

আঁতকে উঠল বব। 'ওরি বাবারে, আমি পালাই!'

কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন, 'কার পিছু নিল?'

'চিনতে পারছি না। দেখা দরকার।' সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল কিশোর, 'রাস্তায় উঠে সাইকেলে চড়েই জোরে জোরে বেল বাজানো শুরু করবে। চমকে দেবে ফগকে। তারপর দ্রুত চালিয়ে চলে যাবে সামনে, লোকটা কে দেখার জন্যে। এভাবে গেলে আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যাবে–সত্যি সত্যি লোকটার পিছু নিল

কিনা ফগ।'

সাইকেলগুলো রাস্তায় নিয়ে এসে চড়ে বসল সবাই। একসঙ্গে বেল বাজানো শুরু করে দিল। ছায়ামূর্তির মত চোখে পড়ছিল ফগকে। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল সে। সাইকেলের বাতি জ্বেলে দিল ওরা। উজ্জ্বল আলোয় সামনের অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখা গেল ফগকে। ওদের চোখে পড়তে চায় না।

ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'গুড নাইট, মিস্টার ফগ। হাঁটতে বেরিয়েছেন বুঝি? ঝোপের আড়ালে কেন?'

মজা পেয়ে গেল বাকি সবাই। ঝোপটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলতে বলতে গেল, 'গুড নাইট! গুড নাইট! গুড নাইট!' রাফি বলল, 'খুফ! খুফ! খুফ!' কেবল বব কিছু বলল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি পার হয়ে এল ঝোপটা।

বেল আর চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল ফগের। অসুবিধা করে ঝোপের আড়ালে বসে থাকার আর কোন মানে হয় না। 'আহ্, ঝামেলা!' বলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সে। রাগে আগুন হয়ে তাকিয়ে আছে 'পাজি' ছেলেমেয়েগুলোর দিকে।

খানিক পর সামনে নজর পড়তে দেখল, যার পিছু নিয়েছিল তাকে দেখা যাচ্ছে না আর। পাশের বনে ঢুকে গেছে হয়তো। এই অন্ধকারে আর খুঁজে বের করা যাবে না। বের করলেও কোন লাভ নেই। তার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে গেছে লোকটার কাছে। চরম বিরক্তিতে আবার বলে উঠল সে, 'উফ্, ঝামেলা!'

ফগ না দেখলেও বনে ঢোকার আগে লোকটাকে দেখে ফেলেছে কিশোর। ক্রেগ। হাতে একটা বাজারের ব্যাগ। বাজার করতে গিয়েছিল বোধহয়। বাক্সটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েই বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। সেই পুরানো ক্যাপ মাথায়। একই পোশাক পরনে। পা টেনে টেনে হাঁটা। চেঁচামেচি শুনে কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকে পড়ল রাস্তার পাশের বনে।

রবিনও দেখেছে। কিশোরের পাশে এসে বলল, 'এর পিছু নিয়েছিল কেন ফগ? সূত্রের আশায়?'

'কি জানি! সন্দেহজনক কিছু করতে দেখেছে হয়তো। তবে আপাতত ফগের সূত্র পাওয়ার আশা খতম। ক্রেগ জেনে গেছে। ওর অজান্তে এখন আর পিছু নিতে পারবে না ফগ।...ভাবছি, সুযোগটা কাজে লাগাব কিনা?'

'কোন সুযোগ?'

'ক্রেগ সাজার।'

'মানে?'

জবাব দিল না কিশোর। আনমনে ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে সাইকেল চালাল।

বাড়ি ফিরে চা খাওয়ার পর ওপরে শোবার ঘরে চলে গেল সে। হলঘরে বসে টেলিভিশন দেখতে দেখতে ফিসফাস করে কথা বলতে লাগল বাকি সবাই। হই-হল্লা তো দূরের কথা, জোরে কথা বলাও নিষেধ। মিস্টার পারকার তাঁর স্টাডিতে গবেষণায় ব্যস্ত। চেঁচামেচি শুনলে রেগে যান। কেরিআন্টি রান্নাঘরে। রান্নার কাজে

তাঁকে সাহায্য করছে আইলিন।

আবার যখন সিঁড়ি বেয়ে পা টেনে টেনে নেমে এল কিশোর, হাঁ হয়ে গেল সবাই। এমনকি রাফিয়ানও মিস্টার পারকারের কথা ভুলে গিয়ে হউ হউ করে ডাক দিয়ে ফেলল দুটো। তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরল জিনা। আগে থেকে জানা না থাকলে রাফির মত সবাইই চেঁচামেচি শুরু করে দিত।

ক্রেগ সেজেছে কিশোর। এত নিখুঁত ছদ্মবেশ আর হয় না। কেরিআন্টি দেখে ফেললে মহা হই-চই বাধাবেন। তাই তাড়াতাড়ি হলে নেমে দরজার দিকে ছুটে গেল সে। ইশারায় সবাইকে বাইরে যেতে বলে নিজেও বেরিয়ে গেল। সবাই বাগানে বেরোলে জানাল কোথায় যাচ্ছে। ফগের বাড়িতে। ফগ কেন ক্রেগের পিছু নিয়েছিল বের করার চেষ্টা করবে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কেউ আসব?'

'না। দেখে ফেললে আমি কে বুঝে যাবে ফগ। সব পণ্ড হবে। রাফিরও আসার দরকার নেই।'

নিজের নাম শুনে কান খাড়া করে ফেলল রাফিয়ান। ডেকে ওঠার আগেই জিনা বলল, 'চুপ, চুপ! ডাকাডাকি বন্ধ!'

বারো

ফগের বাড়ি রওনা হলো কিশোর। ওর চোখে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ক্রেগ ভেবে ওকে অনুসরণ করে ফগ।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে চলল কিশোর। তার কাজ সহজ করে দিল ফগের ভীষণ মোটা আলসের হদ্দ কালো বেড়ালটা। গেট পেরোতেই সামনে পড়ল ওটা। কিশোরের চেহারা আর পোশাক দেখে এমন ভয় পাওয়া পেল, মিআঁউ করে ডাক দিয়ে একদৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে জানালায় উঁকি দিল ফগের মুখ। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে, কে?'

জবাব দিল না কিশোর। এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল যাতে ওকে চোখে পড়ে ফগের। তারপর ঘুরে তাড়াতাড়ি পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

রাস্তায় উঠে পেছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝে ফেলল কিশোর, ফগ ঠিকই পিছু নিয়েছে তার। অন্ধকারে মুচকি হাসল সে।

দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিল কিশোরের মনে। ফগের সঙ্গে মজা করার লোভ ছাড়তে পারল না। জনসন হাউসের দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ মোড় নিয়ে বাচ্চাদের পার্কটার দিকে চলল। এই ঠাণ্ডার মধ্যে পার্কে ঢুকে ওকে দোলনায় দোল খেতে দেখলে ফগের মুখটা কেমন হবে ভেবে হাসি চাপতে পারল না।

খানিকক্ষণ দোল খেয়ে উল্টোদিকের গেট দিয়ে মেইন রোডে বেরোতেই সামনে এসে দাঁড়াল লম্বা এক লোক। বলল, 'আরে ক্রেগ যে। কতদিন পর দেখা। চলো চলো, আমাদের বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেয়ে যাবে।'

ক্রেগের অনুকরণে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। পুরানো চশমার ভারী লেন্সের

ভেতর দিয়ে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এখন? এখন তো যেতে পারব না। বাড়িতে কাজ আছে।'

পা টেনে টেনে যতটা দ্রুত সম্ভব লোকটার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। চট করে ফিরে তাকিয়ে দেখল, রাস্তার মোড় ঘুরে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে ফগ। বোধহয় কথা কানে গেছে তার। দেখতে আসছে কার সঙ্গে কথা বলল ক্রেগ।

কিন্তু সরে গেছে ততক্ষণে লম্বা লোকটা।

এগিয়ে চলল কিশোর। পেছনে লেগেই রইল ফগ।

একটিবারের জন্যেও আর বীচ কটেজের দিকে গেল না কিশোর। ঘুরতে থাকল এদিক ওদিক।

বিরক্ত হয়ে গেল ফগ। ধৈর্যের শেষ সীমায় চলে গেছে। পার্কে ক্রেগকে দোলনায় দুলতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল তার, মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে ক্রেগের। এখন ঠাণ্ডার মধ্যে অনবরত ঘুরতে দেখে ধারণাটা বদ্ধমূল হলো। আর এভাবে ঘোরার কোন মানে হয় না। পাগলটাকে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করা দরকার, এ রকম করছে কেন সে?

জুতোর শব্দ চাপার আর চেষ্টা করল না ফগ। গটগট করে সামনে এগোল। ডাক দিল, 'জর্জ ক্রেগ, দাঁড়াও! কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

দাঁড়াল না ক্রেগ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল গাছপালা আর ঝোপের অন্ধকারে।

ফগের সন্দেহ আরও বাড়ল। 'ঝামেলা! অ্যাই, ক্রেগ! কথা শুনছ না কেন?'

মনে মনে হাসছে কিশোর। মোড় নিল জনসন হাউসের দিকে। ওখানে গেলে এত গাছপালা আর ঝোপের মধ্যে কোনওখানে হারিয়ে যাওয়াটা সহজ হবে। একটা কথা বোঝা হয়ে গেছে, ক্রেগকে সন্দেহ করলেও তেমন কিছু জানে না ফগ। স্রেফ সন্দেহের বশেই ওকে ফলো করে জানার চেষ্টা করেছে ও কোথায় যায়, কি করে।

দৌড়াতে শুরু করল ফগ। কিশোরও দৌড়াতে লাগল। অবাক হয়ে ফগ দেখল, ক্রেগের খোঁড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না সে।

জনসন হাউসের সামনের গেটের কাছে গিয়েও ঢুকল না ক্রেগ। পাশ ঘুরে নেমে গেল সৈকতে। দৌড়ে গেল পেছনের গেটের কাছে। গেট বেয়ে উঠে পড়ল অনায়াসে। টপকে নামল অন্যপাশে।

এত সহজে গেট ডিঙাতে পারবে না বুঝে আবার ঘুরে গেল ফগ। প্রাণপণে দৌড় দিল সামনের গেটের দিকে। কোনখানে ঢুকবে ক্রেগ, অনুমান করতে পারছে। নিশ্চয় তার কটেজে ঢুকবে।

সামনের গেটের কাছে এসে দাঁড়াল ফগ। এত জোরে হাঁপাচ্ছে, শিস কেটে কেটে নাক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাটাকে ধরতে পারলে আজ জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।

ঝোপে লুকিয়ে থেকে ফগকে কটেজের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল কিশোর। দরজায় গিয়ে জোরে জোরে থাবা মারতে লাগল ফগ। আস্তে করে ফাঁক হলো পাল্লা। সাবধানে উঁকি দিল জর্জ ক্রেগের মুখ। ফগকে দেখে অবাক।

'ঝামেলা!' চিৎকার করে উঠল ফগ, 'এ সবের মানে কি?'

'কোন্ সবের?' কিছুই বুঝতে পারছে না ক্রেগ।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল ফগ। প্রচণ্ড রেগে গেলে এ রকম করে সে। 'না জানার ভান করে আর রেহাই পাবে না জাদু। আমাকে এমন করে ভুগিয়ে, বাঁদর নাচ নাচিয়ে এখন সাধু সাজা হচ্ছে...'

ক্রেগ তো আরও অবাক। ফিরে তাকিয়ে তার বউকে ডেকে বলল, 'শোনো কথা, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট কি বলছেন শুনে যাও। বাজার থেকে এসে আমি কি আজ আর বাইরে বেরিয়েছি?'

'না!' হাঁচি, কাশি আর গোঙানি শোনা গেল এরপর।

ফগের দিকে ফিরল ক্রেগ, 'শুনলেন তো? আপনি ভুল করেছেন।'

দরজা লাগিয়ে দিতে গেল সে, কিন্তু বিশাল একটা পা দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল ফগ। 'তুমি বলতে চাইছ গত একটি ঘণ্টা ধরে আমাকে পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াওনি তুমি? আমার বাড়িতে যাওনি? আমার বেড়ালটাকে ভয় দেখাওনি? বাচ্চাদের পার্কে দোলনায় বসে দোল খাওনি...'

'আপনার মাথাটাতা ঠিক আছে তো, মিস্টার ফগ...'

'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবে!' গর্জে উঠল ফগ। 'পাগল তো তুমি। কেন এ সব করেছ ভালয় ভালয় জবাব দাও। নইলে ভুগতে হবে বলে দিলাম। পস্তাবে। আইনের লোকের সঙ্গে শয়তানি! তোমাকে আমি জেলে ভরব, দাঁড়াও।' পকেটে হাত ঢোকাল সে, 'আহ্, ঝামেলা! নোটবুকটা আবার রাখলাম কই?'

প্যান্টের পকেট খোঁজার জন্যে মনের ভুলে পা'টা দরজার ফাঁক থেকে সরিয়ে আনল ফগ। মুহূর্তে ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা লাগিয়ে দিল ক্রেগ। ভেতর থেকে ছিটকানি তুলে একেবারে তালা লাগিয়ে দিল।

হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড় হলো কিশোরের। একা একাই হাসতে লাগল। মুসারা থাকলে ভাল হতো। মজাটা আরও জমত। ফগের কানে চলে যাওয়ার ভয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল ঝোপের ধার থেকে। কটেজের পেছন দিকে।

মিনিটখানেক পর হাসি থামতে খেয়াল করল, ফগের কোন সাড়াশব্দ নেই। কি করছে ও? ক্রেগের কিছু করতে না পেরে রেগেমেগে নিশ্চয় বাড়ি চলে গেছে। রিপোর্ট লিখে ক্রেগকে ফাঁসানোর মতলব করবে। নাকি লুকিয়ে আছে ক্রেগের বেরোনোর আশায়? বেরোলেই ক্যাঁক করে ধরবে।

আরও দু'এক মিনিট অপেক্ষা করে দেখার কথা ভাবল কিশোর। বলা যায় না, যদি না গিয়ে থাকে ফগ? দেখতে পেলে ওকেই চেপে ধরবে।

কিন্তু দুই মিনিট যাওয়ার আগেই ঘটতে শুরু করল ঘটনা। রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার জন্যে খুলেছে মিসেস ক্রেগ। সরাসরি আলো এসে পড়ল কিশোরের ওপর। স্পষ্ট দেখতে পেল ওকে মিসেস ক্রেগ। স্বামীকে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে চলে গেল ঘরের ভেতর।

আর এখানে থাকা যায় না। সামনের গেট, পেছনের গেট কোন দিকে যাওয়াটাই ঠিক হবে না। মিসেস ঠুসের বাড়ির বেড়াটা কাছেই। ওই বাড়িতে ঢুকে

যাওয়াই আপাতত নিরাপদ মনে হলো ওর কাছে।

পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। কিন্তু অন্যপাশে চলে আসার আগেই কানে এল কটেজের পেছনের দরজা দিয়ে কে যেন বেরিয়ে আসছে। ফিসফিস কথা শোনা গেল। স্বামীকে কিছু বলল মিসেস ক্রেগ। বোঝা গেল না।

ফিরল না কিশোর। একমাত্র চিন্তা, বেড়া পার হয়ে অন্য পাশে চলে আসা। কিন্তু এত ঘন, পেরোতেই পারছে না। ঢোলা কোটে ডালের মাথা আটকে গিয়ে আরও পড়ল বেকায়দায়। এই সময় তার কোট চেপে ধরল একটা হাত। ফিরে তাকাল কিশোর। ক্রেগ।

ঝাড়া দিয়ে ক্রেগের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কোন কিছুর পরোয়া না করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। মিসেস ঠুসের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা বাদ দিয়ে দৌড় দিল পেছনের গেটের দিকে।

চিৎকার করে উঠল ক্রেগ, 'ফিরে এলে কেন আবার? কি চাও?'

কিন্তু জবাব দেয়ার জন্যে দাঁড়াল না কিশোর। ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে। কয়েক গজ যেতে না যেতেই ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল। থাবা মারল ধরার জন্যে। কোট চেপে ধরল কিশোরের। গর্জন করে উঠল ফগ, 'আবার বেরোবে তুমি, জানতাম! এসো আমার সঙ্গে থানায়। অনেক কথা আছে...'

কিন্তু যাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই কিশোরের। হ্যাঁচকা টান মারল। ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল কোটের কাপড়। মুক্ত হয়েই দৌড় মারল আবার। দুপদাপ করে তার পেছন পেছন দৌড়ে আসতে লাগল ফগ।

পেছনের গেটের কাছে গিয়ে লাভ নেই আর। ডিঙাতে পারবে না। ধরা পড়ে যাবে। ঘুরে আবার সামনের গেটের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

ঠিক এই সময় কটেজের পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল ক্রেগ। তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল কিশোর। ধাক্কা খেয়ে দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে।

টর্চ জ্বালল ফগ। দুজনের গায়ে আলো পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ঝামেলা!...এ-কি!...কি কাণ্ড...'

আলো নিভিয়ে দিল ফগ। এই ভূতুড়ে অঞ্চলে থাকার আর একবিন্দু ইচ্ছে রইল না তার। সামনের গেটের দিকে ছুটল। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বেরিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে।

হাসতে শুরু করল ক্রেগ। কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করতে গেল, 'তুমি আবার এলে কেন...'

কিন্তু কথা শেষ হলো না তার। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের গেটের দিকে দৌড় মারল আবার কিশোর।

ক্রেগও আসতে লাগল পেছন পেছন। 'কেন ফিরে এসেছে' এর জবাবটা যেন তার চাইই চাই। সবাইকে যেন দৌড়াদৌড়ির নেশায় পেয়েছে আজ। কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

বিরাট বাড়ি। লুকানোর জায়গার অভাব নেই। বয়লার হাউসের কোণায় এসে একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ক্রেগ চলে গেলে বেরোবে।

কয়েক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল ক্রেগ। কিশোর কোথায় আছে দেখার চেষ্টা করল। মাথা কাত করে কান পেতে শুনে বোঝার চেষ্টা করল। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে পা টেনে টেনে ফিরে চলল নিজের কটেজের দিকে।

আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। কোন ঝুঁকিই আর নিতে চায় না। যেখানে আছে সে, জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার। বড় বড় গাছের ছায়া। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর সাবধানে পা বাড়াল। পকেটে টর্চ আছে। কিন্তু আলো না জ্বেলেও যেভাবে একের পর এক ঝামেলায় পড়ছে, তাতে টর্চ জ্বেলে পথ দেখার সাহস হলো না।

এগোতে গিয়ে কিসে যেন কপাল ঠুকে গেল তার। দাঁড়িয়ে গেল। হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কিসে লেগেছে। কাঠের লম্বা দণ্ডের মত লাগল। আরও ভাল করে দেখে বুঝল, মই। ব্যালকনিতে উঠে গেছে।

মই লাগিয়ে ব্যালকনিতে ওঠা! কৌতূহল হলো ওর। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। রেলিঙ টপকে ব্যালকনিতে নামল। হাত বুলিয়ে দরজার অস্তিত্ব অনুভব করল। ঠেলা দিয়ে দেখল, বন্ধ। ওপাশে আছে নাকি কেউ?

ঠেলাঠেলি করে খুলতে পারল না দরজাটা। নানা প্রশ্ন উদয় হতে লাগল মনে। কে এনে রাখল মইটা? রেলিঙে উঠেছিল? দরজা তো বন্ধ। উঠেই বা কি করবে? চোরটোর না তো? মই লাগিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিশোর আর ক্রেগের চেঁচামেচি শুনে লুকিয়ে পড়েছে। এখন হয়তো অন্ধকার কোনও ছায়ায় লুকিয়ে থেকে নজর রাখছে ওর ওপর।

নাহ্, আর এখানে থাকাটা বোধহয় নিরাপদ নয়। আজকাল চোরের কাছেও পিস্তল থাকে। বাধা দেখলে গুলি করতেও দ্বিধা করে না। থাকগে, এক রাতের জন্যে অনেক হয়েছে। কেটে পড়া দরকার।

তেরো

ওপরতলায় কিশোর যে ঘরটায় শোয়, তাতে এসে বসেছে সবাই। ওর গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল একেকজন। দুই ক্রেগকে দেখে ভূত ভেবে ফগের দৌড় দেয়ার কথায় যখন এল কিশোর, দম আটকে এল সবার। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। হাসারও আর শক্তি নেই।

পরদিন সকালে খোঁজ নিতে বব এসে হাজির হলে আরেকবার হাসাহাসি শুরু হলো। আবার পুরো ঘটনাটা বলতে হলো কিশোরকে। বলতে তার আপত্তি নেই। মজাই পাচ্ছে।

আটটা নাগাদ জনসন হাউসে যাওয়ার জন্যে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল সবাই। সাইকেলে চেপে চলল। মই রহস্যের সমাধান না করে কিশোরের স্বস্তি নেই।

সামনের গেট থেকে দূরে ঝোপের ধারে সাইকেলগুলো রেখে সৈকতে নামল ওরা। চলে এল পেছনের গেটের কাছে। টপাটপ গেট টপকে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'মইটা ওদিকে,' পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কিশোর।

কিন্তু বাড়ির কোণ ঘুরে অন্যপাশে আসতেই দেখল মইটা নেই। 'আরে, নেই তো! গেল কোথায়?...ছিল যে কোন সন্দেহ নেই। ওই দেখো, মাটিতে দাগ হয়ে আছে।'

সামনে পড়ল সেই জানালাটা। যেটাতে আগের বার উঁকি দিয়েছিল সে। আজও দিল। সেই একই ভাবে পড়ে আছে শুকনো ফুলগুলো। চেয়ার-টেবিলে ধুলো।

চঞ্চল হয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওর দৃষ্টি। কি যেন একটা নেই। কি নেই? কি নেই?...ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কাত হয়ে পড়ে থাকা টুলটার কাছে ছিল রবারের হাড়টা। এখন নেই।

অবাক কাণ্ড! বন্ধ ঘর থেকে হাড় গায়েব হলো কি করে? সবাইকে জানাল কথাটা।

'ভুল করনি তো?' রবিন বলল। 'কুকুরের একটা খেলনা কে চুরি করতে যাবে?'

'ভুল আমি করিনি। সত্যি অবাক লাগছে আমার!'

বাড়িটার আশপাশে ঘোরাঘুরি করে দেখতে লাগল ওরা আর কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। কোরির ডাক শোনা গেল। কান খাড়া করে ফেলল রাফি। কটেজের দিকে ছুটল। কাছে গিয়ে কুকুরের ভাষায় ডাক দিল কোরির নাম ধরে। সঙ্গে সঙ্গে জানালার ওপাশে লাফ দিয়ে উঠল কোরির মুখ। কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

ডাকতে ডাকতে ওর দিকে ছুটে গেল রাফি। চুরি করে ঢুকেছে ওরা, কুকুরের ডাক শুনে ক্রেগরা দেখতে এলে ঝামেলা হবে ভেবে তাড়াতাড়ি রাফিকে ধরে আনতে ছুটল জিনা। মিনিটখানেক পর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল।

'কিশোর! কিশোর!' চিৎকার করে বলতে লাগল সে, 'রবারের একটা হাড় দেখে এলাম! কোরির মুখে!'

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। কটেজের দিকে ছুটল। দেখল জানালায় নাক ঠেকিয়ে আছে কোরি। দাঁতে চেপে রেখেছে খেলনাটা। রাফিকে ওর সম্পত্তি দেখিয়ে আনন্দ পেতে চাইছে।

একবার দেখেই সহকারীদের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর, 'কুইক! বেরোও সবাই! জরুরী আলোচনা আছে!'

সামনের গেট দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল সবাই। চলে এল সাইকেলগুলো যেখানে রেখেছিল সেই ঝোপের কাছে। উত্তেজনায় চকচক করছে কিশোরের চোখ। বলল, 'কাল রাতে ক্রেগদেরই কেউ ঘরে ঢুকে হাড়টা বের করে এনেছে। ওরা ছাড়া আর কেউ ওটা আনতে যাবে না। জিনিসটা কোরির, সুতরাং...'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' বাধা দিয়ে বলল রবিন, 'যে কুত্তাটাকে কয়েক দিন আগেও পিটিয়ে হাড্ডি ভেঙে দিতে চেয়েছে ক্রেগ, সেটার জন্যেই রাত দুপুরে ঘরে ঢুকে সাধারণ খেলনা আনতে যাওয়ার কষ্টটা কেন করল সে?'

'টাকার জন্যে করেছে,' জবাব দিল কিশোর। 'হুফাররা আছে কাছাকাছি। কিংবা যাতায়াত আছে এ বাড়িতে। যেটা আগেই সন্দেহ করেছি আমরা। কাল রাতে ক্রেগের একটা কথা মনে পড়ছে। আমাকে দেখে ও জিজ্ঞেস করেছিল: আবার ফিরে এলাম কেন? তারমানে ছদ্মবেশে আমাকে দেখে হুফার বলে ভুল করেছিল

সে...'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফি। চমকে ফিরে তাকাল সবাই। কোরিকে ছুটে আসতে দেখল। কয়েক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল মিসেস ক্রেগের ডাক। কোরির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে পেছনের গেটের দিকে চলে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'যাহ্, দিল একটা বিরাট সুযোগ করে। জিনা, কুত্তাটাকে নিয়ে যাও। বলবে, রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল, দেখে ফিরিয়ে নিয়ে গেছ। এই ছুতোয় দেখো কথা বলে খেলনাটার ব্যাপারে কিছু জানতে পারো নাকি।'

কোরিকে নিয়ে কটেজের কাছে এসে দাঁড়াল জিনা। রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। হাড়টা দেখল না কোথাও, তবে আর যা দেখল চক্ষু স্থির করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

টেবিল ভর্তি টিনের খাবার। দামী, বড় বড় টিন। সন্দেহ হলো জিনার। পা টিপে টিপে গিয়ে উঁকি দিল শোবার ঘরে। বিছানায় পাতা নতুন একটা দামী চাদর। বালিশগুলোও নতুন। নিশ্চিত হয়ে গেল, ক্রেগই মই বেয়ে গিয়ে কাল রাতে প্রাসাদের ঘরে ঢুকেছিল। শুধু হাড়টাই নয়, খাবার, চাদর আর বালিশগুলোও চুরি করে এনেছে ওখান থেকে।

পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এল জিনা। মিসেস ক্রেগ ফিরে এসেছে। সেই ময়লা লাল চাদরটা গায়ে জড়ানো। মাথায় পরচুলা। চোখে সানগ্লাস। জিনার কোলে কোরিকে দেখে বলল, 'ও, পেয়েছ। রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বুঝি? আমি তো ভয়েই বাঁচি না। ভাবলাম, পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে সাগরে পড়ে গেল না তো।'

কোরিকে কোলে তুলে নিল মিসেস ক্রেগ।

আদর করে মহিলার গাল চেটে দিল কোরি।

অবাক লাগল জিনার। ফস করে বলে বসল, 'বাহ্, এখন তো বেশ পছন্দ করছে আপনাকে। প্রথম দিন যখন দেখলাম, করেনি কিন্তু, ভয় পাচ্ছিল।'

কোরিকে নামিয়ে রাখল মিসেস ক্রেগ। 'তুমি এখন যাও,' কঠিন, খসখসে হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর। 'না বলে ঘরে ঢোকাটা উচিত হয়নি তোমার।'

'যাচ্ছি,' ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে ঘরের কোণে চোখ পড়ল জিনার। 'ও, ওটা বুঝি কোরির বিছানা? বাহ্, রবারের হাড়টাও আছে দেখি।'

এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে হাড়টা তুলে নিতে গেল সে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল মিসেস ক্রেগ। 'তোমাকে বেরিয়ে যেতে বললাম না!'

বেরিয়ে এল জিনা। কিন্তু গেল না। দরজা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় রইল। তারপর পা টিপে টিপে গিয়ে আবার জানালা দিয়ে উঁকি দিল। কুকুরের বিছানায় চটের তৈরি একটা গদি পেতে দিল। তাতে আস্তে করে নামিয়ে রাখল কোরিকে। ছোট একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। কুকুরটা আরাম পেয়ে কুঁই কুঁই করছে।

আর কিছু দেখার নেই। গেটের দিকে এগোল জিনা। ভাবতে ভাবতে হাঁটছে। ঘটনাটা কি? প্রথম দিন ধরে হাড্ডি ভাঙে, আর আজকে এত আদর! এতটাই বদলে গেল মিসেস ক্রেগ! কি জিনিস তাকে এ ভাবে বদলে দিল? নিশ্চয় টাকা। কোরির

সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার জন্যে কত টাকা দিয়ে গেছে ওদের মিসেস হুফার?

ফিরে এসে সব কথা জানাল জিনা। কি কি দেখে এসেছে বলল। 'মিসেস ক্রেগের সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি আমার। একটা প্রশ্ন করতেই খাউ খাউ করে উঠে ঘর থেকে বের করে দিল...'

'ওই দেখো, কে,' বলে উঠল মুসা। গেটের দিকে নজর। 'বাজার করতে গিয়েছিল নাকি ক্রেগ? হাতে তো শুধু খবরের কাগজের বস্তা।'

সেদিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'তাই তো থাকবে। জানতে হবে না, পুলিশের কাজে কতখানি অগ্রগতি হলো। ধরা পড়ল নাকি হুফাররা।'

'অনেক কিছুই তো জানলাম। কি করব এখন?'

জবাব দিল না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হঠাৎ করেই যেন হারিয়ে গেল ভাবনার জগতে। ওর খুলির ভেতরের বিশাল মগজটায় যে এখন প্রচণ্ড গতিতে নানা রকম চিন্তা চলছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। চুপ করে রইল সবাই।

মুসার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল বব, 'আবার যখন মুখ খুলবে, দেখো বলবে, সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। ও একটা বিস্ময়!'

'অ্যাঁ, কি বললে? বিস্ময়?' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর, 'হ্যাঁ, সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি একটা গাধা। নইলে আরও অনেক আগেই ধরে ফেলা উচিত ছিল।'

হাসি ফুটল ববের মুখে। উত্তেজনায় চকচক করে উঠল চোখ। মুসার দিকে তাকিয়ে 'কি বলেছিলাম না' গোছের একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে ধাঁধার জট খুলে ফেলেছ!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। একটা প্রশ্নের জবাব কেবল খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সেটা কি?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ওঠো। এসো।'

'কোথায়?'

'পুলিশকে ফোন করতে হবে।'

'চাচাকে!'

'আরে নাহ্। শেরিফ আঙ্কেলকে।'

কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সাইকেলের দিকে ছুটল কিশোর।

সবচেয়ে কাছের বুদটায় এসে ফোন করতে ঢুকল সে। অস্থির হয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

মিনিটখানেক পর বেরিয়ে এসে কিশোর বলল, 'চলো, জনসন হাউসের গেটের কাছে গিয়ে বসে থাকি। পুলিশ আসছে।'

'শেরিফ আঙ্কেল?' জানতে চাইল জিনা।

'হ্যাঁ।'

মুসা বলল, 'ব্যাপারটা কি, আমাদের বলবে তো...'

'বলব। এখন সময় নেই। গেটের কাছে চলো।'

আবার জনসন হাউসের গেটের কাছে ফিরে এল ওরা। ঝোপের কাছে অতদূরে

আর গেল না। গেটের পাশে রাস্তার কিনারে সাইকেল রেখে ঘাসের ওপরই বসে পড়ল।

বব বলল, 'এবার তো বলতে পারবে…'

সাইকেলের ঘণ্টা শুনে ফিরে তাকিয়েই এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বব। দৌড়ে গিয়ে বসে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফি।

রাস্তার মোড় ঘুরে বেরিয়ে এসেছে ফগ। ওদের কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল। আড়চোখে তাকাল রাফির দিকে। জিনা ওর গলার বেল্ট ধরে রেখেছে। নইলে গিয়ে ফগের বুকে পা তুলে দেবে। কানের কাছে হাঁক ছেড়ে ভড়কে দেয়ার মজা পেয়ে গেছে।

'ঝামেলা!' কর্কশ কণ্ঠে বলল ফগ, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

'বসে আছি, দেখতেই তো পাচ্ছেন,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'যাও এখান থেকে! ভাগো!'

'কাজ না থাকলে চলে যেতাম। কিন্তু একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কে!'

'আপনার বস্।'

ঢোক গিলল ফগ। 'ঝামেলা! কার কথা বলছ?'

'বুঝেছেন তো ঠিকই। শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান।'

আবার ঢোক গিলল ফগ। 'তিনি এখানে আসবেন…' বুঝতে সময় লাগল না ওর। 'রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছ নাকি?'

'বসুন আমাদের সঙ্গে। শেরিফ আঙ্কেল এলেই দেখতে পাবেন।'

তোয়ালের সমান বড় রুমাল বের করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগল ফগ। শীতের মধ্যেও দরদর করে ঘামছে।

কয়েক মিনিট পরই গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এল। পথের মোড়ে দেখা গেল একটা বড়, নীল রঙের পুলিশ-কার।

চোদ্দ

'গুড মর্নিং, আঙ্কেল,' এগিয়ে গেল কিশোর।

গাড়ির দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ, 'গুড মর্নিং। সবাই আছ দেখা যাচ্ছে।…ফগর‍্যাম্পারকট, তুমিও…ভালই হলো। খবর দিয়ে আর আনানো লাগল না।'

'আমি এসেছিলাম, স্যার, খোঁজ নিতে। রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল…'

'শুনব সব। এসো।'

এতক্ষণে সাহস করে ঝোপের আড়াল থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল বব।

'তুই…' চিৎকার করে উঠেও শেরিফের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ফগ।

আবার ডাইভ দিয়ে ঝোপের আড়ালে পড়তে গিয়েও পড়ল না বব। বুঝল,

শেরিফের সামনে তাকে মারার সাহস পাবে না চাচা।
ভুরু কুঁচকে ফেললেন শেরিফ, 'ছেলেটা কে? এত ভয় পাচ্ছে কেন?'
হেসে ফেলল কিশোর, 'পাবে না, কড়া শাসনে রাখেন চাচা। ওর নাম ববর‍্যাম্পারকট, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটের আপন ভাতিজা।'
শেরিফের কঠোর দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল ফগ। ববের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন, 'এই ছেলে, এসো। কিছু বলবে?'
দ্বিধা করে বব বলল, 'না, স্যার…'
'ও আমাদের সঙ্গেই কাজ করেছে এবার,' কিশোর বলল। 'রহস্যের সমাধানে অনেক সহযোগিতা করেছে।'
আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সহযোগিতার কথা শুনে ধক করে জ্বলে উঠল ফগের চোখ। মুচকি হাসল কিশোর।
'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'এখন বলো তো সব। কি জন্যে ডেকে আনলে আমাকে? হুফাররা কোথায়?'
আবার ফগের দিকে তাকাল কিশোর। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন ওর গোলআলুর মত চোখ দুটো।
'ক্রেগদের কটেজে লুকিয়ে আছে,' ফগের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর।
'ঝামেলা!' চিৎকার করতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল ফগ। 'অসম্ভব! তিনবার কটেজটায় ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি আমি। লুকানোর কোন জায়গাই নেই।'
'আছে,' শেরিফের দিকে তাকাল কিশোর। 'আঙ্কেল, আসুন।'
গেট দিয়ে ঢুকে আগে আগে হাঁটতে লাগল কিশোর। অনুসরণ করল তাকে বাকি সবাই। তার সহকারীরা বিমূঢ়। ফগ রাগে লাল। শেরিফের সঙ্গে আরেকজন এসেছে, তাঁর ডেপুটি। ভাবলেশহীন মুখে সে-ও চলল সবার পেছন পেছন।
কটেজের সামনের দরজাটা লাগানো। থাবা দিল কিশোর। সামান্য ফাঁক হলো পাল্লা। উঁকি দিল ক্রেগের মুখ। টুপিটা চোখের ওপর টেনে নামানো।
ভারী লেন্সের ভেতর দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কি চাই?'
বলেই চোখ পড়ল পেছনের দলটার দিকে। তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে দিতে গেল।
ঝট করে পা বাড়িয়ে দিল কিশোর। আগের রাতে ফগ যেমন করে দিয়েছিল।
'ভেতরে ঢুকব আমরা,' বলল শেরিফের ডেপুটি। ক্রেগকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজা পুরো খুলে ধরল।
এক এক করে ঢুকে পড়ল সবাই। রাফি সহ।
'এ সব কি?' শুকনো গলায় বলল ক্রেগ। 'পুলিশ কেন? আমি তো কিছু করিনি।'
অনেক মানুষ। ছোট্ট ঘরটা ভরে গেছে। এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রেগ।
তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর, 'এই যে, হুফারদের একজন।' বলেই একটানে মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে আনল। তারপর দু'তিন টানে খুলে ফেলল দাড়ি,

ভুরু, চশমা। চোখের পলকে বুড়ো অসহায় একজন মানুষ যুবকে পরিণত হলো। চোখে রাগ আর ভয় একসঙ্গে ফুটে উঠেছে।

'জন হুফার, তুমি এখানে,' শেরিফ বললেন, 'আর আমরা কত জায়গায় না খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'প্রথমে এখানে ছিল না,' কিশোর বলল। 'আসল ক্রেগ আর তার বউই ছিল···ওই যে, আরেকজন আসছে।'

দরজায় এসেই যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মিসেস ক্রেগ। কোলে খুদে কুকুরটা। মুহূর্তে সামলে নিয়ে পিছিয়ে গেল। দরজা লাগিয়ে দেয়ার আগেই পা বাড়িয়ে দিল কিশোর। একেও লাগাতে দিল না।

'আর ইনি হলেন মিসেস হুফার,' বলে টান দিয়ে মাথার পরচুলাটা খুলে নিয়ে এল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল সোনালি চুল। মিসেস ক্রেগের মত মোটেও টাকমাথা নয়।

এবারেও সামলে নিতে সময় লাগল না মহিলার। শান্তকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি মিসেস ক্লোরিন হুফার। বিশ্রী উইগটা মাথা থেকে খসাতে পেরে খুশিই লাগছে।···জন, খেল খতম।'

মাথা ঝাঁকাল হুফার।

'ভাল ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন,' একবার হুফারের দিকে, একবার ক্লোরিনের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর, 'পারও পেয়ে গিয়েছিলেন প্রায়। কেউ ভাবতেই পারেনি আপনারা ক্রেগ নন।'

কটেজেই কোথাও আছে ভেবে দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে তাকালেন শেরিফ। 'আসল ক্রেগরা কোথায়?'

'কাল রাতে এখানেই দেখেছি,' ফগ বলল। হুফারকে দেখাল, 'এই লোকটাও ছিল। ক্রেগের ছদ্মবেশে।'

'দুজনে একসঙ্গে?' অবাক হলেন শেরিফ। 'ধরলে না কেন? নাকি এক চেহারার দুই মানুষকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলে?'

রাতের কথা ভেবে হেসে ফেলল কিশোর। 'একজন ছিলাম আমি। হুফারের মতই ছদ্মবেশ নিয়েছিলাম। সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, বহুত ভোগান ভুগিয়েছি কাল রাতে আপনাকে। কিছু মনে করবেন না।'

মনে করা মানে! ফগের চোখ দেখে মনে হলো, পারলে ওখানেই ভস্ম করে দেয় 'বিচ্ছু ছেলেটাকে'। কিন্তু শেরিফ সামনে থাকায় কিছুই করতে পারল না। গোল চোখ আরও গোল হলো। লাল গাল আরও টকটকে।

'আসল ক্রেগরা তাহলে কোনখানে?' আবার জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ।

'খুলেই বলি,' কিশোর বলল। 'শুরুতে ওরা এখানেই ছিল। কোরি, মানে ওই পুডলটাকে রেখে যাওয়া হয়েছিল ওদের দায়িত্বে। আহা, যা দায়িত্ব পালন করেছে না ওরা। মেরেধরে শেষ করেছে। ওদের গলা শুনলেও আতঙ্কে কুঁকড়ে যেত বেচারা। তারপর একরাতে একটা মোটর লঞ্চ ভাড়া করে হেরিং বীচ থেকে এখানে এসে পৌঁছল হুফাররা···'

'এত কথা তুমি জানলে কি করে?' রাগত স্বরে বলে উঠল হুফার। 'দলের

কেউ বেঈমানী করেছে আমাদের সঙ্গে?'

'না। জেনেছি তদন্ত করে। গোয়েন্দাগিরি।...যা বলছিলাম। ক্রেগকে আগেই বলে রাখা হয়েছিল। নৌকা নিয়ে রাত দুপুরে আপনাদের বোট থেকে নামিয়ে আনতে গেল সে। আপনাদের সঙ্গে পোশাক বদল করল সে আর তার বউ। এ জন্যে কত টাকা দিয়েছেন ওদের?'

জবাব দিল না হুফার।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল কিশোর, 'আপনারা রয়ে গেলেন কটেজে। ক্রেগরা ফিরে গেল বোটে। ওই সময় মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট ছিল এখানে। অসুবিধা করছিল আপনাদের। শেষমেষ বয়লার হাউসে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে আপনাদের সুবিধে করে দিল। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে ওকে আটকে রাখলেন। নিরাপদে কাজ সারার জন্যে। তাই না?'

এবারেও জবাব দিল না হুফার।

চোখ কটমট করে তাকাল ওর দিকে ফগ।

'কোন গোপন জায়গায় নিশ্চয় পৌঁছে দেয়া হয়েছে ক্রেগদের,' আবার বলল কিশোর, 'যেখানে পুলিশের চোখে পড়বে না। প্রথমে বোট থেকে সে গিয়ে আপনাদের নিয়ে এসেছিল। তারপর সে আর তার বউ পোশাক বদল করে কটেজ বুঝিয়ে দেয়ার পর ওদেরকে নিয়ে গিয়ে বোটে দিয়ে এসেছিলেন আপনি। ঠিক বললাম তো?'

চুপ করে রইল হুফার।

'ভাল বুদ্ধি বের করেছিলে তো,' হুফারের দিকে তাকালেন শেরিফ। 'ভেবেছিলে, সবার চোখের সামনে থেকেও কারও চোখে পড়বে না। অনেকটা হয়েওছিল তাই।'

'আর দুজনেই যেহেতু অভিনেতা,' কিশোর বলল, 'ক্রেগ আর তার স্ত্রীর জায়গায় চমৎকার অভিনয় করে যাচ্ছিল।'

'কাল রাতে তাহলে তোমাকেই দেখেছি,' তিক্তকণ্ঠে বলল হুফার। 'আর আমি ভাবলাম কিনা ক্রেগ। অবাক হয়েছিলাম। কি করে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল সে বুঝতে পারছিলাম না।'

'তারমানে বহুত দূরে কোথাও পাঠিয়েছেন। যাই হোক, আপনার কথা থেকেই সূত্র পেয়ে গেলাম। "আবার ফিরে এলে কেন?" বলে কাকে কি বোঝাতে চেয়েছেন ভালমত ভাবতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আরও একটা ব্যাপার, আমাকে ক্রেগের ছদ্মবেশে দেখে অবাক হওয়ার কথা। হননি। তারমানে আপনি মনে করেছেন আমিই ক্রেগ। আর আমি বুঝে গেলাম আপনি ক্রেগ নন।'

গুঙিয়ে উঠল ফগ। সব কিছু বড় সহজ মনে হচ্ছে এখন তার কাছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। সামনে দিয়ে কতবার ঘুরে গিয়েও কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ ওই বিচ্ছু ছেলেটা ঠিকই বুঝে ফেলল।

'আসল সূত্রটা পাওয়ার আগে কয়েকটা জিনিস সন্দেহ জাগিয়েছে আমার,' কিশোর বলল। 'এই যেমন, ব্যালকনিতে লাগানো মই দেখলাম কাল রাতে, আজ এসে দেখি নেই। প্রথম দিন ঢুকে রবারের খেলনা হাড় দেখলাম প্রাসাদের ঘরে,

আজ সকালে দেখি ওটাও নেই...'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল হুফার, 'তোমাকে তখনই বলেছিলাম, খেলনাটা বের কোরো না!'

জবাব দিল না ক্লোরিন।

মুচকি হাসল কিশোর। বলল, 'কিছুক্ষণ আগে কোরিকে ফেরত দিতে এসে জিনা দেখেছে রান্নাঘরের টেবিল ভর্তি দামী দামী টিনের খাবার, শোবার ঘরে দামী চাদর পাতা, নতুন বালিশ...আমি যখন মিটার রীডারের ছদ্মবেশে ঢুকেছিলাম, ওসব কিছুই ছিল না। বুঝলাম, রাতে মই লাগিয়ে ব্যালকনি দিয়ে ঢুকে প্রাসাদ থেকে চুরি করে আনা হয়েছে ওগুলো। সন্দেহ করার কারণ আরও আছে। প্রথম দিন দেখলাম ক্রেগ আর তার বউকে দেখলেই আতঙ্কে সিটকে যায় কোরি, তারপর হঠাৎ করে দেখা গেল আনন্দে অস্থির হয়ে আছে সে, জিনা দেখে গেল আদর করে মিসেস ক্রেগের গালও নাকি চেটে দিচ্ছে কুকুরটা...'

'এই কুত্তাটাই ডুবাল!' তিক্তকণ্ঠে বলল হুফার। 'এটা না থাকলে রাতে এসে দিব্যি ছবিটা নিয়ে কেটে পড়তে পারতাম। ক্রেগের ছদ্মবেশ ধরা লাগত না, এত কষ্টও করা লাগত না...'

'ভাল কথা মনে করেছ,' সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলেন শেরিফ। 'ছবিটা কোথায়?'

চুপ হয়ে গেল হুফার। বড় দেরিতে বুঝল, রাগের মাথায় ছবির কথা বলে মস্ত ভুল করে ফেলেছে।

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল ক্লোরিন। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

হুফারকে চুপ করে থাকতে দেখে কিশোরের দিকে তাকালেন শেরিফ। জানেন, সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ওখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবিটা কোথায় আছে জানো নাকি?'

শক্ত হয়ে গেল দুই হুফার। তাকিয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

গাল চুলকাল কিশোর। 'না জানলেই বোধহয় খুশি হয় এরা দুজন। ছবিটা পাওয়া না গেলে, হাতেমাতে চোরাই মাল সহ ধরতে না পারলে ফাঁসাতে পারবে না পুলিশ। ছদ্মবেশ নিয়ে তেমন কোন অপরাধ করেনি। জেলে ভরতে পারবে না পুলিশ। ফিরে এসে ছবিটা নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারত। বিক্রি করে বাকি জীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটাতে পারত।...সকাল বেলা জিনা এখানে না ঢুকলে সত্যি জানতাম না ছবিটা কোথায় আছে। তবে এখন আন্দাজ করতে পারছি।'

চেঁচিয়ে উঠল ক্লোরিন, 'কোথায়?'

মিটিমিটি হাসছে কিশোর। 'কেন, আপনি জানেন না? জিনা বেরিয়ে যাওয়ার পর জানালার দিকে নজর রাখা উচিত ছিল আপনার। ওর যে সন্দেহ হতে পারে, অন্য কোনখান দিয়ে উঁকি দিতে পারে, ভাবলে ভাল করতেন। কোরির বিছানার নিচ থেকে কম্বলটা বের করে চটের বিছানাটা না ঢোকালেই আর কিছু বুঝতে পারতাম না। জিনার কথায় এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আপনি, লুকানোর জন্যে আর তর সইছিল না। এটাও কিন্তু ভাল ফন্দি ছিল—চটের মাঝখানে ছবি ভরে সেলাই করে কুকুরের গদি বানানোর বুদ্ধি। সত্যি, কারও চোখে পড়ত না। ছবি নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে

যাওয়ার সময় পুলিশের চোখেও নয়।'

মুখ কালো হয়ে গেল দুই হুফারের। পুরোপুরি হতাশ।

হাসি ফুটল শেরিফের মুখে। কিশোরের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'আবার সাহায্য করলে পুলিশকে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।' ফগের দিকে তাকালেন, 'কি বলো, ফগর‍্যাম্পারকট?'

কি বলবে ফগ? মুখ কাঁচুমাচু করে ফেলল। কিছুই বলার নেই তার। মেঝেতে পড়ে থাকা রবারের হাড়টার দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল, মানুষ না হয়ে খেলনা হওয়াটাও অনেক ভাল ছিল। এত অপমান সইতে হত না।

ছবিটা বের করা হলো।

হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো দুই হুফারকে।

গাড়িতে ওঠার আগে ফিরে তাকাল ক্লোরিন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিশোর, অনেক ক্ষতি করলে আমাদের। তারপরেও একটা অনুরোধ করব। আশা করি রাখবে। আমার কোরির দায়িত্ব কি নেবে তোমরা? নইলে ও একেবারে এতিম হয়ে যাবে!'

একটুও দ্বিধা না করে জবাব দিল কিশোর, 'হ্যাঁ, নেব। কোথায় ও?'

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। দেখল, গেটের কাছে রাফির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে খুদে কুকুরটা। ওর মালিক কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছে না। ভাবছে, যা ঘটছে, এটাও আরেকটা খেলা। আগের মতই হাসিখুশি।

জিনা গিয়ে কোলে তুলে নিল কোরিকে।

হাসি ফুটল ক্লোরিনের মুখে। 'তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে গেলাম। আশা করি, জেল থেকে ফিরে এসে আমার কোরিকে ঠিকমতই পাব। কথা দাও আমাকে!'

'পাবেন! নিশ্চয় পাবেন!'

সমস্বরে চিৎকার করে উঠল জিনা আর তিন গোয়েন্দা। ববও সুর মেলাল ওদের সঙ্গে।

***

দুর্গম কারাগার

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

একঘেয়ে গুঞ্জন তুলে আকাশের যতটা সম্ভব ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওকিমুরো কর্পোরেশনের একটা মার্লিন বিমান। নিচে মধ্যরাতের চাঁদ আর তারার আলোয় চকচক করছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের বরফ শীতল পানি। পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে জাপানের উত্তর সীমান্ত থেকে শাখালিন দ্বীপকে আলাদা করে রাখা সঙ্কীর্ণ লা পেরুই স্ট্রেইট। পুবে, বেশ কিছুটা দূরে, সীমান্ত রেখা ঘেঁষে অস্পষ্ট হয়ে আছে কুরাইল আইল্যান্ড। সামনে শাখালিন দ্বীপ ক্রমশ এগিয়ে গেছে অরোরা বোরিয়ালিসের ফ্যাকাসে রশ্মির দিকে। পুঞ্জীভূত কালো দঙ্গল যেন। এখানে ওখানে দু'চারটা মিটমিটে আলো।

চুপচাপ দেখছে ওমরের পাশে বসা কিশোর। প্লেন চালাচ্ছে ওমর।

নিরাপদেই এসেছে এতক্ষণ। আমেরিকা থেকে রওনা হয়েছিল সাত দিন আগে। পথে কয়েকটা এয়ার পোর্টে নামতে হয়েছে। তেল নেয়া আর কাস্টমসের ঝামেলা মিটানোর জন্যে। সর্বশেষ স্টপেজ জাপানের উত্তর সীমান্তের একটা অখ্যাত বিমান বন্দর। সেটা থেকে উড়েই এখন এখানে পৌঁছেছে।

ওদের লক্ষ্যস্থল শাখালিন দ্বীপ। সাইবেরিয়ার উপকূলে গাল্ফ অভ টারটারি আর সী অভ অখোটস্কের মাঝের এই দ্বীপটা জাপানের খুব কাছে। মালিক রাশিয়া। জারদের আমল থেকেই এর বদনাম। শাখালিন কারাগারের নাম শুনলে বড় বড় চোর-ডাকাতেরও বুক কেঁপে উঠত। প্রধানত রাজনৈতিক বন্দিদের পাঠানো হত ওখানে। জারেরা গেল, সমাজতন্ত্র এল, তারও অনেক পরে ভেঙে টুকরো টুকরো হলো রাশিয়া, কিন্তু শোনা যায় শাখালিন যা ছিল তা-ই রয়ে গেছে আজও; শাস্তির নামে মানুষকে পাঠানো হত ওখানে এক সময় অমানবিক অত্যাচার সয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হওয়ার জন্যে, পুরো মানবজাতির ওপর তীব্র ঘৃণা আর অভিমান নিয়ে মরার জন্যে।

শাখালিন–ছয়শো মাইল লম্বা; চওড়ায় কোথাও একশো পঁচিশ, কোথাও বা আরও কম, মাত্র ষোলো মাইল। সাইবেরিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে যে গাল্ফ অভ টারটারি, সেটাও চওড়ায় এক রকম নয়–কোথাও আট মাইল, কোথাও বিশ। দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণে মেরুদণ্ডের মত গজিয়ে ওঠা পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু অংশটার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। পুরো দ্বীপটাই প্রায় ফার আর লার্চ বনে ছাওয়া; তার মধ্যে বাস করে এল্‌ক হরিণ, ভালুক, নেকড়ে আর শীতপ্রধান অঞ্চলের নানা রকম জানোয়ার–শীতের সময় তাতার প্যাসেজ জমে গেলে মূল ভূখণ্ড থেকে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে চলে আসে ওগুলো।

বছরের বারো মাসই শীত থাকে এখানে, সূর্যের দেখা পাওয়া ভার। শুধু শিকার আর মাছ ধরার ওপর নির্ভর করে আদিম কায়দায় জীবন টেনে নিয়ে বেড়ায় এখানে কিছু প্রাচীন উপজাতির মানুষ। ওদের প্রধান খাদ্য শুকনো মাছ। বড় বড় কাঁকড়া রোদে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে রুটির মত বানিয়ে খায়। তেল, কয়লা আর নানা রকম খনিজ প্রচুর পাওয়া যায় ওখানে। প্রধান দুটো শহরের নাম ডুই আর আলেকজান্দ্রোভস্ক্।

ভাবছে কিশোর। এখানে আসার উদ্দেশ্য—রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ডকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। ছয় মাস আগে আমেরিকা থেকে জাপানের উদ্দেশে রওনা দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন তিনি। তদন্ত করে জানতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম কারাগার শাখালিন দেখার জন্যে যাত্রা করেছিলেন তিনি। একটা মানবাধিকার কল্যাণ সংস্থার অনুরোধে, তাদের খরচে এসেছিলেন এখানে। শাখালিনে এখনও অমানবিক, ভয়াবহ অত্যাচার চলে বন্দিদের ওপর—এটা গোপনে দেখে যাওয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিবেদন লিখে কর্তৃপক্ষের শয়তানির খবর ফাঁস করে দেবেন পৃথিবীবাসীর কাছে। প্রতিকারের আবেদন জানাবেন।

নিরাপদেই জাপান পৌঁছেছিলেন তিনি। উত্তর সীমান্তের অখ্যাত একটা এয়ার পোর্ট থেকে বিমান ভাড়া করেন শাখালিনে আসার জন্যে। পাইলট ছিল এক জাপানী, নাম মিকোশা ওয়াসাকি। জাপান থেকে রওনা দেয়ার পর বিমান সহ নিখোঁজ হয়ে গেল দুজনে।

মাস তিনেক আগে রকি বীচের বিখ্যাত গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের সহায়তায় নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, শাখালিন কারাগারে আটকে আছেন মিস্টার মিলফোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলল রবিন, বাবাকে মুক্ত করে আনতে যাবে। বলা বাহুল্য, তাকে সাহায্য করতে, তার সঙ্গে আসতে রাজি হয়ে গেল কিশোর, মুসা আর ওমর।

চঞ্চল হয়ে চতুর্দিকে ঘুরছে ওমরের চোখ। ল্যান্ড করবে কোথায়, সেটাই এখন প্রধান সমস্যা। সামান্যতম ভুলও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রাণ যেতে পারে, কিংবা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে বাড়ি ফেরার পথ।

তাতার প্রণালীর শক্ত বরফে নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিংবা দ্বীপের উল্টো দিকের কোন খাঁড়ি বা নদীতে। খোলা সাগরে নামার কথা কল্পনায় আনাও ঠিক হবে না, কারণ সী অভ অখোটস্ক সব সময়ই ভয়ানক উত্তাল থাকে। তাতার প্রণালীর বরফ নামার মত শক্ত আছে কিনা, বোঝার উপায় নেই।

রাতের বেলা। যদি নিরাপদে নামা সম্ভবও হয়, ঠিক জায়গায় নামল কিনা সেটাও বুঝতে হবে। হয়তো ভুল জায়গায় নেমে বসল, জেলখানা যেখান থেকে অনেক দূর। হেঁটে পৌঁছা তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে। খাঁড়ি আর নদীর প্রকৃত অবস্থাও জানা নেই। পাথরে বোঝাই প্রান্তর বা অন্য কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতাও থাকতে পারে। দিনে হলে এ সব দেখা অনেক সহজ হত, কিন্তু দিনের বেলা প্রহরীদের ভয় আছে। তাদের নজর এড়িয়ে কোনমতেই ল্যান্ড করা সম্ভব না।

সমস্যা আরও আছে। শুনে এসেছে জেলখানাটা দ্বীপের যে দিকে, সে-পাশটায় গোটা তিনেক খাঁড়ি আছে। নদীর মোহনা আছে। আন্দাজে সে-সব জায়গায় নামানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। নামতে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা থেকে ভাগ্যক্রমে

বেঁচেও যায়, দেখা দেবে প্লেন লুকানোর সমস্যা।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে মার্লিন। সবাই চুপ। কিন্তু নামানোর সাহস করতে পারল না ওমর। আবার ফিরে গেল সাগরের ওপর। এ সব ঘোরাঘুরিরও বিপদ আছে। রাডারের পর্দায় কেউ চোখ রেখে থাকলে দেখে ফেলবে।

গতি কমাল ওমর। এক ধাপ কমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। মাটির বুকে লম্বা কালো দাগের মত একটা জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। বিমান যতই নামছে, ধীরে, অতি ধীরে একটা বিশেষ রূপ নিচ্ছে দাগটা। দশ হাজার ফুট ওপরে থাকতে যতটা পারল ইঞ্জিনের শব্দ কমিয়ে দিল ওমর। কাত করে দিয়েছে বাঁ-দিকের ডানা। তাতে দ্রুত নামা সম্ভব হচ্ছে। কথা নেই মুখে। তাকিয়ে আছে এগোতে থাকা বিষণ্ন অন্ধকারে ঢাকা ভূমিটার দিকে।

নদীর মোহনাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চোখ, ছবিতে যেটা দেখে এসেছে। এখন জোয়ারের সময়। সঠিক জায়গায় নামতে পারলে স্রোতই তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে ওদের, ইঞ্জিন চালু করা লাগবে না। ছবিতে আরও দেখেছে, উজানের দিকে ছড়ানো ছিটানো কিছু কুঁড়ে আছে। লোক আছে কিনা ওগুলোতে, থাকলে কারা, ছবি দেখে সেটা জানা যায়নি।

নদীর পাড়ে পৌঁছানোটাই সমস্যার সমাধান নয়। জঙ্গল না থেকে যদি খোলা বালির চরা হয় তাহলে লাভ নেই, প্লেন লুকানোর জায়গা পাবে না। খোলা জায়গায় রেখে দিয়ে, কারও চোখে পড়বে না–এটা ভাবাটাও বোকামি। পাহাড়ের দেয়াল যদি থাকে, আর তার মধ্যে বড় ধরনের ফাটল, ফাঁক-ফোকর বা খাঁজ, যার মধ্যে পানি ঢুকে গেছে, তাহলে সুবিধে হয়। ভেতরে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু আছে কিনা অন্ধকারে এত ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ঝুঁকি নিতে হবে, নামতে হবে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, আর কোন উপায় নেই।

মুসা জানিয়ে গেল, বাতাস প্রায় নেই।

নেমেই চলেছে বিমান। এক হাজার ফুট ওপর থেকে নিচের দৃশ্য অনেকটা স্পষ্ট হলো, যদিও সব কিছু নিখুঁত ভাবে বোঝা যাচ্ছে না এখনও। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে ওমরের স্নায়ু।

কিশোর তাকিয়ে আছে মোহনার দিকে। অনেক চওড়া। অতটা আশা করেনি। জোয়ারের কারণে ঢালু জায়গাগুলোতে পানি উঠে যাওয়াতে বোধহয় এ রকম লাগছে। উজানের দিকে নদী অনেক সরু।

ঈগলের মত ডানা মেলে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে গ্লাইড করে চলেছে এখন বিমান। সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে ওমর।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল কিশোর। উদ্বেগ উত্তেজনায় বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে। আসল সময় উপস্থিত। পরের দু'তিন মিনিটেই ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে ওদের। হয় ধসে পড়বে বিমান, নয়তো নিরাপদ অবতরণ। কালো পানিতে তারার প্রতিবিম্ব। বাতাস নেই। তাই ঢেউও নেই। পানি শান্ত।

কন্ট্রোল কলামটা সামনে ঠেলে দিল ওমর। ঝপাং করে পানিতে আঘাত হানল বিমানের তলা। বার দুই ওঠা-নামা করে ঝাঁকি খেল, কয়লা-কালো তটরেখা বরাবর ছুটে গেল পঞ্চাশ-ষাট গজ।

সুইচ অফ করে দিল ওমর। অকস্মাৎ নীরবতা যেন গ্রাস করে ফেলল ওদের। ঠাণ্ডা, ভোঁতা, ভয়ানক নীরবতা।

ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল ওমরের নাক দিয়ে। 'যাক, নিরাপদেই নামলাম। মনে হচ্ছে প্লেনের কোন ক্ষতি হয়নি।'

দরজায় উঁকি দিল রবিন, 'বেঁচেই আছি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। নদীর ওপরেই আছি এখনও, তলায় যাইনি,' জবাব দিল ওমর। 'ডিঙি নামাতে হবে। তীরের অবস্থা দেখা দরকার। আশা করছি স্রোতে ঠেলে কিনারে নিয়ে যাবে। না নিলে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে কোথাও। আমি বললে তারপর ডিঙি নামাবে। আগে শিওর হয়ে নিই, আমাদের ল্যান্ডিঙের খবর কেউ জেনে ফেলল কিনা।'

ওমরের সঙ্গে বিমানের পিঠে উঠল কিশোর। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকাল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কান খাড়া। কোন শব্দ নেই। মনে হচ্ছে ভুল করে কোন মরা গ্রহে নেমে পড়েছে। ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড। ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস।

কয়েক মিনিট দেখার পর ওমর বলল, 'স্রোতে ঠেলছে কিন্তু। কোথায় চলেছি দেখা যাক।'

বাতাসে ফোলানো রবারের ডিঙি নামানো হলো। কিশোর আর ওমর গেল দেখতে। দাঁড় বেয়ে এগোল। অদূরেই তীর। আট-দশ ফুট উঁচু নলখাগড়া জন্মে আছে অগভীর পানিতে। তীর আর পানির মাঝখানে বেড়া তৈরি করে রেখেছে।

সন্তুষ্ট হলো ওমর। 'এর মধ্যে লুকানো যাবে মনে হচ্ছে।'

মুখের কথা মুখেই রইল ওর, শোনা গেল ভয়ঙ্কর ফড়ফড় ফড়ফড় শব্দ। এতটাই চমকে গেল কিশোর, দাঁড় বাইতে বাইতে আরেকটু হলে পানিতে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। একটানা শব্দ হচ্ছে তো হচ্ছেই। থামাথামি নেই যেন আর।

আকাশ ঢেকে দিল বুনো হাঁসের বিশাল ঝাঁক।

ধীরে ধীরে কমে এল ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

'নলখাগড়ার বনে বিশ্রাম করছিল,' ওমর বলল। 'রাত দুপুরে নৌকা দেখে ভড়কে গেলে ওদের দোষ দেয়া যায় না। আমাদেরই বা দোষ কি। আমরা কি আর জানি।'

'বাপরে বাপ, কি শব্দের শব্দ!' কাঁপা স্বর বেরোল কিশোরের কণ্ঠ থেকে। 'আমি তো ভাবলাম না জানি কি!'

'তবে যা-ই বলো, জ্বালাবে ওরা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'এখন চলে গেলেও আবার ফিরবে। ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।...দাঁড় থামালে কেন? এগোও। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক চাঁদের আলো পাব। এর মধ্যেই প্লেনটা লুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তীর বরাবর নৌকা বেয়ে চলল ওরা। একপাশে নলখাগড়ার বেড়া। ভালমত দেখে বোঝা গেল, ভৌগোলিক কোন কারণে সরাসরি কিংবা তীরের সমান্তরালে এগোয়নি নলখাগড়ার বেড়া। কোথাও তীর থেকে নদীর একশো গজ ভেতরে চলে এসেছে, আবার কোথাও তীরের একেবারে গা ঘেঁষা; কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা। পাতলা জায়গাগুলোতে কালো পানি দেখা যাচ্ছে।

ডাঙায় বড় বড় ফার গাছের জঙ্গল। পানির কিনার থেকে শুরু করে সারি দিয়ে দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। গাছের মাথার জড়াজড়ি করে থাকা ডালগুলোকে লাগছে তরঙ্গায়িত ব্যাসল্টের চূড়ার মত। পানির কিনারে গজানো গাছের শেকড়ে ক্রমাগত চুমু খাচ্ছে যেন ছোট ছোট ঢেউ। কোথাও কোথাও ভেতরে ঢুকে গেছে সরু সরু প্রণালী, রহস্যময় সব ছোট ছোট ল্যাগুনে গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রণালীর মুখের কাছে নলখাগড়া হয় একেবারেই নেই, নয়তো পাতলা।

'ওসব ল্যাগুনে প্লেন লুকানো সম্ভব,' ওমর বলল। 'যেটার মুখের কাছে নলখাগড়া বেশি, সেটা হলেই ভাল। অবশ্য তাতে সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধেও আছে। সুবিধে হলো, নলখাগড়ার আড়ালে থাকায় নদীতে চলাচলকারী নৌকার চোখে পড়বে না। আর অসুবিধে, ঢোকানোর সময় ডানায় লেগে, পেটের চাপে নলখাগড়ার ডাঁটা ভাঙবে, সেটাও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে সরাসরি প্লেনটা দেখানোর চেয়ে ডাঁটি ভাঙার ঝুঁকি নেয়াই ভাল। চেষ্টা করতে হবে, যতটা সম্ভব কম ভেঙে ভেতরে ঢোকানোর। দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসব। ল্যাগুনে ঢোকানোর পর মুখটা ঘুরিয়ে রাখব নদীর দিকে, যাতে প্রয়োজনের সময় মুহূর্তে সহজে বের করে নিয়ে যাওয়া যায়।'

দেখা হয়েছে। ফিরে চলল ওরা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওমর ভাই, জেলখানাটা কত দূরে, অনুমান করতে পারেন?'

'সরাসরি গেলে তিন কি চার মাইল।'

বিমানের গায়ে ডিঙি ভেড়াল ওরা।

'বাপরে বাপ, কি শব্দ!' দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের স্বাগত জানাল মুসা। 'আমরা তো ভাবলাম জলহস্তীর কবলে পড়েছ।'

'হাতি আকাশে ওড়ে না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর।

'কি জানি, কোন দেশের কি কাণ্ড! হাঁসে বলে এমন শব্দ করে! যা কাণ্ডকারখানা দেখছি এখানে, হাতি উড়াল দিলেও অবাক হব না।'

'তোমার তো যত সব উদ্ভট চিন্তা,' ওমর বলল। 'কথা বাদ দিয়ে হাত লাগাও। সময় নেই। ভোর হয়ে যাচ্ছে।'

'ইস্, যা ভয়ানক ঠাণ্ডা,' বিড়বিড় করল রবিন।

'কাজ করলেই গা গরম হয়ে যাবে।'

বিমানের লেজে দড়ি বেঁধে প্রথমে টেনে নিয়ে আসা হলো একটা সরু খালের কাছে। ল্যাগুনে ঢোকার মুখ ওটা। নলখাগড়ায় ছেয়ে আছে। ঢোকানো সহজ হলো না মোটেও। ওমর চেয়েছিল, নলখাগড়া যেমন আছে তেমন রেখে ঢোকাতে। পারল না। ছুরি দিয়ে কেটে শেষে পথ করে নিতে হলো। সাবধানে কাটল, পানির নিচে থেকে। ওপরে কাটলে সহজেই চোখে পড়বে। ঠাণ্ডা পানিতে হাত চোবাতে চোবাতে অবশ হয়ে গেল। কাটা নলখাগড়াগুলো অবশ্য কাজে লাগল। প্লেনটা ল্যাগুনে ঢোকানোর পর সেগুলো ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে বিমানটা ঢেকে দিল তিন গোয়েন্দা।

এত সাবধানতা কেন, জানতে চাইল মুসা।

'আকাশ থেকে দেখা যাওয়ার ভয়ে,' ওমর বলল। 'এয়ার পেট্রল নিশ্চয় আছে। ওপর থেকে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে দেখতে নামবে। আর নামলে গেলাম।'

আরও কিছু নলখাগড়া কেটে পুরোপুরি ঢেকে দেয়া হলো বিমানটা। ডিঙিটা বেঁধে রাখা হলো তার সঙ্গে। ওটাকেও ঢেকে দেয়া হলো নলখাগড়া দিয়ে। পাখিগুলোকেও ভয় পাচ্ছে ওমর। তার ধারণা, ভাটার সময় ওগুলো ফিরে আসবে। খাবার খুঁজতে গিয়ে সরিয়ে দেবে আলগাভাবে ফেলে রাখা ডাঁটাগুলো।

'আরও নানা ভাবে জ্বালাবে ওগুলো,' বলল সে। 'আমাদের দেখলেই দল বেঁধে উড়াল দেবে। দূর থেকে কারও নজরে পড়লে, কোন কিছু চমকে দিয়েছে ওদের সন্দেহ হলে দেখতে আসবে। প্লেন নিয়ে উড়তে গেলেও বিপদ বাধাবে ওই পাখি। বড় বড় হাঁস আছে ঝাঁকে। ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা উড়ে প্লেনের গায়ে এসে বাড়ি খেলে মারাত্মক বিপদ হবে। যাই হোক, আপাতত ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। এসো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

'তীরে নামবেন নাকি আজ?' জানতে চাইল রবিন।

'ইচ্ছে তো আছে। দেখা যাক। বসে বসে এখন দেখব কিছু ঘটে নাকি। আমাদের আগমন কারও চোখে পড়েছে কিনা সেটাও বুঝতে পারব। চোখে পড়লে দেখতে আসবে।'

নাস্তার পর গরম কফি নিয়ে বসল সবাই।

দশটার পর ওমরের সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো।

'ওই যে, নৌকা আসছে,' কিশোর জানাল। 'দুটো নৌকা। নদী দিয়ে আসছে।'

মোহনার দিকে চলেছে নৌকা দুটো। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। দুশ্চিন্তা কাটল নৌকা দুটোকে পাল তুলতে দেখে। খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে।

'নাহ্, আমাদের খুঁজতে আসেনি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'জেলে। মাছ ধরতে যাচ্ছে। নদীর উজানে যে বস্তি আছে, মনে হয় ওখান থেকে এসেছে।'

ফ্যাকাসে সূর্য দেখা দিল দিগন্তে। পর্বতের ঢালে গাছপালায় আটকে থাকা কুয়াশা হার মানতে বাধ্য হলো সেই নিস্তেজ সূর্যের কাছেই। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যেতে লাগল দূরে।

দুই

দুই ঘণ্টা পেরোল। অশান্তির আর কোন কারণ ঘটল না। মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের ঝাঁক এসে নামছে। শব্দ হচ্ছে। পানি তোলপাড় করছে। তারপর আবার সব চুপ।

'ঝুঁকি নিয়েই তীরে নামতে হবে,' ওমর বলল।

'নিতে কোন আপত্তি নেই আমাদের,' কিশোর বলল। 'বিপদ হবে জেনেশুনেই এসেছি। আপনি প্লেনে থাকুন, পাহারা দিন, আমরা বরং তীরে নেমে আশপাশটা ঘুরে দেখে আসি।'

'যাও। তবে সাবধান। কারও চোখে পোড়ো না।'

ডিঙি নিয়ে রওনা হলো তিনবন্ধু। পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। কোনভাবে তাতে

পড়ে গেলে ভোগান্তি আছে কপালে। নলখাগড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সাবধানে ডিঙি বেয়ে চলল মুসা। তীরের কাছে নরম কাদা। তার ওপর দিয়েই কোনমতে ঠেলেঠুলে নিয়ে আসা হলো ডিঙি। তীরে নামল ওরা। দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে ডিঙিটা বেঁধে রাখল মুসা।

ফার গাছগুলোর ঝুলে পড়া ডালের নিচে যেন নীরবতার রাজত্ব। হাঁটতে গেলেও শব্দ হয় না। পুরু গদির মত বিছিয়ে আছে মরা পাতা আর ধূসর এক ধরনের শ্যাওলা। গায়ে গায়ে লেগে থাকা গাছের জন্যে দৃষ্টি বাধা পড়ে। ঠিকমত তাকানো যায় শুধু বনের প্রান্তে নলখাগড়ার বেড়া আর গাছের সীমানার মাঝখানে যে এক চিলতে খোলা লম্বা জায়গাটুকু আছে, সেখানে দাঁড়ালে। একটা বাদামী ভালুককে আসতে দেখা গেল সেখান দিয়ে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওরা। কিন্তু কোন উগ্রতা নেই ভালুকটার মাঝে, উত্তেজনা নেই, শান্তভাবে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

'মানুষের সঙ্গে এখানে বিশেষ শত্রুতা নেই ওদের,' কিশোর বলল। 'আমরা বিরক্ত না করলে আমাদেরও করবে না।'

বনের যেন শেষ নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে যেদিকেই তাকাচ্ছে শুধু বন আর বন। ধোঁয়া নেই। মানুষ বসবাসের কোন চিহ্নই নেই।

এতটা একঘেয়ে, বিবর্ণ, বিষণ্ন প্রকৃতি আর দেখেনি কিশোর। যেন কি এক বিয়োগান্ত নাটক ঘটে গেছে এখানে। মানুষের দুর্দশা দেখে দেখে যেন প্রকৃতির মন খারাপ। সে-জন্যেই গাছগুলো লজ্জায় ডাল নুইয়ে রাখে সারাক্ষণ। সব কিছুতেই বিপদের ছায়া।

পর্বতের চূড়াগুলোয় শীতকালের শক্ত সাদা বরফ এখনও গলেনি।

'এ কি জায়গারে বাবা!' না বলে পারল না মুসা। 'কবরে ঢুকলাম নাকি?'

একমত হলো রবিন। 'গাছগুলোর দিকে তাকালেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।'

'মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কে যেন চোখ রাখছে আমাদের ওপর।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'আর এগোব?'

'আসল জিনিসটাই তো দেখলাম না এখনও, জেলখানা,' রবিন বলল। 'চলো দেখে আসি।'

নদী ধরে উজানের দিকে এগোতে হবে, জানা আছে ওদের। খোঁজ-খবর যতটা যা পেরেছে নিয়েই এসেছে। নদীর উজানে একটা উঁচু জায়গার ওপর বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি করা হয়েছে জেলখানাটা।

'এসেই এত তাড়াতাড়ি কারও চোখে পড়তে চাই না,' কিশোর বলল।

'চোখে পড়ব কেন? মানুষের আনাগোনা দেখলেই বনে ঢুকে যাব।'

মুসাও রবিনের সঙ্গে একমত। বলল, 'কোন না কোন সময় তো যেতেই হবে। এলামই সে-জন্যে। এখন গেলে অসুবিধে কি?'

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর।

'উফ্, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জমে গেলাম!' তাগাদা দিল মুসা, 'যা হোক একটা কিছু করো। হাঁটলে শরীর গরম হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন রাজি হলো কিশোর, 'ঠিক আছে, চলো। সামনে যতটা পারি এগোই। কি আছে দেখে নেয়া যাক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পারলে যাব

জেলখানার কাছে, না পারলে নেই।'

বনের কিনারের সেই এক চিলতে ফাঁকা জায়গাটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। খানিক গিয়ে বোঝা গেল এটা পায়েচলা পথ। নিয়মিত জন্তু-জানোয়ার চলাচল করে। মানুষ চলার চিহ্ন নেই। মাটিতে কোথাও একটা জুতোর ছাপও চোখে পড়ল না। হরিণের খুরের দাগ আছে, আছে ভালুকের পায়ের ছাপ। আরেক ধরনের খুরের দাগ আছে, খুব কম। চেনা চেনা লাগল মুসার। চিনে ফেলল হঠাৎ, 'ঘোড়া!'

ঘোড়া মানেই মানুষ!

হয়তো ঘোড়ার পিঠে চেপে টহল দিতে আসে এদিকে জেলখানার প্রহরী।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সামনে একটা বাঁক। সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এ ভাবে খোলা জায়গা দিয়ে এগোনো বোধহয় আর ঠিক হবে না।'

'মানুষের সাড়া তো এখনও পাওয়া যায়নি,' রবিন বলল। 'চলো, বাঁকের ওপাশে গিয়ে দেখি, কি দেখা যায়।'

দ্বিধা করে আবার পা বাড়াল কিশোর। দেখার ইচ্ছে তারও কম না। কিন্তু মোড়ের কাছে যাওয়ার আগেই আবার থমকে দাঁড়াতে হলো।

তীক্ষ্ণ একটা শব্দ! ঠাস করে উঠল। নীরবতার মাঝে স্পষ্ট শোনা গেল। রাইফেলের গুলির মত, কিন্তু গুলি নয়।

চোখের পলকে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে বনে ঢুকে পড়ল তিনজন।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বাড়ি মারার মত মনে হলো।'

কিশোর বলল, 'চলো দেখে আসি।'

গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সাবধানে এগোল ওরা। দেখতে পেল লোকটাকে। ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত থেকে ফেলে দিল লাঠির মত একটা খাটো ডাল। মাটিতে তার পায়ের কাছে পড়ে আছে দুটো মরা সেবল। খানিক দূরে একটা মরা শেয়াল। বোঝা গেল, ফাঁদে আটকা পড়েছিল। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে ওগুলোকে। ঠাস করে শব্দটা হয়েছিল হাড় ভাঙার।

মৃত জানোয়ারের চেয়ে লোকটার প্রতি কিশোরের আগ্রহ বেশি। ভাবভঙ্গি, আচরণে মানুষের চেয়ে জানোয়ারের সঙ্গেই মিল বেশি। কাদা লাগা, ময়লা পোশাকটা দেখে বোঝা কঠিন তাতে কাপড়ের পরিমাণ বেশি, নাকি জানোয়ারের চামড়া। শুকনো, খটখটে দেহটাকে জড়িয়ে রেখেছে বিচিত্র ওই পোশাক। কোমরে একটা কুড়াল ঝুলছে। বহু বছরের না-কাটা চুল-দাড়িতে সাদা ছোপ। গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখের খুব সামান্যই চোখে পড়ে।

কিশোরের অনুমান, বয়েস অন্তত ষাট বছর হবে লোকটার। তবে বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি কর্মক্ষম। কুড়ালটা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই তার কাছে।

চারদিকে শেষবারের মত একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে মরা জানোয়ারগুলোকে কাঁধে তুলে নিল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল গাছের আড়ালে।

'শিকারী,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'শিকারীই, তবে ট্র্যাপার,' মুসা বলল। 'ফাঁদ দিয়ে জানোয়ার ধরে। ভোঁদড় দুটো দেখলে না।'

'ওগুলো সেবল।'

'তাই নাকি। সেব্‌লের চামড়া তো শুনেছি খুব দামী।'

'ঠিকই শুনেছ।'

'এ বনে ট্র্যাপার আছে যখন,' কিশোর বলল, 'চলাফেরায় আরও সাবধান হতে হবে আমাদের।'

'দেখে ফেলবে বলে?' মুসার প্রশ্ন।

'সে তো বটেই। তা ছাড়া ফাঁদের কথাটা ভুললে চলবে না। ফাঁদ পেতে রাখে। ভালুকের ফাঁদে পা দিয়ে বসলে কি ঘটবে ভাবো।'

'কিন্তু কে লোকটা? কয়েদী হলে তো জেলে থাকত।'

'পিছে পিছে গিয়ে দেখলেই তো পারি কোথায় যায়,' রবিন বলল। 'কাছাকাছি ঘরবাড়ি থাকতে পারে।'

লোকটার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ওরা। মুখের কাছে পড়ছে গাছের ডাল। খুব সাবধানে দু'হাতে সরাতে লাগল ওগুলো, যাতে কোন রকম শব্দ না হয়। চলতে চলতে বনের কিনারে চলে এল। গাছের বাকল আর সীলের চামড়া দিয়ে বানানো অতি সাধারণ একটা নৌকা দেখতে পেল নদীর ধারে। কাদায় টেনে তুলে রাখা হয়েছে। ওরা ভেবেছিল নৌকায় উঠবে লোকটা। কিন্তু বন থেকে বেরোলও না, নৌকায়ও উঠল না। নদী একপাশে রেখে বনের কিনার ধরে এগিয়ে চলল আবার। নাকে এল অতি আকাঙ্ক্ষিত ধোঁয়ার গন্ধ।

এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় গাছের খুঁটি আর তক্তার বেড়া দিয়ে কোনমতে খাড়া করা হয়েছে একটা কুঁড়ে। এতই করুণ চেহারার, তাতে যে মানুষ কিভাবে বাস করতে পারে সেটাই কল্পনার বিষয়। কিন্তু বাস যে করে, চোখেই দেখা গেল। লোকটা ঘরের দিকে এগোতেই সাড়া পেয়ে নিচু একটা ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল এক মহিলা। ছালা আর নেকড়ায় তৈরি পোশাকের অবস্থা দেখে কাকতাড়ুয়াও লজ্জা পাবে। খুব অসুস্থ মনে হলো মহিলাকে। দরজায় হেলান দিয়ে কাশতে শুরু করল। ভয়ানক কাশি আর থামেই না। নিজের অজান্তেই চোখ-মুখ কুঁচকে গেল কিশোরের। পাঁচ-ছয় বছরের একটা ছোট্ট ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এসে মহিলাকে জড়িয়ে ধরে আরাম দেয়ার চেষ্টা করল।

শুকানোর জন্যে ঘরের বেড়ায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে একটা ভালুকের চামড়া। গাছের ডালে দড়ি বেঁধে শুঁটকি করার জন্যে মাছ রোদে দেয়া হয়েছে। এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, নিস্তেজ রোদের তাপে কবে ওগুলো শুকাবে, আর কবে শুঁটকি হবে, ভাবতে অবাক লাগল কিশোরের। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখছে ওরা।

যা দেখার দেখে নিয়ে ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে কিশোর, কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। দাঁড়িয়ে গেল আবার।

কুঁড়ের পেছনের বন থেকে বেরিয়ে এল তিনজন অশ্বারোহী। একজন আগে, বাকি দুজন পেছনে। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল সামনের লোকটা ওদের সর্দার। মাথায় কালো রোমশ গোল টুপি। চ্যাপ্টা মুখ। ভ্রূকুটি যেন লেগেই আছে। হাতে চাবুক। কোমরের হোলস্টারে রিভলভার। কাঁধের একপাশে ঝোলানো গুলির বেল্ট।

'কসাক,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

লোকগুলোকে দেখে প্রথমেই মনে হলো কিশোরের, ওদের আসার খবরটা

জেনে গেছে। তাই শিকারীকে জিজ্ঞেস করতে এসেছে প্লেনটা দেখেছে কিনা।

লোকগুলোকে দেখেই কুঁকড়ে গেল শিকারী আর তার স্ত্রী। ঘোড়া থেকে নামল সর্দার। চাবুকটা ছুঁড়ে দিল এক সহকারীর দিকে। কর্কশ কণ্ঠে কিছু জিজ্ঞেস করল। বুট তুলে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল ছেলেটাকে। চিৎকার করে কাঁদারও সাহস করল না ছেলেটা। নীরবে ফোঁপাতে লাগল। চোখে পানি। অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল তার বাবা-মা। কিছু করল না।

রাগ দমন করতে পারল না মুসা। আগে বাড়তে গেল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। কানে কানে বলল, 'থামো। পাগলামি কোরো না।'

পরের কয়েক মিনিটে যা ঘটল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না সে। মানুষগুলোকে অনবরত প্রশ্ন করে গেল লোকটা। তারপর তার সহকারীর হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে ইচ্ছে মত পেটাতে লাগল শিকারী আর তার অসুস্থ স্ত্রীকে। তারপর ঘোড়ায় চেপে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। মার খাওয়া কুকুরের মত কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল মহিলা। শিকারী গেল তার পেছন পেছন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না,' বিড়বিড় করল সে। রবিনের দিকে তাকাল, 'রাশান ভাষায় কথা বলল নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বাবাকে উদ্ধার করতে শাখালিনে আসতে হবে, এটা জেনে কাজ চালানোর মত রাশান ভাষা শিখে নিয়েছে সে।

'কি বলল, কিছু বুঝতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সেব্‌ল্‌গুলো কাউকে না দিতে শাসিয়ে গেল।'

'এখন নিল না কেন?'

'সেটা কিছু বলেনি।'

'উফ্, কি জীবন! আর বাস করার কি জায়গা!'

'হ্যাঁ! চলো, যাই।'

'দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বুদ্ধি?'

'বেচারা এই লোকগুলো নিশ্চয় সৈন্যদের ঘৃণা করে।'

'যে ব্যবহার করে গেল, না করার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাতে কি?'

'আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবে।'

'তুমি বলতে চাইছ...প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আতঙ্কে হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে কিনা ওদের কে জানে। দেখা দেয়াটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে না?'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। ওরা অনেক কিছু জানাতে পারবে আমাদের। তাতে আমাদের সময় আর ঝামেলা বাঁচবে অনেক।'

দ্বিধা কাটাতে পারছে না রবিন। তবে কিশোরের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। 'বেশ, যাচ্ছি আমি কথা বলতে। কি জিজ্ঞেস করব?'

'জেলখানার কথা জিজ্ঞেস করবে। যতটা পারো তথ্য আদায় করবে। প্রশ্ন

করবে বেশি, জবাব দেবে কম। আমাদের সম্পর্কে যত কম জানাবে, ততই ভাল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তুমি কি করবে?'

'আমি আর মুসা এখানেই আছি। এখুনি দেখা দেব না। আগে অবস্থা বুঝে দেখি।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি।'

'বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেই দৌড় মারবে। পেছন ফিরে তাকাবে না আর।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল রবিন।

মুসাকে নিয়ে আরেকটু পিছিয়ে গেল কিশোর। একটা গাছের শেকড়ে বসে তাকিয়ে রইল। রবিনকে দরজায় টোকা দিতে দেখল। দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল রবিন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আধঘণ্টা পর আবার খুলে গেল দরজা। হাসিমুখে রবিনকে বেরিয়ে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ওর গাছটার পাশ দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গেল সে। কুঁড়ের কাছ থেকে বেশ কিছুটা সরে গিয়ে থামল।

কিশোর কাছে এলে বলল, 'ওদেরকে ভয় করার কিছু নেই।'

'জেনেছ নাকি?'

'অনেক। এখানেই বলব? নাকি প্লেনে গিয়ে সবার সামনে?'

'এখনই বলো।...এই যে, এই গাছটার ওপর বসি।' মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের ওপর বসল কিশোর। 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

'ওরা রাশান,' রবিন বলল। 'লোকটার নাম মিখাইল মারকভ। আর মহিলা মারশা মারকভ। লোকটা কৃষক। ভ্লাডিভোস্টকের কাছে প্রচুর জমিজমা ছিল ওদের। বারো বছর আগে একদিন ঝড়ে নৌকাডুবি হওয়া কয়েকজন জাপানী জেলেকে আশ্রয় দিয়েছিল ওরা, খাবার দিয়েছিল। নিতান্ত মানবিক কারণেই কাজটা করেছিল ওরা। কিন্তু পুলিশে ধরল ওদের। শত্রুদেশের নাগরিকদের আশ্রয় দেয়ার 'অপরাধে' অভিযোগ আনল। বলল, জাপানীগুলো সীল শিকারী। মারকভ বলল, সীল শিকারী হলেও সে কিছুই জানে না। কিন্তু বাঁচতে পারল না। তাকে আর তার স্ত্রীকে ধরে দশ বছরের জেল দিয়ে পাঠিয়ে দিল শাখালিন কারাগারে।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'এটুকু অপরাধের জন্যে দশ বছর!'

'মারকভ বলল, ওদের ভাগ্য ভাল, মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পেরেছে। বাড়তি শাস্তি হিসেবে সারা জীবনের জন্যে জেলের বাইরে এই জঙ্গলে আটকে থাকার দণ্ড দেয়া হয়েছে ওদের। শাখালিনে একবার যাদের পাঠানো হয়, তাদের আর দেশে ফিরে যাওয়ার ভাগ্য হয় না। মারকভদের আটকে রেখেছে দেশে ফিরে গিয়ে যাতে আর সম্পত্তি দাবি করতে না পারে ওরা।'

'তাহলে ওরা এখন দণ্ড ভোগ করছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'তারমানে জেলখানাটা সম্পর্কে সব জানে ওরা?'

'জানে। জেল খাটার মেয়াদ শেষ হলে বের করে দেয়া হয় ওদের। কিন্তু বলে দেয়া হয় শাখালিন ত্যাগ করতে পারবে না। জেলখানা থেকে বেরিয়ে নিজেদের

দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে। মরল কি বাঁচল, কর্তৃপক্ষ দেখতে আসবে না। কিন্তু যেতে পারবে না কোনখানে। ওই কুঁড়েটা বানিয়ে নিয়েছে ওরা। মাছ ধরে আর শিকার করে দিন চলে। জীবনের বাকি দিনগুলো এ ভাবেই কাটাতে হবে। ছেলেটার নাম শাসা, ওদের নিজের সন্তান নয়। নদীর উজানে আরেকটা কুঁড়েতে বাস করত ওর বাবা-মা। দুজনেই মারা গেলে মারকভরা নিয়ে এসেছে ওকে।'

'সৈন্যরা এসে পিটিয়ে গেল কেন?'

'জেলখানা থেকে বের করে দিলেও শান্তিতে থাকতে দেয়া হয় না ওদের। মাঝে মাঝেই এসে হানা দেয় জেলখানার লোক, দেখে যায় আছে নাকি ওরা। শুধু মারকভরাই নয়, ওদের মত মুক্তি পাওয়া কয়েদী আরও আছে, একই ভাবে পশুর জীবন যাপন করছে ওরাও,' এক মুহূর্ত থামল রবিন। 'যে লোকটা পিটিয়েছে ওদের, তার নাম লেফটেন্যান্ট খারগা। টহল দিতে বেরিয়েছে। মারকভের কপাল খারাপ। খারগা এসে দেখে ফেলেছে সেব্‌ল্ দুটো। মারকভ জানত খারগা দেখলেই কেড়ে নিতে চাইবে। সময় পেলে লুকিয়ে ফেলত। সাংঘাতিক খারাপ লোক খারগা। আগে চোর ছিল। চুরির অপরাধেই তাকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। এখন অফিসার সেজে বসেছে।'

'সে যা করে গেল, কর্তৃপক্ষ কি সেটা মেনে নেবে?'

'ওরা জানতেই পারবে না। অভিযোগ করারও সাহস হবে না মারকভের। ও বলেছে, ওর স্ত্রী মারা গেলে খুন করবে খারগাকে।'

'মারা যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। যক্ষ্মায় ভুগছে। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, একটিবারের জন্যে কাশি বন্ধ হয়নি।'

'খারগাকে খুন করলে মারকভকে সোজা ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা।'

'ও বলেছে, মারশা মারা গেলে যা খুশি ঘটে ঘটুক, ও কেয়ার করে না। এখন কিছু করছে না শুধু স্ত্রীকে খাবার জোগানোর জন্যে, যতটাই পারে।'

'বেচারারা! কিন্তু তুমি মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ওদের আস্থা অর্জন করে ফেলেছ। কি করে সম্ভব হলো?'

'কেন এসেছি, সেটা বলে দিয়েছি ওদের।'

'হায় হায়, বলতে গেলে কেন?'

'আমার কথা শুনেই বুঝে গেল, আমি রাশান নই। কাজেই সত্যি কথাটা বলতেই হলো। বললাম, আমি আমেরিকান। আমার বাবাকে এখানে জেলে আটকে রেখেছে। ও যখন বুঝল ওর শত্রু আমাদেরও শত্রু, বাকি কাজটা সহজ হয়ে গেল। ও কথা দিয়েছে, আমাদের যে কোন ভাবে সাহায্য করতে রাজি।'

'বেইমানী করবে না তো?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না, করবে না। খারগার কথা বলার সময় ওর চোখে যে ঘৃণা দেখেছি, না দেখলে বুঝবে না। বেঁচে থাকার এখন একটাই উদ্দেশ্য ওর—প্রতিশোধ নেয়া।'

'জেলখানায় কি করে ঢুকতে হয়, জানে নিশ্চয়?'

'জানবে না, ছিলই তো ওই জেলে! ওহ্‌হো, বলতে ভুলে গেছি, কয়েক দিন

আগেও নাকি একটা গুজব শুনেছে, একজন আমেরিকান এসেছে এখানে। সঙ্গে একজন জাপানী। প্লেন নিয়ে নাকি এসেছিল ওরা।'

'তারমানে মিলফোর্ড আঙ্কেল আর মিকোশা!' উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তা ছাড়া আর কে? মিলে যাচ্ছে।'

'গুজবটা ছড়ায় কি করে?' জানতে চাইল কিশোর।

'করাত কলে আর কয়লা পাহাড়ে কাজ করাতে নিয়ে যায় কয়েদীদের, সেখান থেকেই খবরগুলো ফাঁস হয়।'

'কয়লা পাহাড়টা আবার কি জিনিস?' বুঝতে পারল না মুসা। 'কয়লার তৈরি পাহাড় নাকি?'

'অনেকটা ওরকমই,' রবিন বলল। 'পাহাড়ের মধ্যে কয়লা আছে এখানে। ঢালের গা থেকে মাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সেই কয়লা। সে-জন্যেই নাম হয়েছে কয়লা পাহাড়।'

'ভেরি গুড,' কিশোর বলল। 'একবারেই বহু খবর নিয়ে এসেছ। চলো, ওমর ভাইকে জানাইগে। অনেকক্ষণ হলো এসেছি। আমাদের দেরি দেখলে চিন্তা করবে।'

তিন

আধঘণ্টা পর বিমানের কেবিনে বসে আবার আলোচনা হলো বনের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে।

ওমর বলল, 'ভাল-মন্দ দুটোই হতে পারে এখন।'

'মন্দ কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'মাথা গরম হয়ে গিয়ে এই মারকভ লোকটা সত্যি সত্যি যদি এখন খুন করে বসে খারগাকে, জেলখানা থেকে দলে দলে সৈন্য এসে হাজির হবে ওর খোঁজে। ওদের কেউ এদিকে চলে এলে দিনের আলোয় প্লেনটা দেখে ফেলবে।'

রবিন বলল, 'টহলদার বাহিনী এতদূর আসবে বলে মনে হয় না। মারকভ বলেছে, ওর বাড়িটাই শেষ বাড়ি।'

'খারগা খুন হয়ে গেলে ওরা কি করবে বলা যায় না।'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকাল মুসা। 'তাহলে কি করা যায়?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল ওমর। 'সময় নষ্ট না করে এখনই গিয়ে মারকভের সঙ্গে আরেকবার দেখা করা দরকার। টহলদাররা মোহনার দিকে কতদূর পর্যন্ত আসে জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে। এখানকার খবর নিশ্চয় সবই তার জানা। বের করে নিতে হবে সব। ও আমাদের দলে এলে বলতে আপত্তি করবে না।'

'খারগার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে যে-দলে যেতে বলা হবে ওকে, সেই দলেই যাবে,' রবিন বলল। 'ওর আসলে হারানোর কিছু নেই আর এখন। খারগাকে খুন করার পর কি হবে ওর, সেটা নিয়ে ওর কোন চিন্তা নেই।'

'তাহলে চলো আবার, যাই। গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি। লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'রবিন, কিছু খাবার নিয়ে যাও না,' কিশোর বলল। 'কনডেন্সড মিল্ক, বিস্কুট...'

'না, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না,' ওমর বলল। 'বনের মধ্যে আমেরিকান কোম্পানির ছাপ মারা দুধের টিন কোন টহলদারের চোখে পড়ে গেলে বিপদ হবে।'

'মারকভকে সাবধান করে দিলেই হবে যাতে যেখানে সেখানে না ফেলে।'

'নাকি আরেক কাজ করব,' রবিন বলল। 'গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসব এখানে?'

'আপাতত ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করাটাই ভাল,' ওমর বলল। 'দ্রুত কিছু খেয়ে নিয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।' মুসা আর কিশোরকে বলল, 'আমি রবিনকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা থাকো। ভাঙা নলখাগড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা কোরো, যাতে সহজে চোখে না পড়ে। প্লেনটাকেও আরেকটু ভালমত ক্যামোফ্লেজ করো।'

খাওয়ার পর ডিঙিতে করে ওমর আর রবিনকে নামিয়ে দিয়ে এল মুসা। ওমর বলল, 'ফিরতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে না আমাদের।'

মুসা ফিরে এলে তাকে নিয়ে কাজে লাগল কিশোর। খুব সাবধান রইল। সব সময় একটা চোখ রাখল তীরের দিকে। মাছ ধরতে যাওয়া নৌকা দুটোর ব্যাপারেও বেখেয়াল হলো না। দ্রুত কেটে গেল বিকেলটা। পর্বতের ওপাশে সূর্যটা হারিয়ে যেতেই মলিন হয়ে এল দিনের আলো। বাতাসের কনকনে ভাবটা ফিরে এল আবার।

'ওমর ভাই গেছে দুই ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে,' তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল কিশোর। কাজ করার সময় হাতে লেগে যাওয়া কাদা ধুয়ে এসেছে। 'কোন বিপদ হলো না তো?'

'কি জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'এ ধরনের কাজে সময় লাগতেই পারে, দু'ঘণ্টা বললে যে দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না।'

কিন্তু যখন আরও একটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল, আঁধার নামল বনভূমিতে, দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল ওদের। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর, 'গোলমাল তো মনে হয় একটা সত্যি হয়েছে।'

ওর অনুমান ঠিক। প্ল্যান মাফিক হয়নি সব।

বিষণ্ন বনের ভেতর দিয়ে ঠিকমতই কুঁড়েটার কাছে ওমরকে নিয়ে এসেছে রবিন। ঝাঁপটা লাগানো। কাউকে চোখে পড়ল না। নীরব। কেমন থমথম করছে জায়গাটা।

কুঁড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে ওমর বলল, 'কিছু কি ঘটল নাকি?'

'ঝাঁপ লাগানো,' রবিন বলল। 'তারমানে ভেতরেই আছে ওরা।'

'গিয়ে দেখা দরকার। দাঁড়িয়ে থেকে অহেতুক সময় নষ্ট।'

সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল ওরা। ঘুরে খুদে জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওমর। ভেতরে উঁকি দিল। কিন্তু এতই অন্ধকার, কিছু চোখে পড়ল না। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তখন। টোকা দিল।

সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল সে।

একই অবস্থা।

রবিনের দিকে তাকাল একবার ওমর। অতি সাধারণ হুড়কোটা আস্তে করে আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলল ওপর দিকে। ঠেলা দিল দরজায়।

ফাঁক হয়ে যাওয়া দরজা দিয়ে এখন আলো ঢুকছে ভেতরে। একটা মাত্র ঘর। তাতেই খাওয়া, ঘুমানো, বসার কাজ চলে। সীমাহীন দুরবস্থা।

এক নজরেই বোঝা গেল, কি ঘটেছে। কেন সাড়া পাওয়া যায়নি। চারটে খুঁটির ওপর তক্তা ফেলে বানানো একটা খাটিয়ায় চিত হয়ে শুয়ে আছে এক মহিলা। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি ফেলে রাখা। ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, মারা গেছে। বিছানার কাছে মাটিতে বসে ফোঁপাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, গালে পানির দাগ। মারকভ ঘরে নেই।

রবিনকে বলল ওমর, 'ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করো তো ওর বাবা কোথায়।'

জিজ্ঞেস করল রবিন।

ছেলেটা জবাব দিল না। ভয়ে কুঁকড়ে আছে। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

'ভাল বিপদে পড়া গেল! কি করা যায়?' বুঝতে পারছে না ওমর। 'মহিলা মরে গেছে। মারকভ যদি এখনই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে থাকে, আমাদের সরে পড়াই ভাল।'

আরেকবার ছেলেটাকে কথা বলানোর চেষ্টা করল রবিন। ওর বাবা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে করে কুড়াল নিয়ে গেছে কিনা তা-ও জানতে চাইল। কিন্তু একই অবস্থা। জবাব নেই।

মাথা নাড়তে নাড়তে ওমর বলল, 'কোন লাভ হবে না।'

'কি করব?'

'দেখি আরেকটু অপেক্ষা করে, মারকভ আসে কিনা। না এলে আর কি করব, ফিরেই যাব। মরা মায়ের কাছে বাচ্চাটাকে রেখে বাপ একেবারে চলে গেছে, এটা বিশ্বাস হয় না আমার।'

কুঁড়ের সামনে থাকলে কেউ দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে বনের মধ্যে গাছের আড়ালে এসে ঢুকল ওরা।

এক ঘণ্টা পর এল মারকভ। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল কুঁড়ের দিকে। হাতে একটা বেলচা। কোমরে ঝুলছে কুড়ালটা।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল রবিন।

ঝটকা দিয়ে তার দিকে ঘুরে গেল মারকভ। তার দিকে তাকিয়ে মায়াই লাগল ওমরের। মড়ার মুখের মত সাদা মুখ, ভাবান্তর নেই। চোখের দৃষ্টিতে নেই কোন আশা, কোন আবেগ, সব ঝেঁটিয়ে দূর হয়ে গেছে।

'আপনার স্ত্রী মারা গেছে,' কথা শুরুর জন্যে বলল রবিন। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল কণ্ঠটা।

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

'খারগাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন?'

'না। অনেক জরুরী কাজ বাকি। একটা বেলচা ধার করতে গিয়েছিলাম।

বাচ্চাটার ভার নিতে অনুরোধ করেছি এক বিধবাকে। তার কাছেই এখন নিয়ে যাব ওকে।' ওমরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটা কে?'

'বন্ধু।'

'অ।' আর কোন কৌতূহল নেই।

প্রতিটি কথা ওমরকে অনুবাদ করে শোনাতে লাগল রবিন।

'বাচ্চাটাকে দেয়ার পর কি করবেন?'

'এখানেই থাকব খারগার অপেক্ষায়। এলে ওকে খুন করব। না এলে কুঁড়েটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে বনে ঢুকে যাব। তারপর গিয়ে ওকে খুন করে আসব।' এমনভাবে বলল মারকভ, যেন একটা ইঁদুর মারার কথা বলছে।

'বনে কোথায় থাকবেন?'

'একটা গুহা চিনি আমি।' বেড়ায় ঝোলানো ভালুকের চামড়াটা দেখিয়ে বলল, 'ওর বাড়ি ছিল। এখন থেকে হবে আমার বাড়ি, যতদিন না মরি। ওখানে আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না।'

'ওকে বলো,' রবিনকে বলল ওমর, 'আপত্তি না থাকলে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

মারকভের সঙ্গে কথা বলে ওমরকে জানাল রবিন, 'না, আপত্তি নেই ওর। তবে আগে বাচ্চাটাকে দিয়ে আসতে চাচ্ছে। দিয়েই ফিরে আসবে।'

'ঠিক আছে।'

ঘরে ঢুকল মারকভ। একটু পরেই বেরিয়ে এল বাচ্চাটার হাত ধরে।

একটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল ওমর। সিগারেট ধরাল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। এত কষ্টের মধ্যেও বেঁচে থাকে মানুষ, কি ভয়ঙ্কর! আর মানুষও একজন আরেকজনের সঙ্গে কি জঘন্য ব্যবহার করে! খারগার কথা বলছি।'

'ওর সঙ্গে ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারছি বাবার সঙ্গে কি করে!' রাগ প্রকাশ পেল রবিনের কথায়।

'খারাপ যে করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ফিরে এল মারকভ। সোজা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ভাবাবেগশূন্য চেহারা।

'এলাম,' ভোঁতা গলায় বলল সে। 'কি জানতে চান বলুন?'

ওমরকে অনুবাদ করে শোনাল রবিন।

'আমরা কেন এসেছি, জানাতে চাই আপনাকে,' ওমর বলল। 'শোনার পর আপনি বলবেন আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছেন কিনা।...আমাদের বোট নেই, প্লেনে করে এসেছি। মোহনার কাছে একটা ল্যাগুনে লুকিয়ে রেখেছি। ওদিকে কি লোকজন যায়?'

'ক্বচিৎ এক-আধজন। শিকারী কিংবা জেলে যায়,' মারকভ বলল। 'আমার বাড়ির পরে আর কোন বাড়ি নেই। কাজেই আরও ওদিকে টহলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কসাকদের। তবে শয়তানের বাচ্চা ওই খারগাটাকে আমি খুন করে পালালে সমস্ত দ্বীপে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ দেবে না।'

'খারগা তো সাথে লোক নিয়ে আসে। খুন করবেন কি করে?'

'সব ক'টাকে খুন করব আমি।'

মারকভের দিকে তাকাল ওমর, 'আপনি সত্যি খারগাকে খুন করতে চান?'

'নিশ্চয়ই। আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা? আমার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে ও। আরও অনেকেরই এ হাল করেছে। বহু মানুষের রক্ত লেগে আছে ওর হাতে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবার।'

'আপনি ওকে খুন করলে ফাঁসিতে ঝোলাবে আপনাকে।'

'ধরতে হবে তো আগে। বনের মধ্যে আমাকে খুঁজে বের করা অত সহজ না। তারপরেও যদি ধরেই ফেলে, ফেলুক, কিসের জন্যে বাঁচব আর? স্ত্রীকে হারালাম। পালক ছেলেটাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে আসতে হলো। ওই শয়তানদের অত্যাচারে মারা গেছে আমার স্ত্রী। এর শাস্তি ওদের পেতেই হবে।'

লম্বা শ্বাস নিল ওমর। 'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আপনি তো এখন একা। শাখালিন থেকে পালালেই পারেন।'

'না, পালানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। সে-আশা বহুকাল আগেই মরে গেছে। একটাই ইচ্ছে এখন আমার, খারগাকে খুন করা।'

'টাকা পেলে কোন সুবিধে হয়?'

'কোন কিছু দিয়েই আর কোন সুবিধে হবে না আমার।'

কেন এসেছে এ দ্বীপে, সংক্ষেপে জানাল ওমর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বহুদিন জেলে কাটিয়েছেন আপনি। আমেরিকান লোকটাকে কোন দিকের সেলে রাখা হয়, বলতে পারবেন?'

'আমি জেলে থাকতে তো তার সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেক পরে এসেছে। কোনদিকে রাখে বলতে পারব না।'

'তার সঙ্গে কি দেখা করা সম্ভব?'

'দেখা করা মানে আপনি লুকিয়ে থেকে দেখতে পারবেন। কথা বলতে পারবেন না। বলতে গেলে গার্ডদের চোখে পড়তে হবে। আপনাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢোকাবে।'

'কোনখানে গিয়ে দেখতে হবে?'

'রোজ কাজে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েদীদের। সবাইকেই কাজ করতে হয়। করাত কলে কিংবা কয়লা পাহাড়ে।'

'জেলের ভেতরে যাওয়া যায় না?'

'জেলে ঢোকা খুব কঠিন। অনেক সৈন্য পাহারা দেয় ওখানে। তাদের চোখ এড়িয়ে ঢোকা অসম্ভব।'

'বাইরে যারা কয়েদীদের পাহারা দেয়, তাদের হাতে তো নিশ্চয় অস্ত্র থাকে?'

'সব সময়। কখনও খালি হাতে থাকে না কেউ। হয় রাইফেল, নয়তো রিভলভার। কাউকে দৌড় দিতে দেখলেই গুলি করে। কারও যদি জীবনের মায়া ফুরিয়ে যায়, আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়, তাহলে আর কিছু করা লাগবে না, গার্ডদের সামনে দৌড় দিলেই হলো। গুলি খেয়ে চোখের পলকে পরপারে চলে যাবে।...তবে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছিল একজন। গুলি লাগেনি গায়ে। পর্বতের দিকে পালিয়েছে সে। ওর কি হয়েছে আমি জানি না। কোনদিন আর জেলে

ফিরে আসেনি।'

'দিনের বেলা কয়েদীদের যখন কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখনও কি জেলখানায় লোক থাকে?'

'তা তো থাকেই। প্রহরীরা থাকে। কয়েদীও থাকে বেশ কিছু। ওরা ধোয়ামোছা, রান্নাবাড়ার কাজ করে।'

'রাতে কিভাবে রাখা হয়?'

'লম্বা লম্বা সেল আছে, প্রতিটিতে দশ জন করে ঘুমায়। প্রতিটি সেলই এক রকম–লম্বা, সরু সরু। শেষ মাথায় একটা করে দরজা, তাতে লোহার মোটা মোটা শিক লাগানো। জেলখানার ভেতরের পুরো এলাকাটা ঘিরে উঁচু দেয়াল। রাত-দিন দেয়ালের ওপরে সেন্ট্রি বক্সে বসে পাহারা দেয় রাইফেলধারী সান্ত্রী। ওখানে বসলে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। দেয়ালের বাইরের দিকে পরিখা। চওড়া বেশি না। তবে তাতে পানির পরিবর্তে আছে গভীর কাদা। মাথা খারাপ করে এক কয়েদী একদিন সান্ত্রীদের বক্সে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাতে ঝাঁপ দেয়। কাদার মধ্যে তলিয়ে যায় সে। কোনমতেই মাথা তুলতে পারেনি আর। পরিখা পেরোনোর একটাই পথ–একটা ব্রিজ আছে, জেলখানার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে ব্রিজ পেরোতে হয়। তাতে সব সময় কড়া পাহারা থাকে।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ওমর, 'হুঁ। তারমানে জেল থেকে পালানো পুরোপুরি অসম্ভব করে রেখেছে ওরা। রবিন, জিজ্ঞেস করো তো গভর্নরের নাম কি?'

জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কর্নেল বগানিন,' মারকভ জানাল।

'কি ধরনের মানুষ?'

'আসলেই ও মানুষ কিনা গবেষণার বিষয়। কি ধরনের লোককে নিয়োগ করবে ওরা আন্দাজ করতে পারছেন না? এখানে পদোন্নতিই হয় নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে। যে যত নিষ্ঠুর, সে তত যোগ্য লোক। দয়ামায়ার ছিটেফোঁটা নেই, সারাক্ষণ ভদকা গিলে মাতাল হয়ে থাকে। সবার ওপর তার রাগ, এমনকি নিজের সৈন্যদের ওপরও। সব সময় তলোয়ার থাকে সঙ্গে। ইচ্ছে হলেই বাড়ি মারে, ইচ্ছে হলে খোঁচা মারে।'

'তারমানে কোন একদিন রেগে গিয়ে ওকেও খুন করে বসতে পারে কেউ।' রবিনকে বলল ওমর, 'মারকভকে জিজ্ঞেস করো, কয়েদীরা যেখানে কাজ করে, সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে কিনা। কিছু করার আগে তোমার বাবা কোথায়, কিভাবে আছেন, জেনে নিতে হবে আমাদের।'

জিজ্ঞেস করে জবাব দিল রবিন, 'হ্যাঁ, সে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে বলছে। তবে সেটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ খারগাকে খুন করে পর্বতে গিয়ে লুকানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে।'

'কোন্ সময় হলে ভাল হয়?'

'সকালে। যখন কয়লা পাহাড়ে কাজ করতে যায় কয়েদীরা। রোজ কাজ করে ওরা। এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে আমাদের, যেখান থেকে আমরা কয়েদীদের যেতে দেখব, কিন্তু ওরা আমাদের দেখবে না। মাঝে মাঝে নাকি সময় কাটানোর জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে ও। গোণে, ও যখন ছিল কতজন ছিল, এখন

কতজন আছে।'

সঙ্গে করে নিয়ে আসা খাবারগুলো মারকভকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, আর কিছু লাগবে কিনা।

মারকভ বলল, চিনি আর চা কি জিনিস ভুলেই গেছে। খেতে মন চাইছে।

'ঠিক আছে,' রবিন বলল, 'কাল সকালেই নিয়ে আসব।'

বিমানে ফিরে চলল সে আর ওমর।

'আজব লোক,' রবিন বলল। 'মৃত্যু ভয় নেই। পরিবেশই সম্ভবত এ রকম করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, পরিবেশই মানুষকে একেক রকম বানায়,' ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভারী গলায় বলল ওমর। 'ওর সঙ্গে যোগাযোগটা আমাদের কতখানি সহায়তা করবে বুঝতে পারছি না। উপকার হবে, সন্দেহ নেই; কিন্তু খারগাকে খুন করে বসলে যে শোরগোল শুরু হবে, তাতে আমাদের কাজে বাধা আসবে প্রচুর।'

'ওকে বোঝালে কেমন হয়? খারগাকে যাতে খুন না করে?'

'শুনবে না। ওর কাছে খারগাকে খুন করাটা খুন নয়, দায়িত্ব। প্রতিশোধ নিতে না পারলে নিজেকে ও ক্ষমা করবে না।'

'কুড়াল দিয়ে খুন করার এত ঝোঁক কেন?'

'আর কোন অস্ত্র নেই বলে।'

বিমানে পৌঁছতে পৌঁছতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। দেখল, ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে কিশোর আর মুসা। ওদের খোঁজে বেরোনোর কথা ভাবছিল।

দেরিটা কেন হয়েছে, জানাল ওমর।

চার

এক এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। ভোরের দেরি নেই। মারকভের কুঁড়ের দিকে চলেছে তিন গোয়েন্দা।

ফ্যাকাসে হয়ে আসছে আকাশের রঙ। বনের মধ্যে এখনও কালিগোলা অন্ধকার। বাঁয়ে আকাশের পটভূমিতে পর্বত-চূড়ার আকৃতিটা রূপ নিতে আরম্ভ করেছে সবে। তুষার কণা ভাসছে বাতাসে। ছুরির মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস যেন হাড় ভেদ করে মজ্জায় গিয়ে ঢোকে।

আধো অন্ধকারে মারকভকে অপেক্ষা করতে দেখল ওরা। কুড়ালটা কোমরে ঝোলানো। মাটি চাপা দেয়া নতুন একটা কবর। তাতে কোনমতে বানানো একটা কাঠের ক্রুশ পোঁতা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারকভ।

খাবারের পোঁটলাটা সাগ্রহে হাতে নিল সে। ধন্যবাদ দিল। পুঁতে রাখল একটা গাছের গোড়ায়। পাতা ছড়িয়ে ঢেকে দিল জায়গাটা। তারপর ওদের আসতে ইশারা করে নদীর তীর ধরে হাঁটা শুরু করল।

বিশ মিনিট পর ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকল ওদের নাকে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর

গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ধোঁয়ার উৎস। মারকভের কুঁড়েটার মতই আরেকটা কুঁড়ে। দূর দিয়ে সেটার পাশ কাটিয়ে এল। একই রাস্তায় আরও দুটো কুঁড়ে পড়ল। মোহনা পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। নদীটা এখন অনেক সরু হয়ে এসেছে, বড়জোর তিরিশ গজ। মাটি আর পানির মাঝে নলখাগড়ার দেয়াল রয়েছে এখানেও। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ছাড় দিয়েছে নলখাগড়া। পাথুরে তীরভূমি শ্যাওলায় ঢাকা। ছোট ছোট অগভীর খাঁড়ি আছে। প্রচুর বাঁক নদীতে।

ফার বনের যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে কিছু বার্চ। নদীর পাড়ের মাটি এখানে এবড়োখেবড়ো, পাথুরে। পানিতে প্রচুর বরফের কুচি ভাসছে।

ওদেরকে নিয়ে টিলার মত একটা উঁচু জায়গায় উঠল মারকভ। কোন কথা না বলে হাত তুলে দেখাল।

সামনে সিকি মাইল দূরে মোটামুটি সমতল একটা উঁচু জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে তাতে বিল্ডিং তোলা হয়েছে। পাথরে তৈরি, বিশাল বাড়ি। কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

শাখালিনের কুখ্যাত জেলখানা।

দুই পাল্লার বিরাট গেটটা বন্ধ। ওটার কাছ থেকে নানা দিকে পথ চলে গেছে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় যে চওড়া রাস্তাটা, সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে কয়েকটা কাঠের তৈরি বাড়ির সামনে। প্রচুর কাঠ আর গাছের গুঁড়ি স্তূপ করে রাখা হয়েছে ওখানে। করাত কল, বোঝা যায়। করাত কলের কাছ থেকে আরেকটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে ঢালের দিকে, হারিয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

রবিনকে বলল কিশোর, 'রাস্তাটা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করো ওকে।'

মারকভ জানাল, 'খনি আর রেললাইনের কাছে।'

অবাক হলো কিশোর। 'এখানে রেললাইন আছে?'

মারকভের সঙ্গে আবার খানিকক্ষণ কথা বলে রবিন জানাল, 'আছে। সরু লাইন, ছোট ছোট লোহার ছাতখোলা বগি চলে তার ওপর দিয়ে। কয়লা আর কাঠ নিতে আসে।'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে টিলা থেকে নেমে এসে আবার হাঁটতে শুরু করল মারকভ। আলো বাড়ছে। খোলা জায়গায় থাকা ঠিক না। জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। নদীর একটা বাঁক ঘুরতে জেলখানাটা দেখা গেল আবার। তারমানে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে।

নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে দেখা যাচ্ছে কয়লার খেতটা। দূর থেকে লাগছে পাহাড়ের গায়ে একটা ক্ষতের মত। ওটায় যাওয়ার রাস্তাটা পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে নেমে এসেছে একেবারে নদীর সমতলে; নদীর সমান্তরালে এগিয়েছে কিছুদূর—ওদের কাছ থেকে তিরিশ গজ দূরে—তারপর আবার বাঁক নিয়ে চলে গেছে কয়লা পাহাড়ের দিকে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা পাথরের স্তূপ, ভূমিধস নেমে সৃষ্টি হয়েছিল কোন এক সময়; খাঁজে খাঁজে জন্মে আছে ঘাস, ঝোপঝাড়, ছোট ছোট গাছপালা। লুকিয়ে বসে ওপারের রাস্তার দিকে নজর রাখার এক আদর্শ জায়গা। এখানে থাকলে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

লুকিয়ে পড়তে ইশারা করল মারকভ।

‘কোনখান দিয়ে নদীটা পেরোলে সবচেয়ে ভাল হয়, জিজ্ঞেস করো তো ওকে,’ রবিনকে বলল কিশোর। ‘নদীটা পেরোনোর প্রয়োজন পড়বেই আমাদের, বুঝতে পারছি।’

মারকভ জানাল, ‘আমাদের সামনেই একটা অগভীর জায়গা আছে, পানি একেবারে কম। কাছে একটা ব্রিজও আছে, বাঁকের ওপাশে। বনের ভেতর দিয়ে এসেছি বলে দেখতে পাননি।’

নিচু স্বরে রবিনকে কিছু বলল মারকভ। রবিন জানাল মুসা আর কিশোরকে, ‘মারকভ বলছে, বাবাকে কয়লা পাহাড়ে না-ও কাজ করাতে পারে। হয়তো করাত কলে নিয়ে যায়। কয়লা পাহাড়ে করলে যাওয়ার সময় দেখতে পাবই। আসার সময় হয়েছে ওদের।’

কয়েক মিনিট পরই জেলখানার দিক থেকে পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল দলটাকে। প্রহরী আর কয়েদীদের আলাদা করে চিনতে কোন অসুবিধে নেই। প্রহরীদের কারও হাতে চাবুক, কারও রাইফেল। পরনে ইউনিফর্ম–কালচে ধূসর মিলিটারি সার্ভিস ড্রেস। কয়েদীদের পোশাক হলুদ আর কালো ডোরাকাটা কাপড়ে তৈরি। রঙটা এমন ভাবে বাছা হয়েছে যাতে চোখে পড়ে সহজেই, লুকাতে অসুবিধে হয়। দুই সারিতে চলছে ওরা। কারও কারও হাতে কয়লা তোলার আনকোরা যন্ত্রপাতি। ঊনত্রিশ জন, গুনল কিশোর। বারোজন রাইফেলধারী প্রহরী; দুজনের হাতে চাবুক, কারণে-অকারণে গরু-ছাগলের মত পেটাতে পেটাতে নিয়ে চলেছে কয়েদীদের।

মার খেয়ে কেউ প্রতিবাদ করছে না। নীরবে এগিয়ে চলেছে। নরম মাটিতে পা পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

যে অবস্থা, ওদের মধ্যে মিস্টার মিলফোর্ডকে খুঁজে বের করা সহজ নয়, বুঝতে পারল কিশোর। শুধু পোশাক যে এক রকম পরেছে তা-ই নয়, দেখতেও সবাইকে এক রকম লাগছে। লম্বা লম্বা চুল, বহুদিনের না কামানো দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। চেহারা চেনার উপায় নেই।

কাছে চলে এসেছে দলটা। নদীর ওপারে গোয়েন্দাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে এখন। ইংরেজিতে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, তাতে কড়া বিদেশী টান, ‘অনেক হয়েছে, আর না। আর সহ্য করব না আমি!’

‘বোকামি কোরো না,’ আরেকটা কণ্ঠ বলল। বুকের মধ্যে রক্ত ঝলকে উঠল রবিনের। ওর বাবার গলা, কোন সন্দেহ নেই। মুসা আর কিশোরও চিনতে পারল কণ্ঠটা।

চাবুক হাতে দৌড়ে এল একজন প্রহরী। শপাং শপাং করে বাড়ি মারতে লাগল দুজনের পিঠে। দুজনের মধ্যে বেলচা কাঁধে নিয়ে হাঁটছিল যে খাটোমত লোকটা, সে চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধাঁ করে বেলচা বসিয়ে দিল প্রহরীর মাথায়। প্রহরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই হাত থেকে বেলচা ফেলে দিয়ে নদীর দিকে দৌড় মারল। কি ঘটবে জানা আছে তার। তাই সোজা না ছুটে এঁকেবেঁকে ছুটল। শুরু হলো গুলিবৃষ্টি। খামচি দিয়ে মাটি তুলে ফেলতে লাগল বুলেট, পাথরে পিছলে উড়ে গেল প্রাণ কাঁপানো শব্দ তুলে, গাছের গায়ে গিয়ে বিঁধতে লাগল।

কিন্তু লোকটা থামল না। পেছন ফিরে তাকাল না। পৌঁছে গেল নদীর ধারে। গুলি করে ওখানে তাকে লাগানো এখন আর সহজ না। পানিতে নেমে পড়ল সে। জানাই ছিল যেন ওখানে পানি কম। ফুলঝুরির মত পানি ছিটাতে ছিটাতে সেই অগভীর পানিতে দৌড়াতে লাগল। হোঁচট খেল একবার। দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর, ভাবল, গুলি খেয়েছে বুঝি। কিন্তু না। সোজা হয়ে আবার ছুটল। নদীতে বেশ স্রোত। সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে নদী পার হয়ে এপারে চলে এল সে। পাড়ে উঠেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। দ্রুত ক্রল করে বিপজ্জনক জায়গাগুলো পার হয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। কিশোররা যেখানে বসে আছে তার কাছ থেকে খানিক দূরে, নদীর ভাটির দিকে।

হুফ্ করে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল কিশোর। 'বাপরে, কি খেলটাই দেখাল! আমি তো ভাবতেই পারিনি পালাতে পারবে। ওস্তাদ লোক।'

অন্য কয়েদীরা থমকে গেছে। জোরাল গুঞ্জন উঠেছে তাদের মাঝে। প্রহরীরা চিৎকার করছে। গোলমালের সুযোগে আরেকজন কয়েদী পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে অত চালাক নয়। দশ গজ যাওয়ার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল। রাইফেল তাক করে ধরা হলো বাকি কয়েদীদের ওপর। চাবুকের বাড়ি পড়তে লাগল। হুকুমের পর হুকুম। এক জায়গায় জড়ো করা হলো তাদের। প্রহরীদের ইনচার্জ খেপা ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল রাগে। একজন সিপাই পাঠাল জেলখানায় খবর দিতে। চারজন সিপাই দৌড় দিল নদীর দিকে, নদী পেরিয়ে গিয়ে পলাতক আসামীকে ধরার জন্যে। ওকে ধরা অত সহজ নয়, ভাবল কিশোর, যেহেতু জখম হয়নি সে।

পাথরের স্তূপের ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে যতটা সম্ভব গুটিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা আর মারকভ।

জেলখানার ঘণ্টা বাজা শুরু হলো। সার্চ পার্টি এল। ছড়িয়ে পড়ল বনের মধ্যে।

মৃদু স্বরে কিশোর বলল, 'আমাদের এখন কেটে পড়া দরকার।'

জেলখানায় গিয়েছিল যে প্রহরীটা, সে ফিরে এল। মেসেজ নিয়ে এসেছে। সেটা পড়ে কয়েদীদের উদ্দেশে আরও প্রচুর হুকুম আর ধমক-ধামক বিতরণ করল ইনচার্জ। কয়েদীদের নতুন ভাবে সারিবদ্ধ করা হলো। মার্চ করিয়ে আবার নিয়ে চলল কয়লা পাহাড়ের দিকে। যে প্রহরীটা মাথায় বেলচার বাড়ি খেয়েছে, তার মাথায় এখন ব্যান্ডেজ। টলতে টলতে জেলখানার দিকে চলে গেল সে। রইল কেবল মৃত কয়েদীটা। কুকুরের মত মরে পড়ে আছে সে, কারও নজর নেই ওর দিকে।

কিশোরের বাহুতে হাত রাখল রবিন। 'উঠতে বলছে মারকভ। বলছে, ঘুরপথে নিয়ে যাবে, সৈন্যরা এপারে এলেও যাতে ওদের চোখে না পড়তে হয়।'

ছুটতে শুরু করল মারকভ। তার সঙ্গে তাল রেখে দৌড়ানো কঠিন হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ একভাবে দৌড়ানোর পর গতি কমাল সে। বনের মধ্যে থেকে বেরোয়নি একবারের জন্যেও।

মাটিতে পড়ে থাকা দুটো গাছ দেখা গেল। চিনতে পারল মুসা। বলল, 'কুঁড়ের কাছে এসে গেছি। ওই গাছগুলো চিহ্ন। মনে আছে আমার।'

তার কথা শেষ না হতেই থেমে গেল মারকভ। রবিনের মাধ্যমে জানাল, এখন

সে একা গিয়ে দেখে আসবে কুঁড়ের কাছটা নিরাপদ কিনা। যেহেতু কয়েদী পালিয়েছে, সমস্ত বাড়িতে খোঁজা হবে, জানা কথা। তারমানে তার নিজেরটাও বাদ যাবে না।

আপত্তি করল না কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিমানে ফিরে যেতে চায়।

মারকভের যেন কোন ক্লান্তি নেই। দ্রুত হেঁটে হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস, যে লোকটা পালিয়েছে, সে মিকোশা। তাকে খুঁজে বের করা দরকার। তার কাছে জানা যাবে মিলফোর্ড আঙ্কেলকে কোন সেলে রাখা হয়েছে।'

'জানলে লাভ কি?' মুসার প্রশ্ন। 'জেলে ঢুকব কি করে? আরও সমস্যা আছে। এক সেলে যদি দশ জন মানুষ থাকে, তো একজনকে বের করে আনা যাবে না। বাকি সবাই সঙ্গে আসতে চাইবে।'

'কথাটা ভাবিনি আমি, তা নয়,' কিশোর বলল। 'পালাতে চাইলে পালাবে; ভালই হবে সেটা আমাদের জন্যে। একজনকে খোঁজার চেয়ে দশ জনকে খোঁজা ঝামেলা হয়ে যাবে ওদের জন্যে। ঘোলা পানিতে পালানো সহজ হবে আমাদের।'

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার চমকে দিল ওদের। সামনে থেকে এসেছে। দুই কি তিন সেকেন্ড থাকল, তারপর হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। মাঝপথে কাটা পড়ে গেল যেন।

'মারকভ বিপদে পড়ল নাকি?' উদ্বিগ্ন হয়ে কিশোর বলল। 'চলো তো দেখি।'

পাঁচ

ফাঁকা জায়গাটুকু, যেখানে মারকভের কুঁড়েটা রয়েছে তার কাছ থেকে সামান্য দূরে গাছের আড়ালে এসে থামল ওরা। মারকভ দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কয়েদীর পোশাক পরা আরেকজন লোক। এক চোখের চারপাশে কালো দাগ, কপালে একটা কাটা। মাটিতে পড়ে আছে জেলখানার ইউনিফর্ম পরা একটা প্রহরী। পাশে পড়ে আছে তার রাইফেলটা।

'তাহলে এই ব্যাপার,' গম্ভীর মুখে বলল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝে গেল যা বোঝার।

পালিয়ে আসা লোকটার দৃষ্টি দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘোরাঘুরি করতে থাকল তিন কিশোরের ওপর। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল দাড়ি-গোঁফে ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে। 'তিন গোয়েন্দা। খবর তাহলে পেয়ে গেছ।...তুমি নিশ্চয় রবিন। বাবাকে নিতে এসেছ।'

এগিয়ে গেল রবিন, 'আপনি মিকোশা ওয়াসাকি, তাই না? হ্যাঁ, আপনাদের নিতে এসেছি আমরা।'

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এর এই অবস্থা কে করেছে?'

মারকভকে দেখাল মিকোশা, 'ও।'

'মারা গেছে?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'এখানে এই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না,' বলে দেরি করল না কিশোর। বনে ঢুকে পড়ল।

সবাই অনুসরণ করল তাকে।

'আপনাদের হয়েছিল কি?' মিকোশাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'প্লেন ক্র্যাশ করেছিল নিশ্চয়?'

'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পানিতে পড়লাম। একটা পেট্রল বোট থেকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এল এখানে। তারপর সেই পুরানো কাহিনী। গুপ্তচরগিরির অভিযোগ এনে জেলে ভরে দিল দুজনকেই।'

'এখন যে পালালেন, উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার? আমাদের আসার খবর তো জানতেন না। দ্বীপ থেকে বেরোতেন কি করে?'

'নদীতে গিয়ে একটা নৌকা জোগাড়ের চেষ্টা করতাম। তারপর রাতের বেলা সাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে ঢুকে পড়তাম।'

'এই কুঁড়ের কাছে এসেছিলেন কেন?'

'শুকনো কাপড়ের জন্যে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে শুকনো পরেই হি-হি কাঁপুনি, পরে আছি ভেজা। বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে কুঁড়েটা দেখে ভাবলাম কিছু পাওয়া যেতে পারে। সবে ভেতরে ঢুকেছি, বাইরে আওয়াজ হলো। বাড়ির মালিক এসেছে মনে করে বেরিয়ে দেখি একজন গার্ড। কোন সুযোগ দিল না আমাকে। রাইফেল দিয়ে বাড়ি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ইচ্ছেমত বাড়ি আর লাথি। অবশ বানিয়ে ফেলল। ওঠার শক্তি পাচ্ছিলাম না। চোখ বুজে ফেলেছিলাম। হঠাৎ বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলে দেখি পড়ে যাচ্ছে গার্ড। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে মাথা থেকে।' মারকভকে দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটার হাতে কুড়াল।...লোকটা কে?'

'একজন প্রাক্তন কয়েদী। রাশান। এই কুঁড়েটা তারই।'

'চেনো মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এখানে এসে পরিচয় হয়েছে।'

'রাশান? বিশ্বাস করো?'

'করব না কেন? ভালমন্দ সব দেশেই আছে। শুধু রাশান বলেই তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। বিনা দোষে ওকে জেল দিয়ে ওর জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে, তাই জেলের লোকদের দেখতে পারে না সে। ওদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মিকোশা। 'ওদের ওপর তার প্রচণ্ড আক্রোশ। গার্ডটাকে কোপ মারার সময় যে রকম ঘৃণা দেখলাম ওর চোখে; মনে হলো মেরে খুব মজা পাচ্ছে।'

'শুনে মোটেও অবাক হলাম না।'

'আমাকে সাহায্য করার ছুতোয় একটা প্রতিশোধ নিল সে, তাই না?'

'রক্তের জন্যে ও পাগল হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে জেল খেটেছিল দশ বছর। গতকাল ওর স্ত্রী যক্ষ্মা আর খারগার অত্যাচারে মারা গেছে। মারকভ প্রতিজ্ঞা করেছে, জেলখানার প্রহরীদের যাকে বাগে পাবে, তাকেই খতম করে দেবে।'

কি যেন বলল মারকভ।

অনুবাদ করে শোনাল রবিন, 'ও জানতে চাইছে ওকে আর প্রয়োজন আছে কিনা আমাদের। না থাকলে কুঁড়েটা পুড়িয়ে দিয়ে গুহায় চলে যাবে।'

'লাশটার কি হবে?'

জিজ্ঞেস করে জবাব দিল রবিন, 'ও বলছে, ব্যবস্থা করে ফেলবে। আরও গার্ড চলে আসার আগেই আমাদের চলে যেতে বলছে।'

মিকোশার দিকে তাকাল কিশোর। 'আসুন। মারকভকে নিয়ে চিন্তা নেই। জঙ্গল ওর কাছে বাড়িঘর। কিন্তু আপনি এ ভাবে বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, পেটের খিদে আরও খানিক সহ্য করতে পারব। মারা যাচ্ছি শীতে। এ রকম ভেজা কাপড়ে···সহ্য করতে পারছি না আর।'

'হ্যাঁ, প্লেন পর্যন্ত যাওয়াও কঠিন হয়ে যাবে। দাঁড়ান, দেখি, মারকভকে জিজ্ঞেস করে। কোন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা। রবিন, জিজ্ঞেস করো তো ওর কাছে কিছু আছে নাকি। যা কিছু হোক, ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারলেই চলবে।'

মারকভের সঙ্গে কথা বলল রবিন। তারপর জানাল, 'ও বলছে, পরনে যা পোশাক আছে সেটাই সম্বল ওর। তবে চামড়ার একটা পুরানো ওভারকোট আছে, বাড়তি।'

'ওতেই চলবে।'

'গার্ডের রাইফেলটা রেখে দিতে চাচ্ছে সে।'

'দিক না। ওটাতে ওর অধিকারই তো বেশি।'

কিশোর যা বলল, মারকভকে জানাল রবিন।

এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল মারকভ। কুঁড়েতে ঢুকল। বেরিয়ে এল একটা ওভারকোট নিয়ে। কয়েকটা নেকড়ের চামড়া সেলাই করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। নামে ওভারকোট, কিন্তু আসলে কি জিনিস হয়েছে বলা মুশকিল। তবে সেটাই আগ্রহের সঙ্গে হাতে তুলে নিল মিকোশা। যে জিনিসই হোক, গায়ে দিয়ে আগে শীত ঠেকানো দরকার।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'আমাদের জন্যে যা করল ও, তার জন্যে মারকভকে আমাদের সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ দাও। বলো, ওকে যে কোনভাবেই হোক সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা। আমরা কোথায় আছি, ওর ধারণা আছে। খাবার বা অন্য যে কোন কিছুর প্রয়োজন হলে যেন নির্দ্বিধায় চলে আসে।'

মারকভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

কয়েক কদম গিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, ওদের দিকেই চেয়ে আছে মারকভ। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল না মনে কি চলছে।

হাত নাড়ল কিশোর।

জবাবে মারকভও হাত নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'গুহা থেকে ফিরে আসবে ও,' রবিন বলল। 'খারগাকে খুন না করে স্বস্তি নেই। যে কাণ্ড করল আজ ও, রীতিমত ভয় লাগছে ওকে আমার। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে লোকটার মাথা দু'ফাঁক করে মেরে ফেলল, কোন বিকার নেই; যেন একটা মশা মেরেছে।'

'ওর সম্পর্কে এ সব মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই আমাদের,' কিশোর বলল। 'জেলখানা নামের ওই ভয়ানক নরকটাতে দশটা বছর কাটাতে হলে ও যা করছে, তারচেয়ে কম কিছু করতাম না আমরাও। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? এত বছরের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আর বঞ্চনার জ্বালা মগজের সব অনুভূতি ভোঁতা করে দিয়েছে ওর।'

কথা বাড়াল না আর ওরা। দ্রুত এগিয়ে চলল বনের ভেতর দিয়ে।

খালের পাড়ে আগের জায়গাতেই বাঁধা আছে ডিঙিটা। তারমানে এদিকে এখনও আসেনি প্রহরীরা। দড়ি খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল সবাই।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিমানের দরজায় অপেক্ষা করছে ওমর। দেখেই বলে উঠল, 'তোমাদের দেরি দেখে তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ডিঙিটাও নেই। থাকলে চলে যেতাম।'

'না গিয়ে ভাল করেছেন,' কিশোর বলল। 'কয়েদী পালিয়েছে। সারা বনে ছড়িয়ে পড়ছে সৈন্যরা।'

মিকোশাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'নিশ্চয় মিস্টার ওয়াসাকি? কোথায় পেলে এঁকে?'

মৃদু হেসে কিশোর বলল, 'ইনিই তো পালানো কয়েদী। ভেতরে চলুন, বলছি সব।'

ছয়

খেতে বসেছে সবাই। বহুদিনের অভুক্ত মানুষের মত গোগ্রাসে গিলতে লাগল মিকোশা। দুই কেটলি পানি গরম করতে হলো রবিনকে, যাতে মিকোশার কফির অভাব না পড়ে।

'আসল কথায় আসা যাক এবার,' মিকোশার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল ওমর। 'প্রথম কথা, মিস্টার ওয়াসাকি···'

'শুধু মিকোশা বললেই চলবে।'

'থ্যাংক ইউ।···মিকোশা, মিস্টার মিলফোর্ডকে কিভাবে উদ্ধার করে আনা যায় একটা পরামর্শ দিন তো। জেলে ঢুকে বের করে আনা সহজ, নাকি বাইরে যখন কাজ করাতে নিয়ে যায় তখন?'

'অবশ্যই বাইরে থেকে,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল মিকোশা।

'তাঁকে মুক্ত করে আনার আগে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব?' কিশোর জানতে চাইল।

'তার কি কোন দরকার আছে?'

'আছে। পালানোর জন্যে তৈরি থাকবেন তিনি। তাতে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা কম।'

'হুঁ, তা বটে,' মাথা দোলাল মিকোশা। কফির কাপে চুমুক দিল। 'আমার জানামতে যোগাযোগ করার একটা জায়গাই আছে। কয়লা পাহাড।'

'কেমন দেখতে? কাছে থেকে দেখা সম্ভব?'

'দূর থেকে সম্ভব, তা-ও টহলে বেরোনো গার্ডদের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে। মাটির কয়েক ফুট গভীরেই রয়েছে কয়লা। দু'তিনশো গজ জায়গা জুড়ে গা থেকে মাটি খসিয়ে কয়লা বের করা হয়েছে। আসলে কয়লারই পাহাড় ওটা। মাটির নিচ থেকে ঢিবির মত উঁচু হয়ে উঠেছে। গা থেকে যেখানেই মাটি আর অন্যান্য জঞ্জাল সরানো হোক, বেরিয়ে পড়ে কয়লা।'

'ওসব জঞ্জাল নিশ্চয় নিচে, আশেপাশেই জমা করে রাখা হয়?'

'নেবে আর কোথায়? তা ছাড়া সরানোর দরকারই বা কি? সব কিছু মিলিয়ে অতি জঘন্য লাগে দেখতে। যেতে চাইলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি আমি, যখন কাজ হয় না ওখানে।'

'যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় কখন?'

'ভোরের আগে, কিংবা সন্ধ্যায়, চাঁদ ওঠার পরে। কেউ থাকে না তখন।'

'সব সময় কি একই জায়গায় কাজ করতে নিয়ে যায় কয়েদীদের?'

'তা তো নেবেই, পাহাড়টা তো আর সরানো যাবে না। কেউ কয়লা তোলে, কেউ জঙ্গল কাটে—বনও পরিষ্কার হয়, কাঠও পাওয়া যায়। বড় বড় গাছ করাত কলে পাঠিয়ে দেয়। তক্তা বানিয়ে চালান দেয়ার ব্যবস্থা করে। পাহাড়ের গোড়ায় আবর্জনা যা জমে থাকে, পুড়িয়ে ফেলে।'

'সকাল বেলা কাজে বেরোনোর আগে কি কি করতে হয় কয়েদীদের?'

'প্রথমে জেলখানার উঠানে নাম ডাকা হয়। এক সারিতে দাঁড়ায় সব কয়েদী। তাদের ঘিরে রাখে সশস্ত্র প্রহরীরা। তারপর সারি ভেঙে দুটো সারি করা হয়। কাজ করার জন্যে নতুন কোন যন্ত্রপাতি নেয়ার প্রয়োজন হলে নিয়ে নেয় কয়েদীরা। গেট দিয়ে বেরিয়ে মার্চ করে এগোয় কয়লা পাহাড়ের দিকে।'

'এর কোন ব্যতিক্রম হয় না?'

'সাধারণত হয় না।'

'কাজের জায়গায় যাওয়ার পর কি হয়? কাজ করার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে?'

'নিয়ম-কানুন আর কি। দল ভেঙে দিয়ে যার যার কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথবা যার যার আগের দিনের বাকি কাজ শেষ করে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বুঝলাম। কাছে থেকে দেখতে চাইলে ওরা আসার আগেই গিয়ে কয়লার স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে।'

সিগারেট টানা থামিয়ে দিল মিকোশা। 'বলো কি! মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।'

'এখানে যা-ই করতে যাব না কেন, ঝুঁকি থাকবে। এই যে বসে আছি, এটা কি ঝুঁকি নয়? সেজন্যেই আমি চাইছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে পালাতে। ভাবছি, আজ রাতেই পাহাড়টা দেখতে যাব। চাঁদের আলোয় ভাল করে দেখে আসব কোথায় কি আছে। এখন যতটা পারা যায় বিশ্রাম নিয়ে নেয়া দরকার। পালা করে একজনকে পাহারায় থাকতে হবে।'

চুপ করে গেল মিকোশা।

আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

সূর্য ডোবার সামান্য আগে পাহারায় ছিল রবিন, ঘোষণা করল, একটা লঞ্চ দেখা যাচ্ছে। পেট্রল বোট। সাগরের দিক থেকে এসে মোহনা ঘুরে নদীতে ঢুকল লঞ্চটা।. এগিয়ে আসতে লাগল তটরেখা ঘেঁষে।

রবিনের ডাক শুনে বেরিয়ে এল সবাই।

দেখেটেখে ওমর বলল, 'কোস্টাল পেট্রল বোট। কিছু খুঁজতে এসেছে। কি খুঁজতে এসেছে, তা-ও অনুমান করতে পারছি। মিকোশা, আপনাকে খুঁজছে ওরা। এমন একটা নৌকার তালাশে এসেছে, যেটাতে করে পালাতে চাইছেন আপনি। তারমানে সত্যি যদি নৌকায় করে পালানোর চেষ্টা করতেন, বেশিদূর যেতে পারতেন না। কোন নৌকাকেই এখন ভালমত না দেখে মোহনা পেরোতে দেবে না ওরা।'

'এ পাড়ের কাছে যে আসছে না, বাঁচা গেছে,' মুসা বলল।

জবাব দিল না ওমর। লঞ্চটার দিকে চোখ।

ওপাড় ধরেই এগোতে লাগল ওটা। কিছুদূর এগিয়ে একটা বাঁকের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। এঞ্জিনের আওয়াজ কানে আসছে। গাছের জটলার জন্যে দেখা যাচ্ছে না লঞ্চটা। নদীর তীরে দুটো জেলে ডিঙি বাঁধা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কমলা আভা ছড়িয়ে পড়েছে পানিতে।

গাছের জটলার অন্য পাশ দিয়ে আবার বেরিয়ে আসতে দেখা গেল লঞ্চটাকে। এবার নদীর এপাশে চলে এসেছে, ওরা রয়েছে যে পাশটায়। সাড়া ফেলে দিল হাঁসের ঝাঁক। চিৎকার করতে করতে উড়াল দিল ওগুলো। গেল না। মাথার ওপর চক্কর দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল।

'এই ভয়টাই করছিলাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'ওরা শুধু ওই পাড়ে খোঁজাখুঁজি করেই চলে যাবে না।'

'এখানে আসতে আসতে অবশ্য দেখার মত আলো আর থাকবে না,' কিশোর বলল। 'অন্ধকার তো প্রায় হয়েই গেছে। চরায় আটকে যাওয়ার ভয়ে তীরের বেশি কাছে আসতে চাইবে না।'

'হ্যাঁ, কিছু যখন করতে পারব না আমরা, জীবনটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।'

দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু গোধূলির আলোয় এঞ্জিনের ধুক-ধুক ধুক-ধুক শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে লঞ্চটা। কেবিনের কাঁচের জ্যানালার ওপাশে হুইলের পেছনে দুজন মানুষকে দেখা গেল। গলুইয়ে আছে একজন। চতুর্দিকে নজর রাখছে সে। পেছনে আরও একজন, তার নজর শুধু তীরের দিকে।

নলখাগড়ার বেড়ার কাছাকাছি এসে এঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল। যে ল্যাগুনে লুকানো রয়েছে বিমানটা তার কাছ থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে হবে। আরেকটু এগিয়ে ধীরে ধীরে থেমে গেল লঞ্চটা।

'দেখে ফেলল নাকি আমাদের!' গলা কাঁপছে মুসার।

'মনে হয় না,' জবাব দিল কিশোর। 'আলো একেবারেই নেই।'

ঝনঝন করে উঠল নোঙরের শিকল।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ওমর বলল, 'তাহলে এখানেই রাত কাটানোর ইচ্ছে।

অন্ধকারে চলার ঝুঁকি নিতে চাইছে না।'

'একেই বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'নইলে নোঙর ফেলার আর জায়গা পেল না। একেবারে আমরা যেখানে...'

'হয়তো আমাদের মত একই কারণে এখানে নোঙর ফেলেছে ওরাও,' কিশোর বলল। 'বাতাসের ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে। আস্তে কথা বলো। পানির ওপর শব্দ কিভাবে চলাচল করে জানো না।'

'আলো জ্বালতেও সাবধান,' ওমর বলল। 'ম্যাচট্যাচ কিচ্ছু জ্বালানো যাবে না। কোনভাবেই যেন আলো চোখে না পড়ে ওদের। আমরা যে এখানে আছি, ওরা জানে না। ভোর হলে, কিংবা চাঁদ উঠলেই চলে যাবে।'

'তা তো বুঝলাম,' মৃদুস্বরে বলল রবিন। 'কিন্তু আমাদের কয়লা পাহাড়ে যাবার কি হবে?'

'দাঁড়াও না, দেখি আগে, ওরা কি করে,' কিশোর বলল।

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল বিমানের কেবিন জুড়ে।

সাত

সময় যাচ্ছে।

লঞ্চের রাইডিং লাইট জ্বেলে দেয়া হয়েছে। কেবিন থেকে হলদে আলোর সরু একটা চিলতে এসে তেরছা ভাবে পড়েছে পানিতে। নদীর ওপারে চোখে পড়ছে দু'একটা মিটমিটে আলো। মারকভের মত সেই সব হতভাগ্যদের কুঁড়ে, যাদের কাছে সুখ জিনিসটা সোনার চেয়ে দামী।

মাঝে মাঝে গুঞ্জনের মত কথার শব্দ ভেসে আসছে লঞ্চ থেকে। স্পষ্ট নয় একটা শব্দও। রবিনও বুঝতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে তার কাছে। মুসার কাছে একঘেয়ে, বিরক্তিকর। কিশোরের কাছে উদ্বেগের, কারণ, যতক্ষণ লঞ্চটা থাকবে, আটকে বসে থাকা লাগবে ওদের, কিছুই করা যাবে না। ওমর আর মিকোশারও ভাল লাগছে না, ওটা না-যাওয়া পর্যন্ত একটা বিরাট দুশ্চিন্তা। আরও একটা কথা মনে হচ্ছে কিশোরের, কোন কারণে যদি লঞ্চ থেকে নেমে ওরা টহল দিতে চলে আসে এদিকে, টর্চ জ্বেলে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে কি ঘটবে বলা মুশকিল!

মধ্যরাতের পর একটা নতুন শব্দ কানে এল লঞ্চ থেকে। বিমানের কেবিনে বসে যারা ঢুলছিল, চমকে জেগে গেল। রেডিও মোর্সের শব্দ।

ওই মোর্সের জন্যেই কিনা কে জানে, হঠাৎ পুরোপুরি জ্যান্ত হয়ে উঠল লঞ্চটা। নোঙর তোলা হলো। এঞ্জিন চালু হলো। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে এ সব শব্দ বিস্ময়কর রকম বেশি হয়ে কানে বাজতে লাগল। চলতে আরম্ভ করল লঞ্চটা। নাক ঘুরে গেল। ঢেউয়ের দোলায় নলখাগড়ার বেড়াকে দুলিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল। কোনদিকে আর না তাকিয়ে সোজা চলে গেল মোহনার দিকে।

'উফ্, বাঁচলাম,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

লঞ্চটা যেদিকে গেল সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

মুসা বলল, 'গর্তের বাইরে বেড়াল ওত পেতে থাকলে ইঁদুরের কেমন লাগে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আজ।'

সিগারেটের জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছিল ওমরের, লঞ্চ থেকে আগুন দেখতে পাবে ভয়ে জ্বালাতে পারছিল না। সিগারেট ধরিয়ে মনের সুখে টান দিল সে। মিকোশা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এতদিন পর শান্তি। তাই এত যে শব্দ, এত নড়াচড়া, কোন কিছুই তার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারছে না।

চলে গেছে লঞ্চটা। আর এল না। দরজার কাছ থেকে ফিরে এল কিশোর। 'এবার বেরোনো যায়। পাহাড়টা গিয়ে দেখে আসা দরকার। আমার প্ল্যানটা কি, খুলে বলি। ওখানে গিয়ে যদি সুবিধামত একটা লুকানোর জায়গা পাই, যেখান থেকে মিলফোর্ড আঙ্কেলকে কাজ করতে দেখতে পাব, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব, তাহলে সেখানে বসে যাব। তাঁকে জানিয়ে দেব, আমরা চলে এসেছি।'

'তার কি কোন দরকার আছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আছে। তাঁর অজান্তে হঠাৎ করে কিছু করতে গেলে চমকে যাবেন। উল্টোপাল্টা কিছু করে বসলে ভালর চেয়ে খারাপ হবে। তারচেয়ে জানিয়ে রাখলে রেডি থাকবেন, আমাদের সহযোগিতা করতে পারবেন, পালাতে সুবিধে হবে।'

'কথা বলার পর ফিরবে কি করে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'কয়েদীরা সব জেলখানায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারব না,' কিশোর বলল। 'এমনকি গার্ডদের সামনে নড়াচড়া করাও কঠিন হয়ে যাবে।'

'তারমানে সারাদিন আটকে থাকবে ওখানে!'

'আর কি করব। কফি আর বিস্কুট খেয়ে কাটিয়ে দিতে হবে। যাকগে, সেসব নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে। এখন গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার। লুকানোর জায়গা আছে কিনা, সেটাও তো বুঝতে হবে।'

'সঙ্গে কে কে যাচ্ছে তোমার?' জানতে চাইল মুসা। 'নিশ্চয় রবিন?'

'প্রথমত, মিকোশা যাচ্ছেন। কারণ জায়গাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানোর জন্যে তাঁকে প্রয়োজন আছে আমার।'

'আমি রাজি,' বলে উঠল মিকোশা। কখন ঘুম ভেঙেছে তার, কেউ লক্ষ করেনি। জেগে উঠে ওদের কথা শুনছিল।

হেসে তার দিকে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'রবিনকে নিতেই হচ্ছে। দোভাষীর কাজ চালানোর জন্যে। আমার সঙ্গে লুকিয়ে বসতেও তাকে অনুরোধ করব। আমি চাই, ওর বাবার সঙ্গে কথাবার্তাটা সে নিজেই চালাক।'

'আর ওমর ভাই?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তাকে তো প্লেনে থাকতেই হবে। প্লেন পাহারা দেয়ার জন্যে। এটার কিছু হয়ে গেলে প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে যাবে আমাদের। কিংবা হয়তো দেখা যাবে কয়েদী কমাতে এসে শাখালিন কারাগারের কয়েদীর সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ফেললাম। এখন বেরিয়ে গিয়ে আমাদের যদি কিছু হয়, কোন বিপদে পড়ি, ফিরতে না পারি, ওমর ভাই যা ভাল বোঝে তা-ই করবে।'

'আর আমার কি কাজ?'

'তুমি ওমর ভাইকে সঙ্গ দেবে।'

'অ, আমি তাহলে একটা বাতিল জিনিস!' ফুঁসে উঠল মুসা। 'ওসব হবেটবে না। শুধু শুধু বসে থাকতে আমি পারব না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। একজন বাড়তি লোক থাকলে অনেক উপকার পাবে।'

'ঠিক আছে, যেতে চাইলে চলো,' আপত্তি করল না কিশোর। 'নৌকা বাওয়ার জন্যেও তো কাউকে দরকার। তুমি আমাদের পারাপারের মাঝি।' মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল সে। 'সবাই ওভারকোট পরে নাও।'

যার যার ওভারকোট পরে নিল রবিন আর মুসা। মিকোশা গায়ে চড়াল মারকভের দেয়া উদ্ভট পোশাকটা। দেখতে খারাপ হলেও জিনিসটা কাজের, তার প্রমাণ পেয়ে গেছে সে। খুব গরম। আর জেলখানার বিশ্রী পোশাকটাও তাতে ঢাকা যায়।

ডিঙিতে করে তীরে পৌঁছল ওরা। নামার আগে ভালমত দেখে নিল কেউ নজর রাখছে কিনা। নির্জনই মনে হলো। একে একে তীরে নামল সবাই। ডিঙির দড়ি শক্ত করে গাছের সঙ্গে বাঁধল মুসা।

এক সারিতে রওনা হলো ওরা। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মিকোশা। সবার শেষে রয়েছে মুসা। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে সে, কেউ অনুসরণ করছে কিনা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা, তাড়াহুড়ো নেই। বনের কিনার ঘেঁষে চলেছে, যাতে বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেই ডাইভ দিয়ে লুকিয়ে পড়তে পারে গাছপালার আড়ালে। খানিক পর পরই থামছে। কান পেতে শুনছে কোন শব্দ আছে কিনা। এ রকম প্রতিকূল পরিবেশে, অচেনা অঞ্চলে স্নায়ু সব সময় টানটান হয়ে থাকে। কাজেই আচমকা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা ভালুক যখন ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে পালাল, বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল সবার। প্রাণীটার পাহাড়ের দিকে ছুটে যাওয়ার শব্দ বহুক্ষণ ধরে শোনা যেতে থাকল।

চলতে চলতে নাকে এল কাঠ-পোড়া গন্ধ। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সবাই কাছে এলে ফিসফিস করে বলল, 'মারকভের কুঁড়ে পুড়ছে, কোন সন্দেহ নেই। সামনের মোড়টার পরেই। ও এখনও আছে নিশ্চয়। চলো, দেখা যাক।'

এগিয়ে চলল আবার। আগের চেয়ে আরও সাবধান। গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ছাই হয়ে গেছে কুঁড়েটা। কথামতই কাজ করেছে মারকভ। কিশোর লক্ষ করল মরে পড়ে থাকা গার্ডের লাশটা নেই।

ছাইয়ের গাদায় এখনও ধিকিধিকি আগুন। মারকভকে দেখা গেল না। পা বাড়াতে যাবে আবার ওরা, এই সময় ফতফত্ শব্দ হলো।

বরফের মত জমে গেল যেন সবাই। ঘোড়ার মাথা ঝাঁকি দেয়াতে লাগাম নাড়ার শব্দ। একবারই হলো। আর কোন শব্দ নেই। কোন্খান থেকে এল তা-ও বোঝা গেল না। ফাঁকা জায়গাটাকে ঘিরে আছে গাছের কালো দেয়াল। গাছের ডাল মাথার ওপরে এত ঘন চাদোয়া তৈরি করেছে, চাঁদের আলো সামান্যতম ঢুকতে পারছে না তার মধ্যে। গভীর কালো একটা গর্তের মত লাগছে জায়গাটাকে, ওরা রয়েছে গর্তের তলায়। এখানে আলো বলতে শুধু পোড়া ছাইয়ের মাঝে নিভে আসা

আগুন। চারপাশে তার লালচে আভা।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। তার সঙ্গে বাকি সবাই। বুঝতে পারছে একটা ঘোড়া রয়েছে কাছেপিঠে কোথাও। লাগামের শব্দ, পিঠে সওয়ারি আছে। মারকভের ঘোড়া নেই, সওয়ারি মানেই শত্রু।

সেকেন্ড কাটছে। সেকেন্ড থেকে মিনিট। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল কিশোর। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। অপেক্ষা করার সুফল মিলল অবশেষে। কথা বলে উঠল একটা লোক। স্পষ্ট, ধারাল গলা। গাছের কালো দেয়ালের পটভূমিতে অস্পষ্ট ছায়ার নড়াচড়া দেখা গেল। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল দুজন ঘোড়সওয়ার। ছাইয়ের স্তূপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল গাছপালার ভেতর দিয়ে নদীর পাড়ের পথটার দিকে।

খুরের মৃদু খট খট আর জিনের খচমচ শব্দ দূরে পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার পর কথা বলল কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলল ওরা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। বলল এখানে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। ও ফিরে আসবে না।'

'মারকভের কথা বলল?'

'সে-রকমই তো মনে হলো। আর কার কথা বলবে?'

'শুধু মারকভকেই নয়, মিকোশাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা,' কিশোর বলল। 'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কতটা সাবধান থাকতে হবে আমাদের। কি বাঁচাটা বেঁচেছি! আরেকটু হলেই ওই কসাক দুটোর সামনে পড়ে গেছিলাম। তবে এখন মনে হয় আমরা নিরাপদ।'

নদীর পাড়ের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ওরা। সাবধানতায় ঢিল পড়েনি, বরং বেড়েছে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অবাস্তব লাগছে মুসার কাছে। মনে হচ্ছে, বাস্তবে নয়; স্বপ্নে ঘটছে এ সব ঘটনা। কিছু বলল না। হেঁটে চলল চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর আবার যখন বনে ঢুকল মিকোশা, ফের অস্বস্তিতে পড়ে গেল সবাই। রাস্তা ধরে না গিয়ে বনের ভেতর দিয়ে ঘুরে যেতে চায় মিকোশা। এই সাবধানতার অবশ্য প্রয়োজন আছে। কে কোনখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে, বোঝার উপায় তো নেই।

নদীর বেশ কিছুটা উজানে আবার বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নদীটা এখানে সরু। চওড়া খুব কম।

বরফ শীতল পানি ভেঙে ওপারে যাওয়ার কথা ভাবতেই দমে গেল কিশোর। দুশ্চিন্তা দূর হলো রবিনের কথায়। বলল, সামনে একটা ছোট ব্রিজ আছে। মনে পড়ল, মারকভও বলেছিল ব্রিজ আছে। মিকোশা জানাল, আরও খানিকটা সামনে গেলেই পাওয়া যাবে।

নদীর সবচেয়ে সরু অংশে তৈরি করা হয়েছে ব্রিজটা। ব্রিজের কাছ থেকে সামান্য দূরে নদীর সেই অগভীর জায়গাটা, যেখান দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল মিকোশা। তবে ব্রিজের নিচে নাকি পানির গভীরতা যথেষ্ট বেশি, জানাল সে। বহু পুরানো ব্রিজ। পুরানো হতে হতে কালো হয়ে গেছে তক্তাগুলো। নড়বড়ে হয়ে আছে বহু জায়গায়। মেরামতের প্রয়োজন ছিল আরও অনেক দিন আগেই। অবস্থা দেখে

মনে হয় উঠলেই ভেঙে পড়বে। মিকোশা বলল, ওই ব্রিজ কাউকে ব্যবহার করতে দেখেনি সে। নদী পারাপারের প্রয়োজন হলে নৌকা ব্যবহার করে থাকে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদীরা।

ব্রিজটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। কারণ অন্যপাশ থেকে পালাতে গেলে এই ব্রিজই ভরসা। তাড়াহুড়োয় কোন্‌খানে পা দিলে পা ভাঙবে, কিংবা পানিতে পড়ে আধমরা হবে, জেনে রাখা দরকার। মাঝে মাঝেই ফাঁকা, তক্তা খসে পড়ে গেছে। দুটো খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় পুরো ব্রিজটাই সামান্য কাত হয়ে আছে একপাশে।

সবাই একসঙ্গে ব্রিজে উঠতে ভরসা পেল না। একজন একজন করে পেরোতে শুরু করল। কিশোর দেখল, সামান্য ঝাঁকি লাগলেও দুলে ওঠে ব্রিজটা। পানিতে পড়ে ডুবে মরার ভয় সে করছে না, কিন্তু সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও ভেজা কাপড়ে এই শীতের মধ্যে টেকা কঠিন হয়ে যাবে।

যাই হোক, কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদেই ব্রিজ পেরিয়ে এল সবাই। চাঁদের ঠাণ্ডা আলোয় পথ দেখে তিনশো গজ দূরের কয়লা পাহাড়টাতে এসে পৌঁছাল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে দিয়ে চলে গেছে জেলখানা থেকে আসা পায়েচলা পথটা। আকাশের পটভূমিতে চারকোনা বিশাল একটা আস্ত পাথরের মত লাগছে জেলখানাটাকে।

'এটাই সেই জায়গা,' পাহাড়টা দেখিয়ে মিকোশা বলল।

'চোখ খোলা রাখো,' দুই সহকারীকে নির্দেশ দিল কিশোর। 'আমি একটু ঘুরে দেখি।'

সময় নিয়ে প্রথমে পুরো জায়গাটায় চোখ বোলাল সে। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে চলল যেখানে মূল কাজ হয়, সেখানটাতে। তরাই অঞ্চলটাকে খুঁটিয়ে দেখল সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে। নিঃসঙ্গ পতিত যে জমিটাতে ঝোপ-জঙ্গল হয়ে আছে, সেটাও বাদ দিল না। গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে রয়েছে এক ধরনের বেঁটে বার্চ গাছ। নদীর সমান্তরালে চলে গেছে সারি দিয়ে, মাঝে মাঝে ফাঁক। আঙুল তুলে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'কাজে লাগতে পারে।'

জেলখানা আর কর্মক্ষেত্রের মাঝখানের পাহাড়টায় জন্মে আছে খসখসে, জট পাকানো রোডোডেনড্রন। মাঝে মাঝে মাথা তুলে রেখেছে কেটে ফেলা গাছের গোড়া। মরা ডালপাতা বিছিয়ে আছে। এগুলো মাড়িয়ে আসা কঠিন বলেই জেলখানা থেকে সরাসরি সোজা পথে না এসে পাহাড়ের গোড়া দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয় কয়েদীদের।

'আগুন লাগলে বারুদের মত জ্বলে উঠবে এই জিনিস,' আনমনে মন্তব্য করল কিশোর।

'আগুন লাগানোর কথা ভাবছ নাকি!' বলল বিস্মিত মিকোশা।

'আপাতত লাগাচ্ছি না। তবে সব রকম চিন্তা মাথায় রাখা ভাল। কখন কোনটা কাজে লেগে যাবে বলা তো যায় না। পাহাড়টাতে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়, প্রচুর ধোঁয়া তৈরি হবে।'

কয়লা পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। পাহাড়ের গায়ে প্রায় সিকি মাইল

লম্বা জায়গার মাটি খসিয়ে ফেলা হয়েছে। বেরিয়ে আছে কয়লা। বড় বড় খোঁড়ল তাতে। কেটে কেটে কয়লা নামানো হয়েছে ওসব জায়গা থেকে। গোড়ার মাটি শ্রমিকদের ক্রমাগত পদচারণায় দলিত-মথিত কাদা হয়ে আছে। বড় বড় টুকরো করে স্তূপ দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কয়লা। ঠেলাগাড়ি, গাঁইতি, শাবল, বেলচা, কোদাল ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে। দিনের কাজ শেষে ফেলে রেখে গেছে কয়েদীরা; আগামী দিন এসে তুলে নিয়ে আবার কাজ করবে। খানিক দূরে ফার বন।

'শেষবার ঠিক কোনখানে কাজ করে গেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওইখানে,' হাত তুলে দেখাল মিকোশা। 'বেলচা দিয়ে কয়লা তুলেছি।'

'আর মিলফোর্ড আঙ্কেল?'

'ওই যে ওখানে,' আবার হাত তুলে দেখাল মিকোশা।

'তিনি কি করছিলেন?'

'ওই যে ওখানে যে বিরাট স্তূপটা আছে, সেটা থেকে কয়লা নিয়ে ঠেলাগাড়িতে করে ওই ওদিকে,' উল্টো দিকে কিছুদূরের আরেকটা জায়গা দেখাল মিকোশা, 'নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখছিলেন।'

'আপনি যা করছিলেন, পরের দিন এলেও কি সেই একই কাজ করতে দেয়া হত আপনাকে?'

'হ্যাঁ।'

'এত শিওর হচ্ছেন কি করে?'

'কারণ আমাদের যার যার যন্ত্রপাতি যেখানে কাজ করতাম, সন্ধ্যায় ফেরার সময় সেখানেই রেখে যেতে বলা হত। আমি ইচ্ছে করেই আজ সকালে কাজে লাগার কথা বলে বেলচাটা নিয়ে নিয়েছিলাম।'

'কারণ আপনার উদ্দেশ্য ছিল পালানো,' হাসল কিশোর। 'গার্ডদের পাহারা দেয়ার নিয়ম কি?'

'দু'তিনজন করে করে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে বার বার টহল দেয়। বনের দিকে যাতে কেউ ছুটে পালাতে না পারে সেদিকে কড়া নজর রাখে।'

কয়লার বড় একটা স্তূপের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। অনেক চওড়া, কয়েক ফুট উঁচু লম্বা একটা দেয়ালের মত হয়ে আছে স্তূপটা।

'আপনি যা বললেন,' বলল সে, 'তাতে বুঝলাম, এই স্তূপ থেকে কয়লা নিয়েই ওদিকে সাজিয়ে রাখতে যান মিলফোর্ড আঙ্কেল।'

'হ্যাঁ। গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে গেছেন, খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছেন; বার বার একই কাজ।'

'গুড।' পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল কিশোর। খানিকটা সরে গিয়ে হাত নেড়ে মুসা আর রবিনকে আসার ইঙ্গিত করল। ওরা এলে পাহাড়টা দেখিয়ে বলল, 'এখানে লুকানোর জায়গা আছে।'

'বলো কি!' মুসা অবাক। 'কোথায়?'

'দেখছ না কি সুন্দর একটা খোঁড়ল বানিয়ে রেখেছে, যেন আমাদের লুকানোর জন্যেই। এতে ঢুকে বসব আমি আর রবিন। তোমরা আমাদের সামনে কয়লা রেখে

দেয়াল তুলে দেবে, যাতে বাইরে থেকে আমাদের দেখা না যায়। ছোট ছোট ছিদ্র রাখবে, যাতে বাইরেটা দেখতে পারি আমরা।'

'পাগল নাকি! এত এত গার্ড, এত কয়েদী–কারও না কারও চোখে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে।'

'জেলখানায় ঢুকে বের করে আনার চেষ্টা করার চেয়ে এটা বরং অনেক সহজ কাজ, ঝুঁকিও কম। বলতে পারো, বসে আরাম পাব না মোটেও; কিন্তু মিলফোর্ড আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এরচেয়ে সুবিধেজনক জায়গা আর একটাও নেই। কাজ করার জন্যেই তো আসতে চেয়েছিলে,' হাসল কিশোর, 'কাজ দিয়ে দিলাম। এত কথা বলছ কেন?'

খোঁড়লটায় গিয়ে ঢুকল কিশোর।

তাতে ঢুকে বসল কিশোর।

মিকোশা বলল, 'বাহ্, ভাল জায়গাই তো বেছেছ, দেখতে পাচ্ছি না। সামনে দেয়াল তুলে দিলে একেবারেই দেখা যাবে না। মাথার ওপর কয়লার ছাত। পাহাড়ের ওপর থেকেও তোমাদের দেখতে পাবে না গার্ড।...নাহ্, কিশোর, স্বীকার করতেই হচ্ছে, নজর আছে তোমার।...মিস্টার মিলফোর্ড অবশ্য তোমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন...'

মিকোশাকে থামানোর জন্যে কিশোর বলল, 'রবিন, ঢুকে পড়ো।'

কিশোরের পাশে এসে বসল রবিন।

দুজনের সামনে কয়লার দেয়াল তুলে দিল মুসা আর মিকোশা। বেছে বেছে সমান টুকরো তুলে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল, ট্যাড়া-বাঁকা রাখলে ধসে পড়ার ভয় আছে। খোঁড়লটা ঢেকে দিল এমন করে, যাতে সহজে বোঝা না যায়। এখানে যে একটা খোঁড়ল ছিল, সেটা গার্ডদের খেয়াল না থাকলে কিছু ধরতেই পারবে না ওরা।

সাগরের দিক থেকে বয়ে গেল বরফের মত শীতল এক ঝলক বাতাস। ক্ষুরের মত ধারাল। ওপরের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। চাঁদের মুখ ঢেকে দিচ্ছে পাতলা এক টুকরো মেঘ।

'আকাশের অবস্থা ভাল না,' বলল সে। 'বাতাস আসছে পুব থেকে, সোজা মোহনার মধ্যে ঢুকছে। মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে অবস্থা। যাকগে, সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগের কাজ আগে।'

'আমি থাকব?' জিজ্ঞেস করল মিকোশা।

'না। বেশি লোক বরং ঝামেলা বাড়াবে। আপনাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। চলে যান। ওমর ভাইকে বলবেন, কাল সন্ধ্যার পর দেখা হবে।'

'আচ্ছা।...সাবধানে থেকো তোমরা।'

'থাকব। ধন্যবাদ।'

যেতে মন চাইছে না মুসার। কিন্তু থাকার উপায় নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিকোশার সঙ্গে পা বাড়াল সে।

টুকটাক কথা বলতে লাগল কিশোর আর রবিন। সতর্ক রইল, কেউ এসে যাতে আবার শুনে না ফেলে।

ভোর হয়ে এল। পুব আকাশে ফ্যাকাসে আলো দেখা দিতে বিস্কুটের প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট বের করল কিশোর। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিল। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সময় থাকতে নাস্তাটা সেরে ফেলো। ওরা এসে গেলে আর পারা যাবে না। নড়াচড়া একদম বন্ধ।'

আট

সকালের শীতল আলোয় আসতে দেখা গেল ওদের। পায়ের শব্দ ছাড়াও আরেকটা শব্দ কানে এল কিশোরের, প্রথমে চিনতে পারল না। গুরুত্ব দিল না তেমন।

কিন্তু দলটা কাছে আসতেই সারির সামনের লোকগুলোর হাঁটার ভঙ্গি দেখে বুঝে ফেলল ঘটনাটা কি। কিসের শব্দ তা-ও বুঝল।

শিকল!

'সর্বনাশ!' দম নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন। 'শিকল বেঁধে নিয়ে এসেছে! দিল আমাদের প্ল্যান ভণ্ডুল করে।'

'আর যাতে পালাতে না পারে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'পায়ে শিকল বাঁধা থাকলে দৌড়াতে পারবে না।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। এ রকম কিছু ঘটবে, কল্পনাই করেনি। রবিনের কথা ঠিক। পায়ে আঠারো ইঞ্চি শিকল নিয়ে হাঁটা যায়, কিন্তু দৌড়ানো সম্ভব নয়। পালাবেন কি করে মিস্টার মিলফোর্ড?

ছয় জন প্রহরী আছে বন্দিদের সঙ্গে । দুজন গেল কয়লা পাহাড়ের ওপর দিকে, যেখান থেকে বন্দিদের ওপর ভালমত নজর রাখা যায়। পাহাড়টা কিছুটা বাঁকা বলে খোঁড়লে বসে ওপরে তাকিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে কিশোররা। বাকি চারজন প্রহরী রয়ে গেল নিচে, একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর।

'কি হয়েছে বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। 'গার্ডেরা বেশির ভাগ চলে গেছে মিকোশাকে খুঁজতে। গার্ডের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কয়েদীদের আটকে রাখার জন্যে পায়ে শিকল লাগিয়ে দিয়েছে। শিকল থাকায় কেউ আর পালানোর চেষ্টা করতে পারবে না।'

'এ ভাবে কাজ করবে কি করে ওরা?'

'জানি না। তবে আমার মনে হয় না আজ আর কেউ পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু সেটা তো কথা নয়, কথা হলো তোমার বাবার পায়েও শিকল আছে। সমস্যাটার সমাধানের কোন উপায় এখনও দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'ওই যে, আসছে! খোদা!' আবেগে গলা ধরে এল রবিনের। 'দেখো না অবস্থাটা কি হয়েছে!'

দেখল কিশোর। এত পরিচিত লোকটাকেও অচেনা লাগল। লম্বা লম্বা চুল ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। বহুদিন শেভ নেই। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল হয়ে আছে। কপালে গভীর ভাঁজ। পরনের পোশাকটা শতচ্ছিন্ন। কতদিন ধোয়া হয়নি কে জানে। সামনে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে ঠেলাগাড়ির হাতল ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছেন।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল কিশোর, 'জেলের এই গার্ডগুলো মানুষ না, পিশাচ! মানুষ হলে এ রকম করে কষ্ট দিতে পারে?'

'মানুষরাই মানুষকে কষ্ট দিতে পারে,' পানি চলে এসেছে রবিনের চোখে। 'শুনেছি, সবচেয়ে শয়তান লোকগুলোকে পাঠানো হয় শাখালিনে। সাইবেরিয়ার চেয়ে খারাপ জায়গা এটা। ভাল মানুষ আসতে যাবে কেন?'

'ভেবো না, রবিন,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর, 'আঙ্কেলকে আমরা মুক্ত করবই।'

চিৎকার করে হুকুম দিতে শুরু করল প্রহরীরা। কাজ শুরু হলো কয়েদীদের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। আগের দিন যেখানে কাজ করতে দেয়া হয়েছিল মিস্টার মিলফোর্ডকে, আজও সেখানেই করছেন। কয়লার স্তূপ থেকে কয়লা তুলে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করছেন। নিয়ে গিয়ে জমা করছেন অন্যখানে।

'এখন কিছু বোলো না,' রবিনকে সাবধান করল কিশোর। 'আরও কাছে এলে—আমাদের সামনে দিয়ে যখন যাবেন, তখন।'

'তমি বলবে, না আমি?'

'তুমিই বলো।'

'প্রথমবার যাওয়ার সময়ই?'

'হ্যাঁ। বেশি কথা বলতে যেয়ো না। শুধু জানাও, আমরা এসেছি।...আমি নজর রাখছি গার্ডের দিকে। কিছু সন্দেহ করে কিনা বোঝার চেষ্টা করব।'

সবচেয়ে কাছের প্রহরীটা দাঁড়িয়ে আছে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে কয়েকজন বন্দির কাছে। শাবল, বেলচা আর গাঁইতি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে এত শব্দ করছে সবাই—কিশোর ভাবছে—ভালই হলো, কথা বললে প্রহরীর কানে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। পাহাড়ের ঢালে টহল দিচ্ছে আরেকজন প্রহরী, কয়লার গা থেকে মাটি খসিয়ে নেয়া হয়েছে যেখানে।

এগিয়ে চলল কাজ। ঠেলাগাড়িতে কয়লা বোঝাই করে হাতল ধরে নিয়ে ঠেলে ঠেলে এগোলেন মিস্টার মিলফোর্ড। বেশ শক্তি লাগছে ঠেলতে, কষ্ট হচ্ছে, কারণ নরম মাটিতে বসে যাচ্ছে ঠেলাগাড়ির লোহার চাকা। রবিনদের খোঁড়লটার একেবারে সামনে দিয়ে এগোলেন।

সময় হয়েছে। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'থেমো না, বাবা,' বলে উঠল রবিন। 'আমরা এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। আবার যখন এদিক দিয়ে যাবে, আবার কথা বলব।'

চলে গেলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাওয়ার কোন লক্ষণই দেখাল না তো।'

'নিশ্চয় শুনেছেন। চালাক মানুষ। গার্ডদের সন্দেহ জাগাতে চান না। ফিরে যাওয়ার সময় আবার বোলো, তাহলেই বুঝতে পারবে। গার্ডদের দিকে নজর আছে আমার। কিছু টের পায়নি ওরা।'

'কি বলব?'

'বলো, ওমরভাই আমাদের সঙ্গে এসেছে।'

ফিরে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড। রবিন বলল, 'ওমরভাই প্লেনে করে নিয়ে এসেছে আমাদের। তোমাকে নিতে এসেছি। তবে আজ পারব না।'

প্রহরীদের দিক থেকে পলকের জন্যে চোখ ফেরাল কিশোর, দেখল সামান্য মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মিলফোর্ড। রবিনের কথা শুনতে পেয়েছেন।

'এবার ফিরলে জিজ্ঞেস করবে,' কিশোর বলল, 'ওরা কি সব সময়ের জন্যে শিকল পরানোর ব্যবস্থা করেছে, নাকি খুলে দেবে। আর শিকলটা লোহার, না ইস্পাতের।'

প্রশ্নটা করা হলো। জানা গেল, লোহার শিকল। কবে খুলে দেয়া হবে, আদৌ হবে কিনা, জানেন না তিনি।

'এরপর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বলো, কাল পরিস্থিতি ঠিক থাকলে তাঁকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করব আমরা। ঠিক ক'টার সময়, বলা যাচ্ছে না। তবে কাল যেন তৈরি থাকেন। মিকোশা আমাদের সঙ্গে আছে, এ কথাটাও তাঁকে জানিয়ে দাও।'

জানানো হলো। এই প্রথম কথা বললেন তিনি, 'বাড়ি চলে যাও। আমার পায়ে শিকল। এ অবস্থায় পালাতে পারব না।'

'সেটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন,' জবাব দিল কিশোর।

বিচিত্র উপায়ে এই আলোচনা চলতে থাকল অনেকক্ষণ ধরে। টহল দিতে দিতে কোন একজন গার্ড যখন কাছে চলে আসে, তখন কথা বন্ধ থাকে। একবার একজন গার্ড কাজ কেমন চলছে দেখার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে খোঁড়লটার সামনে পেছন দিয়ে দাঁড়াল সে। এত কাছে, হাত বাড়ালে ছুঁতে পারে কিশোর। সবচেয়ে উদ্বেগের মুহূর্তটা এল, যখন সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা খোঁড়লের কাছে আবর্জনার ওপর ছুঁড়ে ফেলল প্রহরী। আগুন বেড়ে যাওয়ার আগেই পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলল। কিন্তু খোঁড়লে ধোঁয়া যা ঢুকে যাওয়ার ঢুকে গেছে। অনেক কষ্টে কাশি ঠেকাল কিশোর আর রবিন। এই সময় একটা বাঁশি বাজল। সরে চলে গেল লোকটা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুই গোয়েন্দা।

বাঁশি বাজানোর মানে কয়েদীদের দুপুরের খাবার সময় হয়েছে। কালো রুটির একটা করে টুকরো আর এক ফালি শুকনো মাছ, ব্যস, এই হলো খাবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হলো। তারপর কাজে ফিরে গেল আবার যার যার জায়গায়।

আধঘণ্টার জন্যে বিরতি দেয়া হয়েছিল। এই সময়টাতে বসে কপাল কুঁচকে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ভাবনায় নিমগ্ন থেকেছে কিশোর। রবিনকে বলল, 'শিকলগুলোই সমস্যাটা তৈরি করল। শিকলের কথা ভাবিইনি। কোনভাবে তোমার বাবার পা থেকে ওগুলো খুলতে হবে আগে।'

'কি করে খুলবে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা লোহাকাটা করাত ছুঁড়ে দিতে পারি। কিন্তু কাটতে গেলে গার্ডের চোখে পড়ে যাবে।'

'খোলা জায়গায় বসে কাটতে থাকলে তো পড়বেই।'

'তাহলে কোথায় বসে কাটবে?'

'এখানে।'

অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বলছ? এই খোঁড়লের

মধ্যে আমাদের সঙ্গে বসে?'
'আমাদের নয়, তোমার সঙ্গে বসে।'
'সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে।'
'পড়বে না, যদি কেউ তাঁর জায়গায় কাজ করে।'
'কে?'
'আমি।'
'তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি! তুমি যে কয়েদী নও ওরা বুঝবে না?'
'না বুঝবে না, যদি কয়েদীর পোশাক পরনে থাকে।'
'বাবার সঙ্গে পোশাক বদলানোর সময়ই পাবে না তুমি।'
'তাঁর সঙ্গে তো বদলাতে যাচ্ছি না আমি। মিকোশার পরনে কয়েদীর পোশাক আছে। সেটা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশিই হবে সে। আমি আঙ্কেলের জায়গায় কাজ করতে থাকব, এই সুযোগে তোমরা দুজনে বসে শিকলটা কেটে ফেলবে। লোহার শিকল। কাটতে সময় লাগবে না।'
কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'আমি জানতাম বুদ্ধি একটা তুমি ঠিকই বের করে ফেলবে। কোন সমস্যাই তোমার কাছে সমস্যা হবে না।'
'বুদ্ধিটা এখন কাজে লাগলেই হয়।...একটা কথা ভাবছি। তবে সেটা অনেকখানিই নির্ভর করবে আবহাওয়া ভাল থাকার ওপর।'
'কি কথা?'
'পরে বলব। ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে।...ওই যে, আঙ্কেল আবার আসছেন। তাঁকে বলো, কাল আবার আসব আমরা।'
কথাটা জানিয়ে দিল রবিন। বাবাকে অনেক কথাই বলার আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারল না। অত সুযোগ নেই।
খোঁড়লে বরফের মত শীতল হাওয়া ঢুকছে ফোকর দিয়ে। জবুথবু হয়ে বসে সময় গুনতে থাকল দুজন–কখন সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকার হবে, প্রহরীরা চলে যাবে।
অবশেষে বহু যুগ পরে যেন ছায়া নামল গোধূলির। বন্দিদেরকে জড়ো করা হলো এক জায়গায়। গোণা হলো গরু-ছাগলের মত। তারপর মার্চ করিয়ে নিয়ে রওনা হলো জেলখানায়।
এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে কিশোর আর রবিনের। উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হলো। কয়লা সরিয়ে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এসে নানা রকম কসরত করে দূর করতে হলো আড়ষ্টতা। সুন্দর করে আবার কয়লাগুলো খোঁড়লের ওপর সাজিয়ে রাখল, যাতে বোঝা না যায় ওখানে কেউ ছিল। মুখ বন্ধ করার আগে ভালমত দেখে নিল, ওরা যে এখানে ছিল সেটা বোঝার মত কোন জিনিস ফেলে যাচ্ছে কিনা।
'আকাশের অবস্থাটা ভাল ঠেকছে না আমার,' সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর।
'কেন?'
'পরিবর্তনটা টের পাচ্ছ না? সাগরের দিক থেকে আসা মেঘের রঙ দেখেছ?'
'বৃষ্টি নামলে তো ভালই হয়। ঠাণ্ডা কমবে।'

'হঠাৎ গরম পড়লে তুষার পড়তে শুরু করবে। ওই মেঘগুলো ভারী হয়ে গেছে। তুষার পড়া শুরু হলে ষোলোকলা পূর্ণ হবে আমাদের।'

'কেন?'

'মাথাটা খাটাও, রবিন। তুষারের মধ্যে হাঁটতে গেলে চিহ্ন ফেলে ফেলে যেতে হবে। প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে চলাফেরা করব কি করে তখন?'

'তাই তো, এ কথা তো ভাবিনি!'

'তুষার পড়লে আঙ্কেলকে মুক্ত করার কাজেও বাধা আসবে। থাক, এখানে দাঁড়িয়ে এ সব আলোচনা করার দরকার নেই এখন। কে আবার কোনদিক দিয়ে চলে আসে।'

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে হেঁটে চলল ওরা। নদীর ওপরের ব্রিজটার কাছে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। বার্চের জটলার ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল কিশোর। রবিনের হাত চেপে ধরল। কানে কানে কথা বলে শব্দ করতে নিষেধ করল। হাত তুলে দেখাল ব্রিজের দিকে।

কারও কথা শোনা গেল না। তবে আগুন দেখতে পেল রবিন। ব্রিজের ওপারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে কেউ। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটাও চোখে পড়ল।

'সারা রাতের জন্যেই যদি ব্রিজ পাহারা দেয়, তাহলে ভাল বিপদে পড়েছি বলতে হবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'এ রকম রাতে নদী সাঁতরে পেরোতে গেলে ঠাণ্ডায় জমে মরব। মিকোশা যেখান দিয়ে দৌড়ে পেরিয়েছে, সেখান দিয়ে যেতেও রাজি নই। মোট কথা পানিতে নামতেই রাজি না এখন। বসে বসে কি ঘটে দেখা ছাড়া উপায় নেই।'

একটু পরে বলল, 'লোক ওখানে দুজন। কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বসে থাকা আরও কষ্টকর করে তুলল ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস।

ঘণ্টাখানেক পর কথা বলতে বলতে আরও দুজন লোক এসে হাজির হলো। ব্রিজের কাছের দুজনকে নিয়ে চলে গেল জেলখানার দিকে। অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল ওদের কথার শব্দ।

কথা থেমে যাওয়ার পরেও আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর বলল, 'চলো, এ-ই সুযোগ। চট করে পেরিয়ে যাই। বলা যায় না, পাহারা দেয়ার জন্যে নতুন লোক পাঠাতে পারে। বনের মধ্যে টহল দিয়ে এসেছে এরা। রাতেও এখন নিরাপদ না এ জায়গা। যে কোন সময় নাইট-গার্ডের সামনে পড়ে যেতে পারি।'

নয়

ডিঙিতে করে কিশোর আর রবিনকে এগিয়ে নিতে এল মুসা। 'এত দেরি করে এলে। আমরা তো ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেবিনে চলো। সব বলছি,' কিশোর বলল। 'ভাল কথা, আবহাওয়ার খবর কি? রেডিও শুনেছ নাকি?'
'শুরুতেই আবহাওয়ার খবর কেন?'
'কারণ আছে। আবহাওয়ার ওপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। রেডিও শুনেছ?'
'ওমর ভাই শুনেছে। সারাক্ষণ রেডিও নিয়েই পড়ে থেকেছে। অবস্থা নাকি ভাল না।'
চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। কেবিনে পা রেখে প্রথমে তাই জিজ্ঞেস করল, 'আবহাওয়া নাকি খুব খারাপ হতে যাচ্ছে?'
'কি করে জানলে?' ভুরু নাচাল ওমর।
'মুসার কাছে শুনলাম।'
'হ্যাঁ। আর কোন কাজ না পেয়ে বসে বসে রেডিওই শুনেছি,' জবাব দিল ওমর। 'জাপান রেডিওর খবরে বলল, উত্তর-পুব থেকে ধেয়ে আসছে ঝোড়ো হাওয়া, পুরো এলাকায় তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা–আমাদের এই এলাকাটা সহ।'
'বড়ই দুঃসংবাদ,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। গা থেকে জ্যাকেট খুলে রেখে চেয়ারে বসল। কফি আর স্যান্ডউইচ এনে দিল মুসা।
'উত্তর-পুব,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তুষারপাত না হলেও সাগর এত উত্তাল হয়ে উঠবে, বেরোনোই কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্যে। যাকগে, যা হবার হবে। সব তো আর আমাদের ইচ্ছে মত ঘটবে না, অত ভেবে লাভ নেই।' মিকোশার দিকে তাকাল সে, 'আমাদের দিয়ে এসে কাল রাতে ঠিকমত ফিরেছিলেন তো আপনারা? কোন সমস্যা হয়নি?'
'না। দুজন গার্ডকে আসতে দেখলাম। চট করে লুকিয়ে পড়লাম গাছের আড়ালে। আমাদের সামনে দিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল ওরা।'
ওমরের দিকে তাকাল কিশোর, 'এদিকে কিছু ঘটেছিল, ওমরভাই?'
'না। আমিও দুজন গার্ডকে দেখেছি। ভাটির দিকে চলে গেল কথা বলতে বলতে। তবে বেশি দূর যায়নি। বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।'
'মারকভকে দেখেছেন?'
'না।'
'নদীতে নৌকাটৌকা কিছু?'
'দুটো মাছধরা নৌকা বেরিয়েছিল, কিন্তু বাতাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেছে,' ওমর বলল। 'তা তোমাদের কেমন কাটল? কথা হয়েছে মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে? জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'
'আমরা সফল,' জবাব দিল কিশোর। 'যে ভাবে যা আশা করেছিলাম, ঠিক সেইমতই ঘটেছে।' কয়লা পাহাড়ে কি কি ঘটেছে খুলে বলল সে। 'সব জেনে এসেছি। এখন আবহাওয়া বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে।'
'বেশ,' মুসা বলল, 'কি করে সারবে বলে ফেলো।'

'কাল সকালেই আঙ্কেলকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। কাজেই মন দিয়ে শোনো।' ওমর আর মিকোশার দিকে তাকাল, 'আপনারাও শুনুন। সব কিছু নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। সেটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমার পরিকল্পনায় টাইমিং একটা মস্ত ব্যাপার। এর নিয়ন্ত্রণ অবশ্য আমাদের হাতে রয়েছে। যদি কিছু গড়বড় হয়, আমাদের দোষেই হবে।'

'লেকচার থামিয়ে দয়া করে আসল কথাটা বলে ফেলো না ছাই,' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা।

'হ্যাঁ, শোনো, কাল ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই আবার গিয়ে কয়লার স্তূপে খোঁড়লের মধ্যে বসব। আজকের মতই রবিন থাকবে আমার সঙ্গে। আঙ্কেলকে যদি অন্য কোনখানে কাজ করতে পাঠায় তাহলে বিরাট সমস্যায় পড়ে যাব। তবে আমার মনে হয় না অন্য কোথাও পাঠাবে। যেখানে দিয়েছে ওখানকার কাজ শেষ হয়নি। যাই হোক, সরিয়ে দিলে নতুন চিন্তা করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। তাড়াহুড়ো করে ঝুঁকি নেয়া চলবে না। একবার যদি ওরা বুঝে ফেলে, তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে, হয়তো এমন জায়গায় সরিয়ে ফেলবে, কাছেও ঘেঁষতে পারব না আর; হয়তো অন্য কোন জেলেই পাঠিয়ে দেবে। যদি ওরকম কিছু না ঘটে, তাহলে দৌড় দিতে বলার আগে তাঁর শিকলটা খোলার ব্যবস্থা করব আমরা।'

'গার্ডদের সামনে কি করে খুলবে?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মিকোশা। কিশোরের কথাবার্তার ধরন অবাক করছে তাকে। বড়দের মত ভাবভঙ্গি, বয়েসের সঙ্গে বেমানান, খাপছাড়া; তবে মনে মনে স্বীকার তাকে করতেই হলো, বুদ্ধি আছে ছেলেটার মাথায়।

'না খুললে দৌড়াতে পারবেন না তিনি।'

'এই অসম্ভবটা কি করে সম্ভব করবে শুনি?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না। তবে যদি চুপ করে শোনেন, বুঝতে পারবেন কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, বলে যাও, শুনি।'

'সঙ্গে করে একটা লোহাকাটা করাত নিয়ে যাব আমি। আমার টুলকিটে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, গোয়েন্দাগিরি করি তো, তা ছাড়া একটা বিশেষ কাজে এসেছি, তৈরি হয়েই এসেছি। জেলখানার শিক কাটতে হতে পারে ভেবে লোহাকাটা করাতও এনেছি। ওটা দিয়ে সিকি ইঞ্চি মোটা লোহার শিকল কাটতে মোটেও বেগ পেতে হবে না।'

'কিন্তু গার্ডদের চোখে পড়ার সমস্যার কি করবে?'

'কাজটা ঘটতে দেখবে না ওরা।'

'ওরা অন্ধ নয়। কি করে ভাবলে বসে বসে করাত দিয়ে শিকল কাটবেন মিস্টার মিলফোর্ড, আর গার্ডরা দেখতে পাবে না?'

'কারণ তিনি খোঁড়লের মধ্যে রবিনের সঙ্গে বসে শিকলটা কাটবেন।'

'তিনি যে উধাও হয়ে গেছেন, সেটা ঠিকই লক্ষ করবে গার্ডেরা।'

'না, করবে না। কারণ, জেলখানার কুৎসিত পোশাক পরে তখন তাঁর জায়গা

দখল করব আমি। পোশাকটা পরে থাকতে নিশ্চয় ভাল লাগছে না আপনার। আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি এটা পরে খোঁড়লে বসে থাকব। খোঁড়লের মুখের সামনে একটু দূরে কয়লার স্তূপ আছে। ওটার জন্যে দূর থেকে মুখটা প্রহরীর চোখে পড়ে না। চট করে সামনের কয়লাগুলো সরিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমি। আঙ্কেল ঢুকে পড়বেন। মুখটা তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ করে দেবে রবিন। ভেতরে বসে শিকল কাটবেন আঙ্কেল।' মিকোশার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'প্রহরী কি আর দেখতে পাবে তখন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কথা বলল না মিকোশা। তারপর মাথা ঝাঁকাল ধীরে ধীরে, 'নাহ্, স্বীকার করতেই হচ্ছে তোমার প্ল্যানটা সত্যি চমৎকার।'

গুঞ্জন উঠল সবার মধ্যে।

'আঙ্কেল যখন শিকল কাটতে থাকবেন,' কিশোর বলল, 'আমি তখন তাঁর কাজ চালিয়ে যাব। শিকল কাটতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না তাঁর।' সবার মুখের ওপর চোখ বোলাল একবার সে। 'এবার আসা যাক টাইমিং, অর্থাৎ সময়ের ব্যাপারে। আমি ঠিক ন'টায় বেরিয়ে যাব খোঁড়ল থেকে। আঙ্কেলের কাটতে লাগবে দশ মিনিট। কাজ শেষ হয়ে যাবে ন'টা দশে। পাঁচ মিনিট হাতে রাখলাম। তাতে হয় ন'টা পনেরো। এই সময় কাজ শুরু করবে ওমর ভাই আর মুসা। তাদেরটা ফেল করলে সব বরবাদ।' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'দেখি, আমাকে একটা পেন্সিল আর একটা কাগজ দাও তো।'

বের করে দিল রবিন।

এঁকে দেখাল কিশোর, 'এই যে, এটা হলো কয়লা পাহাড়। এটা আমাদের খোঁড়ল। আর এখান থেকে কয়লা তুলে ঠেলায় ভরেন আঙ্কেল। এখান থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে এই যে এখানটায় বনের সীমানা। বেশির ভাগ ফার গাছ। এটা হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। যদি কোনমতে ঢুকে পড়তে পারি, লুকিয়ে পড়ার প্রচুর জায়গা পাব। যাকগে, সেটা পরের কথা। এই যে এখানটায় আরেকটা পাহাড়, কয়লা পাহাড় আর জেলখানার মাঝখানে। অত বেশি উঁচু না, আবার কমও না—পাহাড়টার জন্যে জেলখানা থেকে কয়েদীদের কাজ দেখা যায় না। খাটো খাটো রডোডেনড্রন ঝোপ, ছেঁটে ফেলা শুকনো ডালপাতায় ভর্তি পাহাড়ের ওপরটা। আগুন দিলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। বাতাস পেলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।'

'আর তাতে ধোঁয়াও হবে প্রচুর,' ওমর বলল।

'ঠিক। স্মোক স্ক্রীন তৈরির কথা বলছি আমি, ধোঁয়ার পর্দা। আপনি আর মুসা গিয়ে পাহাড়ের ওপরে কোন ফাটল-টাটলে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবেন, আমি আর রবিন যখন খোঁড়লে থাকব। আগুনটা সহজে ধরানো এবং ছড়ানোর জন্যে পেট্রল ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। প্লেনের ট্যাংক থেকে বের করে বোতলে করে নিয়ে যেতে পারেন। ঠিক ন'টা পনেরো মিনিটে আগুন লাগাবেন। আগুন আর ধোঁয়ার দিকে নজর সরে যাবে প্রহরীদের, কয়েদীদের দিকে মনোযোগ থাকবে না। এই গণ্ডগোলের মধ্যে ধোঁয়ার চাদরের আড়াল নিয়ে বনের দিকে দৌড় দেব আমরা—প্রহরীরা আমাদের দেখুক বা না দেখুক।'

'কিন্তু কিশোর, একটা কথা ভেবে দেখা উচিত,' রবিন বলল, 'আগুনের ফাঁদে

পড়ে যেতে পারে শিকল পরা কয়েদীরা। শিকল পরে কেউই ঠিকমত দৌড়াতে পারবে না। আগুন ওদের ধরে ফেলবে। একজনকে বাঁচানোর জন্যে–হোক না সেটা আমার বাবা, এতগুলো মানুষকে মারাত্মক বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারি না আমরা।'

'সেদিকটাও ভেবেছি আমি। আগুন ওদের কাছে পৌঁছবে না, কাজেই কোন ঝুঁকিও নেই।'

'বেশ,' ওমর বলল, 'দাবানল তো লাগালাম। তারপর?'

'ব্রিজের দিকে ছুটবেন। ব্রিজ পেরিয়ে এই ল্যাগুনটার পাড়ে চলে আসবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ধোঁয়ার জন্যে আপনাদের দেখতে পাবে না গার্ডরা। গুলি করতে পারবে না। জেলখানা থেকে দেখা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা অবশ্য আছে। কিন্তু আপনারা যেখানে থাকছেন সেখান থেকে জেলখানাটা অনেক দূরে। অতদূর থেকে গুলি করে লাগাতে পারবে না। কেউ যদি তাড়া করে আসে, তার আগেই ব্রিজের কাছে পৌঁছে যাবেন আপনারা। ব্রিজ পেরিয়ে বনে। ভাল আড়াল পেয়ে যাবেন। আপনাদের ধরা আর তখন অত সহজ হবে না। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এদিকে যে আসছেন, এটা যেন কোনমতেই বুঝতে না পারে ওরা।'

'যদি সামনে থেকে কিংবা পাশ থেকে এসে পথরোধ করে?'

'সেটা সামলানোর ভার আপনাদের। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পিস্তল তো সঙ্গে থাকছেই। প্রয়োজনে গুলি করে হলেও বাধা দূর করে নেবেন।'

'তা বটে,' বিড়বিড় করল মুসা। 'জান বাঁচানো ফরজ।'

'মিকোশা,' কিশোর বলল, 'প্লেনের দায়িত্ব থাকবে আপনার ওপর। প্লেনের ভেতর থাকতে পারেন, কিনারে খালের পাড়ে থাকতে পারেন, আপনার ইচ্ছে। রেডি থাকবেন, যাতে আমরা এলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নিয়ে উড়াল দিতে পারেন। সব প্ল্যান মাফিক হয়ে যাওয়ার পরও দ্বীপ থেকে পালাতে না পারলে কোন লাভ হবে না। ভয় আরও আছে। কয়েদী পালিয়েছে যেই বুঝতে পারবে ওরা, রেডিও আর টেলিফোনে যোগাযোগের হিড়িক পড়ে যাবে। কাছাকাছি ওদের কোন বিমান-বন্দর থেকে প্লেন উড়ে আসতে পারে আমাদের বাধা দেয়ার জন্যে।'

'তোমার প্ল্যানে ছোট্ট একটা খুঁত আছে,' মিকোশা বলল।

তার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি?'

'চেহারা দাড়িগোঁফে ভরা মিস্টার মিলফোর্ডের মুখ, লম্বা লম্বা চুল। তোমার কই? বহুদূর থেকে চিনে ফেলবে গার্ড যে তুমি অন্য লোক।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'আপনি ভেবেছেন এতবড় একটা খুঁতের কথা মাথায় ছিল না আমার? সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। ছদ্মবেশের সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে আমার টুলকিটে। আপনার অবগতির জন্যে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি, ছোটবেলা থেকেই ছদ্মবেশ নেয়া আমার কাছে বেশ মজার একটা খেলা। বহু প্র্যাকটিস করেছি। কাজেই গার্ডদের ফাঁকি দেয়াটা মোটেও কঠিন হবে না আমার জন্যে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মিকোশা। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। 'নাহ্, কোনভাবেই ভুল বের করতে পারলাম না তোমার। তারমানে তোমার

প্ল্যান সফল হতে বাধ্য।'

'কেন, এখনও সন্দেহ আছে নাকি আপনার?' কিশোরও হাসল। 'আর কোন খুঁত মাথায় এসে থাকলে বলুন। ভুল আছে কিনা জানার জন্যেই তো সবার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করছি। সামান্য একটা ভুলেও সবাই মারা পড়তে পারি আমরা।'

মাথা নাড়ল মিকোশা, 'না, আমি তো কোন ভুল দেখতে পাচ্ছি না।'

'বেশ, তাহলে আলোচনা এখানেই শেষ।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'সময় আছে। ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেয়া যায়। অবশ্য এত উত্তেজনার মাঝে যদি ঘুম কারও আসে।...তো, মিস্টার মিকোশা, আমার কাপড়ের সঙ্গে আপনার জেলখানার পোশাক বদল করতে কোন আপত্তি নেই তো?' হাসল সে। 'ওগুলোর ওপর বেশি মায়া থাকলে পরে ফেরত দিয়ে দেব নাহয়।'

'ইয়ার্কি মারছ!' হাসল মিকোশা। 'ফেরত তো দেয়া লাগবেই না, এই গন্ধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কোন দিন যদি সুযোগ আসে বরং পুরস্কার দেব তোমাকে।'

'তাহলে খুলুন। আমার কাপড়গুলো গায়ে লাগবে তো আপনার?'

'লাগবে। জেলখানার পোশাক নিয়ে তোমার কোন ভাবনা নেই। এগুলোর কোন মাপ থাকে না। কারও টাইট হয়, কারও ঢিলা—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নেই কয়েদীদের।'

ওমর বলল, 'তোমরা বদলাবদলি করতে থাকো, আমি চট করে গিয়ে আকাশের অবস্থাটা দেখে আসি।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল সে। জানাল, 'শুকনো। বাতাসের মোড় ঘুরেছে সামান্য, সোজা মোহনার দিকে বইছে এখন। সাগর উত্তাল। তবে এখনও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বাতাসের গতি এখন যেদিকে আছে, সেদিকে থাকলে আগুন ছড়াতে সুবিধে হবে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'ক'টায় রওনা হতে চাও?'

'ভোর চারটায়। আগেভাগেই গিয়ে গুছিয়ে বসতে চাই। দেরিতে গিয়ে তাড়াহুড়া শুরু করলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

দশ

ঠিক চারটায়, যখন রওনা হলো ওরা, অন্ধকার তখনও জমাট বেঁধে আছে। পকেট ভর্তি সরঞ্জাম নিয়েছে, ভারী হয়ে আছে পকেট। ডিঙিতে করে ওদের নামিয়ে দিল মিকোশা।

ওদের পরিকল্পনায় ছোট্ট একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ওমর আর মুসা আগুন লাগানোর পর দৌড়ে এসে ব্রিজ পার হয়ে সোজা প্লেনের কাছে যাবে না। ব্রিজের অন্যপারে লুকিয়ে বসে কিশোরদের আসার অপেক্ষায় থাকবে। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আসবে ল্যাগুনের পারে। দুটো সুবিধে হবে এতে। পথে কোন বাধা এলে প্রতিরোধ করার শক্তি বেশি পাবে, আর দ্বিতীয়ত এক দলের জন্যে আরেক দলকে

অহেতুক দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হবে না।

গত কয়েক ঘণ্টায় আবহাওয়ার আর পরিবর্তন ঘটেনি। বাতাস এখনও শুকনো। আসি আসি করতে থাকা তুষার এখনও এসে হাজির হয়নি, যদিও আকাশ ভারী মেঘে ঢাকা; চাঁদ-তারার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাঝারি গতিতে বয়ে চলেছে হাড় কাঁপানো ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস। পানিতে ঢেউয়ের নাচন। তবে পানি ফুলে-ফেঁপে খালে ঢুকে প্লেনটার ক্ষতি করার মত অবস্থা এখনও হয়নি।

খুব সাবধানে, নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দলটা। তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না। পারার কথাও নয়। অন্ধকার বনের মধ্যে শব্দ না করে সাবধানে চলতে গেলে গতি কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ভাবনা নেই। আগেভাগে বেরিয়ে পড়েছে। ভোর হওয়ার আগেই তৈরি হয়ে বসে যেতে পারবে যার যার জায়গায়।

নিরাপদেই ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পিস্তল হাতে ব্রিজের আশেপাশে একবার চক্কর দিয়ে এল ওমর। কোথাও কোন বিপদ ওত পেতে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিল।

কিছু ঘটল না।

ব্রিজের গোড়ায় পৌঁছে পুরো একটা মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে রইল সে। আলো ফুটেছে কিছুটা। কয়েক গজ দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে এখন। কিছুই চোখে পড়ল না ওর, কিছু শুনলও না। মৃদু শিস দিল সে। ঝুঁকি নিল। কাছাকাছি কেউ থেকে থাকলে তার শিসের সাড়া দেবে। কিন্তু জবাব এল না।

সবার আগে ব্রিজ পেরোল সে। এক এক করে তাকে অনুসরণ করল সবাই। অন্য পাশে ব্রিজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

'যাক, ভালোয় ভালোয় চলে এলাম। কোন অঘটন যে ঘটেনি,' ওমর বলল, 'খুশি লাগছে আমার। ব্রিজ পেরোনোর সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কেউ পাহারা থাকলে ওখানেই থাকার কথা ছিল।'

'হ্যাঁ।' হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'ওই যে আপনাদের পাহাড়–আপনার আর মুসার। গিয়ে পজিশন নিন। মুসা, মাথা নামিয়ে রাখবে। কোন শব্দ করবে না। কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করবে না। তুমি শত্রুদের দেখার চেষ্টা করলে শত্রুরাও তোমাকে দেখে ফেলবে। এ ধরনের কাজে বেশি কৌতূহল গণ্ডগোল বাধায়।' মুসার পকেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল সে। 'পকেটে কি? উঁচু হয়ে আছে?'

'এই দু'চারটা টুকিটাকি জিনিস। মনে হলো যদি কাজে লেগে যায়।'

সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'দেখো, বোকামি করে বোসো না।'

'করব না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। বোকামি করলে যে মরতে হবে সে-ভয় কি নেই আমার ভেবেছ।'

'ঠিক আছে, ওমর ভাই,' কিশোর বলল, 'যান আপনারা।'

ঘুরে দাঁড়াল ওমর আর মুসা। লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এসো, রবিন,' কিশোর বলল, 'আমরাও যাই। সময়মতই এসেছি। এই ভয়ানক আবহাওয়ায় এত সকালে আমার মনে হয় না কেউ আছে।'

কিন্তু নেই বলে সাবধানতার যে কমতি হলো, তা নয়। ধূসর হয়ে আসছে

আকাশের রঙ। আরেকটা দিনের আগমন। যত তাড়াতাড়ি পারল খোঁড়লে ঢুকে বন্ধ করে দিল মুখটা।

ধীরে ধীরে আরও পরিষ্কার হলো আকাশ। সীসার মত রঙ এখন। পায়ে শিকল পরানো কয়েদী আর তাদের সশস্ত্র প্রহরীদের আসার ঝমঝম শব্দ পাওয়া গেল। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল। কয়লা পাহাড়ে যার যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

পরম স্বস্তির সঙ্গে কিশোর দেখল, আগের দিনের জায়গাতেই কাজ করতে এসেছেন মিস্টার মিলফোর্ড। তবে একটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ তাঁর সঙ্গে কাজ করতে এসেছে আরেকজন। তারমানে আজকের মধ্যেই যত কয়লা আছে এখানে, সব সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে–সেজন্যেই দুজন দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটার কাজ হলো, ঠেলাগাড়ি ভরতে সাহায্য করা, আর মিস্টার মিলফোর্ডের কাজ সেগুলো জায়গামত রেখে আসা।

দ্বিতীয় লোকটা ভাবনায় ফেলে দিল কিশোরকে। এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা কঠিন হয়ে যাবে। বেঈমানী করবে বলে মনে হয় না, তবে তার চমকে যাওয়ার ভঙ্গি প্রহরীদের নজরে পড়ে যেতে পারে। আসলে যে কি ঘটবে আগে থেকে বলা যায় না। অঘটন ঘটলেও তার কিছু করার নেই আর এখন। আপাতত প্রহরীদের দিকে নজর দিল সে।

প্রহরীর সংখ্যা আগের দিনের মতই আছে। আগের দিন যে যেখানে পাহারায় ছিল, আজও সেখানেই পাহারা দিচ্ছে।

দিনের কাজ শুরু হলো। ঘড়ি দেখল কিশোর। আটটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। ঠেলাগাড়ির প্রথম কিস্তিটা বোঝাই করে এগিয়ে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কিশোরের মনে হলো আগের দিনের চেয়ে মিস্টার মিলফোর্ড আজ যেন একটু বেশি সতর্ক।

খোঁড়লের সামনে দিয়ে তিনি যাবার সময় নিচু স্বরে রবিন বলল, 'আমরা এসে গেছি, বাবা। সব ঠিকঠাক মত চলছে। এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পালাব আমরা। কিশোর আমার সঙ্গে আছে। কয়লাগুলো রেখে এসো, আরও কথা আছে।'

মাল নামাতে দশ মিনিট লাগল মিস্টার মিলফোর্ডের। ফিরে আসতে আরও পাঁচ। খালি ঠেলা, যাচ্ছেন নিচের দিকে; আসার চেয়ে যেতে তাই সময় লাগল কম। কাজেই কথা বলার সময়ও পাওয়া গেল কম। কিশোর বলল, 'যদি কোন গণ্ডগোল বাধে, কিংবা কোন কারণে কাজ বন্ধ করে দিতে চায় প্রহরীরা, সোজা এখানে চলে আসবেন। আমাদের কাছে পিস্তল আছে।'

জবাব দিলেন না মিস্টার মিলফোর্ড।

পরের বার আবার গাড়িভর্তি কয়লা নিয়ে যখন খোঁড়লের কাছ দিয়ে যাচ্ছেন, কিশোর বলল, 'আমি আপনাকে সঙ্কেত দেয়ামাত্র এখানে চলে আসবেন। আমি বেরিয়ে যাব, আপনি ঢুকে পড়বেন। রবিনের কাছে করাত আছে, শিকল কেটে দেবে।'

এবারও জবাব দিলেন না মিস্টার মিলফোর্ড।

কিশোর বলল, 'চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পেছনের পাহাড়টায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। ধোঁয়া দেখা গেলে গার্ডেরা যে আদেশই দিক না কেন, সব কিছু উপেক্ষা করে

আপনি সোজা চলে আসবেন এখানে।'

কথা বললেন না মিস্টার মিলফোর্ড। চলে গেলেন গাড়ি ঠেলে নিয়ে। সন্দেহ হলো কিশোরের। জবাব দিচ্ছেন না কেন? শুনতে পাচ্ছেন না নাকি? না দ্বিতীয় লোকটার জন্যে এ রকম না শোনার ভান করে রয়েছেন?

পরের বার যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস না করে পারল না কিশোর, 'আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না?'

খুব সামান্য মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মিলফোর্ড।

আর কোন কথা হলো না। এবার শুধু অপেক্ষার পালা।

মিনিট গুনতে আরম্ভ করল কিশোর। আরও বিশ মিনিট বাকি। তীব্র উত্তেজনায় রবিনের ঠোঁট কাঁপছে।

কিশোর বলল, 'শান্ত থাকো।'

কিন্তু সে নিজেই শান্ত থাকতে পারছে না। উত্তেজনাটা তার মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। অঘটন ঘটে যাওয়ার প্রচুর সময় আছে এখনও।

ন'টা বাজতে দশ মিনিটের সময় হালকা তুষারের একটা কণা বাতাসে ভেসে আসতে দেখল সে। মাত্র একটা কণা। কিন্তু তার চোয়ালটাকে কঠিন করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। সে জানে, এরপর আরও আসবে। এক্ষণে আর যাই হোক, তুষারপাত চায় না সে। তুষার পড়ে ভিজে গেলে কোন কিছুতেই আর আগুন ধরবে না ঠিকমত। তা ছাড়া তুষারপাতের সুযোগে পালানোর চেষ্টা করতে পারে কয়েদীরা–এই ভয়ে তাদের ডেকে নিয়ে যাবে প্রহরীরা।

তুষার পড়া বাড়তে শুরু করল। ঘূর্ণিবাতাসে পাক খেতে শুরু করেছে কণাগুলো। দৃষ্টিশক্তিতে বাধা সৃষ্টির মত ঘন হয়নি এখনও। তবে এটা নিশ্চিত, ঝড় আসছে। অদ্ভুত রঙ হয়েছে আকাশের। রঙটা যে ঠিক কি, বলতে পারবে না কিশোর।

ন'টা বাজতে পাঁচ। আর দেরি না করে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। এ ভাবে প্ল্যান পরিবর্তন করলে মুসা আর ওমরের জন্যে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। কিন্তু অপেক্ষা করলে বিফল হয়ে ফেরত যাওয়া লাগতে পারে। তুষারঝড়ের মধ্যে নিশ্চয় কয়েদীদের খোলা জায়গায় কাজ করতে দিতে চাইবে না প্রহরীরা। কারণ তাদের নিজেদের তুলনায় কয়েদীর সংখ্যা অনেক বেশি।

রবিনকে বলল সে, 'পরের বার তোমার বাবা এলেই বেরিয়ে যাব আমি।'

মিস্টার মিলফোর্ড তখন ঠেলা বোঝাই করছেন। ভরে গেছে, আর দুই তিন মিনিটের মধ্যেই নিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু এই সময় ঘটল অঘটন। বেশি বোঝাই হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, উল্টে গেল ঠেলাটা। হাতল চেপে ধরে রেখেও কিছু করতে পারলেন না। সমস্ত কয়লা ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালে। দুর্ঘটনা ঘটার যেন আর সময় পেল না।

কিশোর আশা করল, গার্ডের চোখে পড়বে না। কিন্তু ঠিকই পড়ল। চিৎকার করে বলে উঠল কি যেন। কথা বুঝতে পারল না কিশোর। ভাবল, আরও সাবধান হয়ে কাজ করতে বলছে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু কর্তৃত্ব জাহির করার জন্যে গটমট করে এসে হাজির হলো লোকটা। ভাষা না

বুঝলেও তার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় গালাগাল করছে। পেছন থেকে এসে শপাং করে মিস্টার মিলফোর্ডের পিঠে বাড়ি মারল। ঝুঁকে কাজ করছিলেন তিনি। বাড়িটা যে আসছে দেখতে পাননি। বাড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। তবু একটা শব্দ বেরোল না তাঁর মুখ থেকে। কাজ করে গেলেন এমন ভঙ্গিতে যেন কিছুই ঘটেনি। এটা সহ্য করতে পারল না প্রহরী। প্রচণ্ড রাগে আবার বাড়ি মারল। এবার বাড়িটা আসতে দেখেছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ঝট করে হাত তুলে নিলেন মুখের কাছে। বাড়িটা হাতে লাগল। এবারও কোন আওয়াজ বেরোল না মুখ থেকে।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে শুরু করল রবিন। বেরোনোর জন্যে নড়ে উঠতেই ধরে ফেলল কিশোর, 'বোকামি কোরো না!' হিসিয়ে উঠল কানের কাছে। 'মরতে চাও নাকি?'

পেছনে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ল রবিন। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওকে...ওকে আমি ছাড়ব না!'

'সময় আসুক।'

গাড়িতে কয়লা ভরতে লাগলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কয়লা ভরা শেষ করে রওনা হলেন রেখে আসার জন্যে। ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ লোকটা। ধীরে ধীরে সরে গেল। আগের জায়গায় গেল না, তারচেয়ে আরেকটু কাছে অন্যখানে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমি যাচ্ছি,' কিশোর বলল, 'এখন না গেলে আর সুযোগ পাব না।'

এগিয়ে আসছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ভারী গাড়ি, ঠেলে আনতে কষ্ট হচ্ছে। দুই গজ দূরে থাকতে বলে উঠল কিশোর, 'যাচ্ছি।' হাতের ধাক্কায় ফোকরের মুখের কয়লা সরিয়ে বেরিয়ে গেল সে। মুখের কাছে চলে এসেছেন মিস্টার মিলফোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির হাতল ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন ফোকরের মধ্যে। হাতল ধরে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল কিশোর। পুরো ব্যাপারটা ঘটাতে তিন-চার সেকেন্ডের বেশি লাগল না। চট করে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল সে দ্বিতীয় লোকটা কি করছে। পাহাড়ের ঢালে আগের মতই কাজ করছে সে। কিছু দেখতে পায়নি।

মিস্টার মিলফোর্ড যে ভাবে গাড়ি ঠেলে নিয়ে গিয়ে কয়লা রেখে এসেছেন, সে-ও সেভাবেই রাখতে শুরু করল। চোখের কোণ দিয়ে নজর রেখেছে প্রহরীটার ওপর। লোকটাও তাকিয়ে আছে তার দিকে, তবে নড়ছে না। মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে বদলাবদলিটা সে দেখতে পায়নি; পেলে নরক গুলজার করে ফেলত এতক্ষণে।

আবার কয়লা আনার জন্যে ঢিবির কাছে ফিরে গেল কিশোর। আশা করছে দশ মিনিটেই কাটা হয়ে যাবে শিকল। তবে অঘটন ঘটার জন্যে দশ মিনিট প্রচুর সময়। কোন্‌দিক দিয়ে যে কি ঘটে যাবে, বলা কঠিন।

খোঁড়লের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় করাত ঘষার শব্দ কানে এল কিশোরের। যতটা শব্দ হবে ভেবেছিল, তারচেয়ে বেশি হচ্ছে। তবে আশেপাশে অন্যান্য শব্দ এত বেশি, কানে গেলেও আলাদা করে চিনতে পারবে না প্রহরী। এর জন্যে বাতাসকেও ধন্যবাদ জানানো উচিত।

তুষারপাত বেড়েছে। একটানা ঝরতে শুরু করেছে সীসা রঙের আকাশ

থেকে। মনে মনে খোদাকে ডাকল কিশোর–খোদা, এর চেয়ে বেশি যেন আর না বাড়ে! মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় দিলেই চলবে!

গাড়িতে কয়লা ভরতে শুরু করল আবার। হঠাৎ লক্ষ করল, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় লোকটা। তার মুখের দিকে নয়, পায়ের দিকে। কেন রয়েছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। শেকল দেখতে পাচ্ছে না পায়ে। ভোঁতা চেহারার মাঝবয়েসী একজন মানুষ। গাঁইতিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিশোরের পায়ের দিকে তাকিয়ে হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছে, শিকলটা খুলল কি করে কয়েদীটা! ওর এই কাজ বন্ধ করে দেয়া নজর এড়াল না প্রহরীর। চিৎকার করে উঠল। চমকে গিয়ে আবার সচল হয়ে উঠল লোকটা।

আরেক মিনিট কাটল।

কাজ করতে করতে কিশোরের কাছে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। বিড়বিড় করে কিছু বলল। ভাষাটা জানে না কিশোর, বুঝতে পারল না কিছু। অনুমান করল, লোকটা জানতে চাইছে সে শিকল কাটল কিভাবে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল কেবল কিশোর। যা খুশি ধরে নিক লোকটা।

মিস্টার মিলফোর্ড খোঁড়লে ঢুকেছেন দশ মিনিট হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় কাটা হয়ে গেছে শিকল, কিংবা কাটা শেষ হবার পথে। ওমরকে যা সময় দিয়ে এসেছিল কিশোর, তারচেয়ে পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়েছে সে। কাজেই কাটার জন্যে পাঁচ মিনিট বেশি সময় পাবেন মিস্টার মিলফোর্ড। ওই সময়টা কাজ করে কাটাতে হবে কিশোরকে, কারণ কাঁটায় কাঁটায় সময় না হলে আগুন জ্বালবে না ওমর।

ঠেলা বোঝাই করে আবার সাজিয়ে রাখার জন্যে ফিরে যাচ্ছে কিশোর, এই সময় শুনতে পেল সেই জঘন্য শব্দটা, যেটার ভয় করছিল মনে মনে–বেজে উঠল প্রহরীর বাঁশি। প্রহরীদের সর্দার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এই পরিস্থিতিতে কয়েদীদের আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিরাপদ নয়। প্রতি মিনিটে তুষারপাত বাড়ছে। কমে আসছে আলো। এখনই পঞ্চাশ গজের বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

ঘুরে তাকানোর সাহস করল না কিশোর। তাকালেই যদি হাতের ইশারায় তাকে কাছে যেতে বলে। না গিয়ে পারবে না। হুকুম অমান্য করলে গুলি করেও বসতে পারে, এখানকার প্রহরীদের যা মতিগতি। কোন আইন নেই, কানুন নেই, বিচার নেই। এখনও যা করছে সে, তাতেও যে গুলি খাবে না, নিশ্চিত করে বলা যায় না। খোঁড়লের পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন।

'রেডি থাকো,' গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বলল কিশোর। বহু আকাঙ্ক্ষিত ধোঁয়া দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে দেখা যাবে এখন। এমনিতে যথেষ্ট আড়াল তৈরি করেছে তুষার, তবে এতটা নয় যে খোঁড়ল থেকে বেরোতে গেলে দেখতে পাবে না, সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো প্রহরীটার চোখে পড়বেই। আর অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে বেরোনোটা যদি চোখে না-ও পড়ে, পালাতে গেলে দেখে ফেলবেই এবং বিনা দ্বিধায় গুলি চালানো শুরু করবে তখন। যদি কোন কারণে জখম হয়ে যায় দলের কোন একজন, তাহলে যে কি বিপদে পড়বে সেটা

আর ভাবতে চাইল না কিশোর।

খোঁড়লটা ছাড়িয়ে কয়েক গজ এগিয়ে গেল সে। বেশি দূরে যেতে চাইছে না, কারণ যে কোন সময় দেখা দিতে পারে ধোঁয়া। সময় নষ্ট করার জন্যে ইচ্ছে করে হোঁচট খেল সে। এখনও বুঝতে পারছে না তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা প্রহরীটা। দু'তিন পা এগিয়ে আবার হোঁচট খাওয়ার ভান করল। ভার বেশি হয়ে গেল ঠেলার একদিকে। উল্টে গেল। হাতল ছুটে গেল হাত থেকে।

তোলার জন্যে নিচু হলো, চাবুকের মত শপাং করে উঠল কঠিন কণ্ঠ। ছুটে এসেছে প্রহরীটা, প্রায় পৌঁছে গেছে তার পেছনে। খোঁড়লের পাশ দিয়েই এসেছে। কিছু করেনি যেহেতু, নিশ্চয় চোখে পড়েনি খোঁড়লটার সামনের দেয়ালের পরিবর্তন। এতক্ষণে ফিরে তাকাল কিশোর। চাবুকটা কাঁধে ফেলে, রাইফেল শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। কিশোরের আচরণ সন্দেহ জাগিয়েছে তার। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু বলার আগেই চোখ পড়ল কিশোরের পায়ের দিকে। হাঁ করা মুখ হাঁ-ই হয়ে রইল।

কিশোরের পকেটে পিস্তল আছে। কিন্তু বের করার সাহস করল না। করলে লোকটাকে গুলি করা ছাড়া উপায় থাকবে না, আর তাতে সতর্ক হয়ে যাবে বাকি প্রহরীরা। শুরু হয়ে যাবে গুলিবৃষ্টি।

কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে না করেও পারবে না। না করলে তার নিজেকে গুলি খেতে হবে। রাইফেল তুলতে শুরু করেছে লোকটা।

সমস্যার সমাধান করে দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। নিঃশব্দে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন প্রহরীর পেছনে। ডান হাতে ধরা কাটা শিকলটা। ঘুরিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাড়ি মারলেন লোকটার মাথায়। তাতে রয়েছে রাজ্যের আক্রোশ আর ঘৃণা। টুঁ শব্দ করল না প্রহরী। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

কাঁপা গলায় মিস্টার মিলফোর্ডকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।

ঠিক এই সময় ধোঁয়া চোখে পড়ল তার। তুষারপাতের মধ্যেও কমলা রঙ আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে।

রবিনও বেরিয়ে চলে এসেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না।

'দৌড় দাও!' বলেই ঢালের দিকে ছুটতে শুরু করল কিশোর।

এগারো

শুরু হলো নরক গুলজার। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। গুলির শব্দ হলো একবার। বাতাসে ভর করে ভেসে আসতে শুরু করল ধোঁয়ার খণ্ড খণ্ড মেঘ। শুধু ধোঁয়া নয়, ছাই, পোড়া কাঠকুটোও আসতে লাগল। তুষারপাত না হলে স্ফুলিঙ্গও আসত। আগুন ধরে যেত দাহ্য শুকনো জিনিস যা পেত তাতেই। ঢালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখল কিশোর, আগুনের লম্বা একটা দেয়াল লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রের দিকে। মোটামুটি একটা আগুন চেয়েছিল সে, এ জিনিস কল্পনা করেনি। বাতাসে রজনের তীব্র গন্ধ। রজন এবং বাতাস, দুই জিনিস মিলে এ

অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মাথার ওপর দিয়ে জ্বলন্ত ফার নীড্‌ল্‌ উড়ে গিয়ে কয়লার ওপর পড়তে দেখে ঘাবড়ে গেল সে। যে পরিমাণ শুকনো লতাপাতা আছে জায়গাটাতে, পুরো পাহাড়টাই জ্বলে উঠতে পারে। ফারের জঙ্গলে আগুন ছড়িয়ে পড়লে-যেটাতে আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবছে ওরা, পুরো অঞ্চলটা নরকে পরিণত হবে।

পায়ের নিচে পাথর, কয়লার টুকরো আর আলগা জিনিসের অভাব নেই। পা পড়লে হড়কে যায়। তার ওপর দিয়েই যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটে পৌঁছে গেল বনের কিনারে। রবিন আর মিস্টার মিলফোর্ড ঠিক তার পেছনেই লেগে আছেন।

কোন দিকে না তাকিয়ে অন্ধের মত বনের দিকে ছুটতে লাগল ওরা। ঘন ধোঁয়ার জন্যে গাছ দেখা যাচ্ছে না। বেশি কাছে গেল না। মোড় নিয়ে ছুটল বাঁ দিকে, নদীর কাছে যাওয়ার জন্যে। ওটা পেরোতে হবে। কতদূরে আছে ওটা, জানে না। এ দিকটা কখনও দেখেনি। অনুমান করছে, সামনেই কোথাও পেয়ে যাবে।

কতখানি ছুটেছে বলতে পারবে না, তবে অনেক হবে। পেছন থেকে ডাক দিল রবিন, 'কিশোর, থামো। বাবা দৌড়াতে পারছে না।'

'আরে না না, থামার দরকার নেই,' মিলফোর্ড বললেন। 'শিকল পরে থাকতে থাকতে পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে তো। খানিক দৌড়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। এখন থেমো না, বিপদ হবে।...কোনদিকে যাচ্ছ?'

'নদীর দিকে। ব্রিজটার কাছে যেতে হবে।'

'পাহারা থাকতে পারে ওখানে।'

'তা পারে। দেখা যাক। যা-ই ঘটুক, শুকনো কাপড়ে ওপারে যেতে চাই আমি।'

আবার রওনা হলো কিশোর। আগের মত অত জোরে দৌড়াল না আর, মিস্টার মিলফোর্ড কুলিয়ে উঠতে পারেন না। বাতাস এখন তুষারকণায় ভরা। কিন্তু ঘন হয়ে গজানো গাছের ডালপাতার ভেতরে তুষার পড়তে পারছে না। কয়লা পাহাড়ে কি ঘটছে কে জানে। বুঝে হবেই বা কি, ভাবল। ওটা তো তার নিয়ন্ত্রণে নেই। গাছাপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তুষার আর ধোঁয়ার মধ্যে কমলা রঙের আভা দেখতে পাচ্ছে কেবল।

যতটা ভেবেছিল, তারচেয়ে দূরে নদীটা। পাওয়া গেল অবশেষে। তেমন চওড়া নয় এখানটায়। তবে যত কমই হোক, হেঁটে পেরোতে গেলে কাপড়-জামা আর শুকনো থাকবে না। পানির রঙ কালো। কতটা গভীর বোঝা যায় না। হাঁটতে গিয়ে যদি দেখা যায় সাঁতার কাটতে হবে, তাহলেই হয়েছে।

'ব্রিজ দিয়ে পেরোনোর চেষ্টাই করা উচিত,' কিশোর বলল।

নদীর পাড়ে বামন বার্চের জটলা, নিচু ডালওয়ালা উইলোও আছে। যতটা সম্ভব নদীর কিনার ঘেঁষে ওগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল আবার সে।

'নদী পার হয়ে কোথায় যাবে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'প্লেনের কাছে। ল্যাগুনের ভেতরে নলখাগড়ার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। এখান থেকে কয়েক মাইল হবে।'

আর কোন কথা হলো না। এক সারিতে এগোল ওরা। সবার পেছনে রইলেন

মিস্টার মিলফোর্ড। খানিক আগের হই-হট্টগোলের পর এখন অদ্ভুত নীরব লাগছে সব কিছু। তুষারের কণার আকার বড় হয়েছে আরও। ঘনও হয়েছে।

কিছুক্ষণ ধরে গাছের পাতায় তুষারপাতের একটানা ঝিরঝির শব্দই কেবল শোনা গেল, তারপর কানে এল নতুন একটা শব্দ।

ঝম! ঝম! ঝম! ঝম!

অদ্ভুত শব্দ। এই পরিবেশে কেমন যেন লাগে শুনতে। কিসের শব্দ বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। শিকলের। কাছেই কোনখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে শিকল পরানো হতভাগ্য কয়েদীর দল।

হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, 'ওদের চলে যেতে দেয়া উচিত। পার হয়ে যাক।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। ভূতুড়ে শব্দটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না।

সিকি মাইল মত পেরিয়েছে ওরা, এই সময় ঘটল একটা ঘটনা, তুষারঝড়ের সময় যেটা সচরাচর ঘটে না–হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল তুষার পড়া, যেন আচমকা রসদ ফুরিয়ে গেছে তুষারের। সামনে অনেকখানি জায়গা নজরে আসছে এখন। মুশকিল হলো, খোলা জায়গায় রয়েছে ওরা। বার্চের পরের জটলাটার মধ্যে যাওয়ার জন্যে দৌড় মারল। ঢুকে পড়ল তাতে। ওখান থেকে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোথায় কি আছে।

কোথায় আছে চিনতে পারল। নদীর সেই অগভীর জায়গাটার কাছে চলে এসেছে ওরা, মিকোশা যেখান দিয়ে দৌড়ে পার হয়েছিল। বাঁ দিকে কিছুদূরে ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছে এখনও। পাহাড়ের যেখানে আগুন লেগেছিল, পুড়ে কালো হয়ে আছে একটা বিরাট অংশ। ব্রিজটা রয়েছে সামনে তিনশো গজ দূরে। পায়ে চলা পথ ধরে ঘন সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছে কয়েদীরা। দু'পাশ থেকে কঠোর পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের।

'এখানেই থাকি কিছুক্ষণ আমরা,' কিশোর বলল, 'ওরা না যাওয়া পর্যন্ত। বেরোতে গেলে যদি দেখে ফেলে মুশকিলে পড়ে যাব। তার চেয়ে অপেক্ষা করি।'

কেউ কোন প্রতিবাদ করল না।

'একজন গার্ড কম আছে,' আবার বলল কিশোর। 'তারমানে আঙ্কেল যেটাকে শিকল দিয়ে পিটিয়েছেন সেটা আসতে পারেনি। হয়তো মরেই গেছে। যদি না মরে, বেহুঁশ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো তুলে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জেলখানায়। হেডগার্ডকে একটা ভাল সমস্যা উপহার দেবে সে।'

'কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'হুঁশ ফেরাতে পারবে না বলে?'

'না,' মুচকি হাসল কিশোর। 'সে জানাবে এই বন্দি পালানোর পেছনে দুজন লোকের হাত আছে, দুজনের চেহারা একই রকম, একজনের পায়ে শিকল ছিল, আরেকজনের ছিল না। কিন্তু বাড়ি নিয়ে গিয়ে যখন গুনবে, দেখবে গায়েব হয়েছে মাত্র একজন লোক। তাহলে আরেকজন কোথায় গেল? গার্ডের সামনের লোকটা কে ছিল, শিকল খুলল কি করে, আর মাথায় বাড়িই বা মারল কে? মস্ত ধাঁধা না?'

'শিকল খোলা যে দেখেছে নাকি গার্ডটা?'

'অবশ্যই দেখেছে। আরেকটু হলে ওর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে চলে

আসছিল। শুধু সে-ই না, আঙ্কেলের সঙ্গে যে আরেকটা লোক কাজ করছিল সে-ও দেখেছে। আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল, ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আরেকটু হলেই দিচ্ছিল খেল খতম করে। জেলখানায় নিয়ে গিয়ে যদি কয়েদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাহলে নিশ্চয় এই লোকটা গার্ডের কথার সঙ্গে একমত হয়ে বলবে একজন কয়েদীর পায়ে শিকল ছিল না। জেলখানা কর্তৃপক্ষকে এটা ভাবিয়ে তুলবে।' মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকাল কিশোর। 'ব্রিজের কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দলটা দূরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দেব। তবে মাটিতে পড়া তুষার একটা মস্ত ক্ষতির কারণ হবে। পায়ের ছাপ পড়ে যাবে–শুধু আমাদেরই না, ওমর ভাই আর মুসার ছাপও পড়বে।'

'ওরাই তাহলে আগুনটা লাগিয়েছে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ওরা?'

'মনে হয় নিরাপদেই কেটে পড়েছে। ব্রিজের অন্যপাশে অপেক্ষা করছে এখন।'

'কিন্তু কই,' রবিন বলল, 'দেখা তো যাচ্ছে না।'

'ওরা কি আর অত বোকা, খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আছে কোনখানে, বনের ভেতর। নজর রাখছে আমাদের জন্যে।'

'জেলখানায় কি যেন হচ্ছে,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন।

ব্রিজের দিক থেকে চোখ ফেরাল কিশোর। খুলে গেছে জেলখানার গেট। তিনজন কসাক বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল শিকল পরা কয়েদীর দলটার দিকে।

সাবধান হয়ে গেল কিশোর। জরুরী কণ্ঠে বলল, 'ব্রিজের দিকে আসছে বোধহয়। আমাদের আগে পৌঁছে গেলে মরেছি, আটকা পড়তে হবে এ পাশটায়। গার্ডদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে থামবে নিশ্চয়। মাত্র মিনিটখানেক সময় আছে আমাদের হাতে, দেরি করলে দেখে ফেলবে।'

ছুটতে শুরু করল কিশোর। কসাকদের দিকে চোখ রেখে বার্চের ভেতর দিয়ে এগোল। পিছে পিছে ছুটল অন্য দুজন।

ছুটতে ছুটতেই কিশোর বলল, 'যা ভেবেছিলাম। গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে সব।' মিস্টার মিলফোর্ডকে বলল, 'দৌড় দিন।' রবিনের দিকে তাকাল, 'দৌড়াতে থাকো। কোন কারণেই থামবে না। ওরা এদিকে তাকানোর আগেই ব্রিজের কাছে পৌঁছে যাওয়া চাই আমাদের।'

কয়েদীদের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল তিন কসাক। হেড গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাইল বোধহয়, কারণ ওদের দিকে এগোতে দেখা গেল লোকটাকে।

'রেডি!' বলেই ব্রিজের দিকে ছুটল কিশোর।

দুশো গজ মত পেরোতে হবে। কসাকরা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ দূরত্বে। তবে তাদের কাছে ঘোড়াও আছে।

ছুটতে ছুটতে অর্ধেক পথ চলে এসেছে কিশোররা, এই সময় দূর থেকে চিৎকার শোনা গেল; দেখে ফেলেছে ওদের। কোনদিকে তাকাল না কিশোর। দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে, রাস্তার দিকে, যেটা ধরে ব্রিজে পৌঁছানো যায়। অন্য কোনদিকে

তাকানোর চেয়ে এখন রাস্তার দিকে চোখ রাখাই জরুরী, কোন কারণে পা পিছলে পড়ে যাওয়া মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। ছোট ছোট বাধা টপকে একনাগাড়ে ছুটল সে। ব্রিজের গোড়ায় গিয়েও থামল না। ব্রিজে উঠল। তারপর ফিরে তাকাল। পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তিন ঘোড়সওয়ার। শ'খানেক গজ দূরে রয়েছে আর।

রবিনের কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। শান্তকণ্ঠে দুই কিশোরকে বললেন, 'যাও, তোমরা ব্রিজ পেরোও। তোমরা না পেরোনো পর্যন্ত কভার করে রাখছি আমি।'

'কিন্তু…' বলতে গেল রবিন।

'যাও, জলদি করো! সব বাহাদুরি নিজেরাই নিতে চাও নাকি?'

রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'এসো, সময় নেই।'

কিশোরের পেছন পেছন ব্রিজের দিকে দৌড় দিল রবিন।

ঘোড়সওয়ারদের দিকে দুই বার গুলি করলেন মিস্টার মিলফোর্ড, জানানোর জন্যে যে তাঁর কাছেও পিস্তল আছে। কারও গায়ে গুলি লাগল না, তবে গতি কমাতে বাধ্য হলো কসাকরা। রাইফেল খুলে নেয়ার জন্যে ঘোড়া থামাল। সামান্য যে সময় পাওয়া গেল এই সুযোগে রবিন আর কিশোরের পেছন পেছন মিস্টার মিলফোর্ডও ব্রিজে উঠে পড়লেন।

উত্তেজনায় ওমর আর মুসার কথা ভুলেই গিয়েছিল রবিন। ওদের দেখে যেন অবাক হয়ে গেল।

হাত নেড়ে চিৎকার করে মুসা বলল, 'জলদি এসো, জলদি! কোনমতে পেরোও কেবল, তারপর জন্মের শিক্ষা দেয়া হবে ব্যাটাদের। এ পাড়ে আসতে হলে সাঁতার কাটা ছাড়া পথ পাবে না।'

পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে তিন কসাক। এগিয়েই আসছে। রাইফেলগুলো হাতে। তবে যে ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, তাতে গুলি করে নিশানা ঠিক রাখতে পারবে কতখানি, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিশোররা পার হয়ে চলে আসতেই পকেট থেকে কি যেন বের করে আনল মুসা। জোরে ছুঁড়ে মারল ব্রিজ লক্ষ্য করে। মাঝামাঝি জায়গার চেয়ে সামান্য দূরে পড়ল ওটা। চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো। কানফাটা গর্জন। ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। টুকরো-টাকরা ছিটকে উড়ে যেতে লাগল চতুর্দিকে।

আরও একবার একই জিনিস ছুঁড়ে মারল মুসা।

বাপের জন্মে এ রকম বদখত জিনিসের মুখোমুখি হয়নি বোধহয় ঘোড়াগুলো। ব্রিজের মুখের কাছে চলে এসেছিল। সামনের পা তুলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল। বিকট শব্দে ডাক ছাড়তে ছাড়তে ঘুরে দিল দৌড়। এক হাতে রাইফেল নিয়ে ওগুলোকে সামলাতে পারল না পিঠে বসা সওয়াররা। যার যেদিকে খুশি দৌড় মারল ঘোড়াগুলো।

'ইয়া হু!' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'গেছে! গেছে! ব্যাটাদের জারিজুরি খতম!'

বাতাসে ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল। দেখা গেল, ব্রিজের মাঝখানটা ধ্বংস হয়ে

গেছে। মস্ত এক ফোকর।

'খাইছে! কাণ্ডটা কি হলো!' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'জানো, কতকাল ধরে এ ধরনের কিছু করার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করেছি আমি। সিনেমায় শত্রুপক্ষের ব্রিজ ওড়ানো দেখলে হাত নিশপিশ করত।'

'হলো তো,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় হাত নিশপিশ বন্ধ হয়েছে এখন।'

জেলখানার দেয়ালে গর্ত করা লাগতে পারে ভেবে ডিনামাইটের স্টিক নিয়ে আসা হয়েছিল। তার থেকেই নিশ্চয় গোটা কয়েক পকেটে পুরেছিল মুসা।

'এনে ভালই করেছি, না কি বলো,' কিশোরের মনের কথা পড়তে পেরে যেন বলে উঠল মুসা। 'ভাবলাম, জেলখানার দেয়াল যখন ফুটো করা গেলই না, অন্য কিছু করা যাক।'

'আমাকে জানালে না কেন?'

'ভয়ে। হয়তো আনতে দিতে না।'

'হয়তো। ভাবতাম কাজে লাগবে না।'

চওড়া হাসিতে দুই পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। 'তাহলে স্বীকার করছ, এই একটিবার অন্তত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে আছি...'

'বকবকানি থামাও,' বাধা দিল কিশোর। 'অনেক কাজ বাকি এখনও।' নিজের ঘোড়াটাকে সামলে ফেলেছে একজন সওয়ারি। দৌড়ে আসছে আবার নদীর দিকে। ব্রিজের কাছ থেকে কিছুটা উজানে রয়েছে।

'খারগা,' রবিন বলল।

'মিকোশা যেদিক দিয়ে নদী পেরিয়েছে,' অবাক হয়ে বলল কিশোর, 'সেদিকে যাচ্ছে। চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি। ও নদী পেরিয়ে চলে এলে ঝামেলা বাধাবে। এত কিছু করে আসার পর এখন আমাদের কারও জখম হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়।'

'তা বটে,' রবিনও একমত হলো কিশোরের সঙ্গে। তাকিয়ে আছে খারগার দিকে। পানির কিনারে পৌঁছে গেছে খারগা। পানিতে নামাতে চাইছে ঘোড়াটাকে।

'একটা গুলি মেরে দিলে কেমন হয়?' কিশোরের দিকে তাকাল ওমর।

'কোন লাভ হবে না,' কিশোর বলল। 'এত দূর থেকে লাগাতে পারবেন না ওকে। তারচেয়ে গুলি বাঁচিয়ে রাখুন, ভবিষ্যতে কাজে দেবে।...চলুন এখন, যাওয়া যাক।'

সবে ঘুরতে যাবে সে, রাইফেলের গুলির শব্দ হলো।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'আমরা না করলে কি হবে, অন্য কেউ গুলি করছে ওকে লক্ষ্য করে।...আরে আরে, লাগিয়ে ফেলেছে তো!'

খারগার হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। ঘোড়াটার গলা চেপে ধরে পতন রোধ করতে চাইল। কয়েক সেকেন্ড যেন ঝুলে রইল ওই ভঙ্গিতে। ধীরে ধীরে পিছলে যাচ্ছে দেহটা। কোনমতেই জিনের ওপর বসে থাকতে পারল না আর। খসে পড়ে গেল মাটিতে। ওভারকোটের কোণটা আটকে রইল জিনের এক মাথায়। এদিক ওদিক দু'চারটা ছোট ছোট লাফ মারল ঘোড়াটা। খসাতে পারল না। তারপর ওকে নিয়েই দৌড়াতে শুরু করল। ঝাঁকি লেগে এক সময় কোণাটা ছিঁড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে গেল খারগার লাশ। পানির এত কিনারে পড়ল, গড়িয়ে গিয়ে পড়ল পানিতে। বরফ শীতল পানিতে স্রোতে ভেসে এগিয়ে চলল মোহনার দিকে। জোর কদমে ছুটতে ছুটতে চলে গেল তার বাহন।

স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ছিল সবাই। অবশেষে মুখ খুললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'গুলিটা করল কে?'

'নিশ্চয় মিকোশা,' মুসা বলল।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় না। প্লেন ছেড়ে মিকোশা ওখানে যাবে না কোনমতেই।'

'ওহ্হো,' ওমর বলল, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, একটু আগে মারকভকে দেখলাম। আমরা যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, তার কাছ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আগুন লাগানোর পর এক পলকের জন্যে দেখেছি। বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে।'

'মারকভটা আবার কে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'তোমাদের কোন বন্ধু নাকি?'

'বন্ধুই বলতে পারো,' রবিন বলল। 'তবে সঙ্গে আসেনি, এই বনেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। খারগাকে খুন করার জন্যে পাগল হয়ে ছিল।'

'অনেকেই ওকে খুন করার জন্যে পাগল। ও কি মানুষ নাকি! নরকের শয়তান!...কিন্তু তার ওপর মারকভের এত আক্রোশ কেন?'

'মারকভ প্রাক্তন কয়েদী। শাখালিনে জেল খেটে এসেছে। ছাড়া পাওয়ার পর বনের মধ্যে কুঁড়ে বানিয়ে বাস করছিল। কিন্তু রেহাই দেয়নি তাকে খারগা। এসে এসে অমানুষিক অত্যাচার করে যেত।'

'অ। ওর জন্যে অপেক্ষা করবে নাকি?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। এখান থেকে যাবে না সে। ওর একমাত্র ধ্যান-ধারণা এখন, ওই ভয়ঙ্কর কারাগারের যে পিশাচেরা অন্যায়ভাবে তার ওপর অত্যাচার করেছে, তার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে, এক এক করে তাদের খতম করা।'

'কিন্তু জেলখানায় হচ্ছেটা কি?' রবিন বলল। 'দেখো।'

গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে শিকল পরানো কয়েদীদের। গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ডজনখানেক ইউনিফর্ম পরা লোক। আলো কমে গেছে অনেক। তাতে কেমন অবাস্তব লাগছে দৃশ্যটা। জোড়ায় জোড়ায় দৌড়ে আসতে লাগল ওরা পায়েচলা পথটা ধরে।

'স্পেশাল ফোর্স,' মিস্টার মিলফোর্ড জানালেন। 'জেলখানায় গোলমাল-টোলমাল হলে ওদের তলব করা হয়। ইবলিস একেকটা।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেও ঠিক হচ্ছে না আমাদের,' ওমর বলল। 'সময় থাকতে চলে না গেলে পরে পস্তাতে হবে। গোলাগুলির শব্দ জেল থেকে শুনতে না পাওয়ার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, চলুন,' কিশোর বলল।

আকাশের দিকে তাকাল ওমর। 'তুষারপাত কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়নি। আবার হবে। অনেক বেশিই হবে এবারে। তাতে পড়বে পায়ের ছাপ। স্পেশাল ফোর্স ব্রিজ

পেরোলেহ জেনে যাবে কোনদিকে গেছি আমরা।'

রওনা হলো ওরা। আগে আগে চলল ওমর। সবার পেছনে মিস্টার মিলফোর্ড। পা টেনে টেনে চলেছেন তিনি। একপায়ে সামান্য ব্যথা পেয়েছেন।

চলতে চলতে কান পাতল ওমর। কানে আসছে রাইফেলের গুলির শব্দ।

'আবার কে?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় মারকভ,' রবিন বলল। 'প্রতিশোধের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে সে।'

'রাইফেল পেল কোথায়?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'একজন গার্ডকে খুন করে কেড়ে নিয়েছে।'

রবিনের কথায় সুর মিলিয়ে কিশোর বলল, 'আমাদের জন্যে উপকারী বন্ধু। বনের মধ্যে যদি লুকিয়ে বসে থাকে সে, ব্রিজ পার হওয়া কঠিন হয়ে যাবে স্পেশালই হোক, আর যে ফোর্সই হোক, সবার জন্যে। নদী পেরোতে গেলেই মরবে।'

বারো

আবহাওয়া সম্পর্কে ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। বেশিদূর এগোতে পারল না, তার আগেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল আবার। আর এবার শুরু হলো ভালমত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রবল তুষার-ঝড় ঠেলে এগোনো লাগল ওদের। পায়ের নিচে ইঞ্চিখানেক তুষার জমে গেল। এত স্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে শুরু করল, আধা অন্ধ একজন মানুষও সেটা অনুসরণ করে যেতে পারবে স্বচ্ছন্দে। যদিও পড়তে না পড়তে তুষারে ছাপগুলো ঢেকে যাচ্ছে আবার। কিন্তু হাঁটার সময় নতুন ছাপ রেখেই চলেছে ওরা। হঠাৎ করে যদি তুষার পড়া বন্ধ হয়ে যায়, পরের ছাপগুলো থেকে যাবে। অনুসরণকারীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোথায় চলেছে ওরা।

ঝড়টা রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওমরকে। সে জানে, এই আবহাওয়ায় কোনমতেই বিমান ওড়ানো যাবে না। যদি তুষারপাত বন্ধও হয়ে যায়, তাহলেও সম্ভব না-কারণ, বিপুল পরিমাণ তুষার জমে যাবে বিমানের গায়ে; এত ভার নিয়ে উড়তেই পারবে না।

মিস্টার মিলফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'আচ্ছা, আপনি তো ভাল জানেন, এখানে কিভাবে কাজ চালায় ওরা? এ রকম আবহাওয়ায়ও কি খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাবে?'

মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'খুঁজবে, তবে কিছু বিশেষ জায়গায়। বেছে বেছে কিছু কিছু জায়গায় পাহারা বসিয়ে দেবে। এই যেমন, মাছধরা নৌকা, কুঁড়েগুলো-যেখানে যেখানে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ কেউ পালালে প্রথমে তার দরকার খাবার।'

'তাহলে আর আমাদের টিকির নাগালও পাবে না ওরা।'

বনের ভেতর দিয়ে চলছিল বলে বাঁচল। একজন কসাককে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখা গেল। ল্যাগুনটা আধ মাইল দূরে এখনও। গাছের গায়ে আর্তনাদ করে ফেরা বাতাস, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ, আর তুষারপাতের মিলিত শব্দ এতটাই প্রবল

যে ঘোড়াটার খুরের শব্দ শুনতেই পায়নি ওরা। ছায়ার মত হঠাৎ উদয় হলো লোকটা। বনের বাইরে থাকলে ভীষণ বিপদে পড়ত ওরা। কিশোর দেখল, ঘোড়ার পিঠে বসে নিচু হয়ে তুষারের মধ্যে কি যেন দেখতে দেখতে চলেছে লোকটা। নিশ্চয় পায়ের ছাপ খুঁজছে।

'সাবধান থাকতে হবে আমাদের,' ওমর বলল। 'লোকটা ফিরে আসার সময় যেন দেখা হয়ে না যায় আবার।'

'আমরা তো সাবধানই আছি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মিকোশা? তাকে যদি দেখে ফেলে?'

'বলেছে তো সাবধানে থাকবে। তাছাড়া ও এত সহজে ধরা পড়ার বান্দা নয়। এতগুলো গার্ডের চোখের সামনে থেকে পালানোর বুদ্ধি আর সাহস যার থাকে, তাকে একটা মাত্র কসাক কোনমতেই কাবু করতে পারবে না। দেখা যাবে কসাকটাকেই মেরে ফেলেছে সে।'

গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। রাস্তায় বেরোনোর যা-ও বা সামান্য ইচ্ছে ছিল, কসাকটাকে দেখার পর সে-চিন্তা বাদ দিয়ে দিল। বনের ভেতরে থেকে এমন জায়গা দিয়ে হাঁটছে যাতে রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে চোখে পড়ে, বিশেষ করে যে কসাকটা গেছে তাকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওমর। সামনে থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ শোনা গেছে। ঝড়ের শব্দের জন্যে ঠিক বোঝা গেল না কোনখান থেকে এসেছে।

'দুটো আওয়াজ দুই রকম লাগল। তারমানে দুটো ভিন্ন অস্ত্র থেকে গুলি দুটো হয়েছে,' ওমর বলল। 'আমার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে মিকোশাকে সই করে গুলি করেছিল কেউ, মিকোশা পাল্টা জবাব দিয়েছে। কিংবা উল্টোটাও হতে পারে।'

এগিয়ে চলল ওরা। মিনিটখানেক পরেই কসাকটাকে রাস্তা ধরে আসতে দেখা গেল। ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'যাওয়ার কায়দা দেখে তো মনে হলো তাড়াহুড়া আছে,' ওমর বলল। 'তারমানে কিছু দেখে এসেছে।'

'কি দেখবে? প্লেনটা দেখেছে বলে মনে হয় না আমার। পাঁচ-সাত গজের বেশি দৃষ্টি চলছে না। দেখবে কি করে?'

'অত অনুমান-টনুমান করে লাভ নেই,' ওমর বলল। 'মিকোশার সঙ্গে দেখা হলেই জানা যাবে কি হয়েছে।...যদি তাকে পাওয়া যায় ওখানে...'

'আপনি কি ভাবছেন...'

'সত্যি কথা হলো, গুলির শব্দটা আমার ভাল লাগেনি। জলদি চলো।'

ভয়ানক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে বাকি যাত্রাটা শেষ করল ওরা। ঝড়ের গতি বাড়ছে আরও, কমার কোন লক্ষণই নেই। কিছুক্ষণ চলার পর ওমর বলল, 'ল্যাগুনটা পার হয়ে চলে গেলে পড়ব মহা বিপদে। এই ঝড়ের মধ্যে তখন প্লেনটাকে খুঁজে বের করা হবে অসম্ভব। হারিয়ে যাব।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিল মিকোশার নাম ধরে।

জবাব নেই।

কয়েকবার ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আরও পঞ্চাশ গজমত এগোল ওমর।

তারপর আবার ডাক দিল। এবারেও সাড়া নেই।

'কসাকটা ওকে গুলি করে মেরে রেখে গেলে,' কিশোর বলল, 'সারাদিন চেঁচালেও সাড়া পাব না।'

জবাব দিল না ওমর। আরও কয়েক গজ এগোল। ডাক দিল আবার, 'মিকোশা, মিকোশা' বলে।

এইবার সাড়া এল, জবাব দিল মিকোশা, 'এই যে, আমি এখানে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

আরও কয়েক কদম এগোনোর পর দেখা পাওয়া গেল তার।

'আমরা তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,' ওমর বলল। 'ভাবলাম গুলি করে ফেলে রেখে গেছে বুঝি আপনাকে।'

তার কথার জবাব দিল না মিকোশা। তাকিয়ে রয়েছে মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। চওড়া হলো হাসিটা। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'মুক্তি তাহলে পেলেন।'

'হ্যাঁ, পেলাম,' হাতটা ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কিন্তু ওসব কথা পরে হবে।...গুলির শব্দ যে শুনলাম, ব্যাপারটা কি?'

'আমাকেই করেছিল,' মিকোশা জানাল, 'মিস করেছে। তবে মিস হয়ে যে ক্ষতিটা হয়েছে, সেটাও কম ভয়ঙ্কর নয়।'

'কি করেছে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'ডিঙিটা ফুটো করে দিয়েছে।'

'কি করেছে!' ক্ষতির ভয়াবহতা প্রথমে যেন মগজেই ঢুকল না ওমরের।

কিশোর জানতে চাইল, 'কি করে ঘটল এই সর্বনাশ? আপনার না পাহারা দেয়ার কথা ছিল?'

'বিশ মিনিট আগে পর্যন্ত তা-ই দিচ্ছিলাম,' মিকোশা জানাল। 'তারপর তুষার জমা শুরু হলো এমন করে, ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম, ভরতে ভরতে ডিঙিটা না ডুবে যায়। তাই বোকার মত গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম ওটাকে।'

'ঠিকই করেছেন,' ওমর বলল। 'তা-ই তো করার কথা।'

'গিয়ে দেখি অর্ধেক ভরে গেছে ওটা। কাত হয়ে গেছে একপাশে। সোজা করার চেষ্টা করছি, এই সময় কোত্থেকে ঘোড়ায় চেপে ভূতের মত এসে উদয় হলো শয়তানটা। একটু শব্দও শুনিনি। হঠাৎ কি মনে হলো আমার, মুখ তুলে দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করলাম। সে-ও বের করল। গুলি করলাম। তাড়াহুড়োয় মিস করলাম। সে-ও গুলি করল। আমার মতই মিস করল। ডিঙিটার দিকে চোখ পড়তে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলাম, ওটাও বেলুনের মতই চুপসে গেছে। আমাকে যে গুলিটা করেছিল সেটা লেগেছে ডিঙিতে। তুষারের চাপে চাদরের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল ওটা, আমি কিছু করার আগেই।'

'ফুটো হয়ে গেলে আর আপনি কি করবেন। কোথায় এখন ওটা?'

ডিঙিটার কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল মিকোশা। বাতাস বেরিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। তুষারে চাপা পড়া। অর্ধেকটা রয়েছে পানির তলায়, অর্ধেক ডাঙায়।

'সত্যি বলছি, মাথার চুল সব ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে এখন আমার,' মিকোশা বলল।

'অত দুঃখ পাবার কিছু নেই,' সান্ত্বনা দিল ওমর। 'আপনার দোষ নয়। আপনার জায়গায় আমি হলেও এ-ই করতাম।'

'বিশ্বাস করুন, ডিঙিটা বাঁচাতেই চেয়েছিলাম আমি।'

'বললাম তো, ভুলে যান। ডিঙিটা তো গেছেই, ওটা নিয়ে আর মন খারাপ করে কি হবে। ওটাকে মেরামতের কোন উপায় নেই, ফোলানোও যাবে না।'

ডিঙি নেই। বিমানে যাওয়াটা এখন এক মস্ত সমস্যা।

কিশোর বলল, 'ডিঙি ছাড়া প্লেনে গিয়ে উঠতে পারব না। এখানে বসে বসে ঝড় থামার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কসাকটা এত তাড়াহুড়ো করে চলে গেল কেন, বোঝা যাচ্ছে এখন।'

'দলবল নিয়ে আসতে গেছে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। ডিঙিটা যদি দেখে থাকে সে–আমার ধারণা নিশ্চয় দেখেছে, তাহলে জেলখানার কর্তৃপক্ষরা পরিষ্কার জেনে যাবে উটকো ঝামেলাটা কোনখান থেকে এসেছে।'

তিক্তকণ্ঠে মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'বেশ চমৎকার একখান সমস্যা তৈরি করে দিয়ে গেল!'

'শুধু সমস্যা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, সমাধান তো একটা বের করতে হবে,' দমল না কিশোর।

'কিন্তু আমি তো কোন উপায় দেখছি না।'

'আছে, নিশ্চয় আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'খুঁজে বের করতে হবে আরকি উপায়টা।'

'প্লেনটা তীরে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'প্লেনে উঠতে পারলে তবে তো আনা,' কিশোর বলল। 'উঠতেই যদি পারা গেল, তাহলে আর আনার দরকার কি। সাঁতরে যাওয়ার কথা ভাবছেন তো? পানির তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। এর মধ্যে সাঁতরানো, তা-ও আবার ঘন নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে–অসম্ভব! কোনমতেই পারবেন না।'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে কিশোর বলল, 'রবিন, মারকভের একটা নৌকা আছে, মনে আছে?'

'আছে। কিন্তু পাব কোথায়? মারকভ যাওয়ার সময় নিশ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। যতই পালাক, খাওয়ার জন্যে মাছ ধরতে হবে ওকে, আর মাছ ধরার জন্যে নৌকা দরকার।'

'আছে কিনা, গিয়ে দেখতে দোষ কি?'

'দোষ নেই, তবে মাইলখানকে হাঁটতে হবে এই আরকি। যদি পাওয়া যায়ও, এতদূর বেয়ে আনা যাবে না এই ঝড়ের মধ্যে।'

'বেয়ে আনার কথা কে ভাবছে?' জবাব দিল কিশোর। 'বয়ে আনব।'

'তা আনা যায়। কিন্তু সময়মত ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারব? সৈন্যরা যদি চলে

আসে?'

'আসবে তো জানা কথাই, তবে সময় লাগবে। ব্রিজটা ভাঙা, রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে মারকভ, নদী পেরোনোই কঠিন হয়ে যাবে ওদের জন্যে।...মারকভের নৌকাটাই এখন একমাত্র ভরসা আমাদের। একসঙ্গে সবাই ওতে না উঠতে পারলে ভাগাভাগি করে পেরোব।...নৌকা আনতে সবার যাওয়ার দরকার নেই। মিস্টার মিকোশা, আপনি থাকুন এখানে। আঙ্কেল, আপনিও থাকুন। এতদিন ধরে জেলে থেকে থেকে, ওদের খাবার খেয়ে নিশ্চয় কাবু হয়ে গেছেন—আর আজকে তো যে খাটনিটা খাটলেন।'

'মোটেও ক্লান্ত হইনি আমি,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বরং সঙ্গে আসি, তোমাদের কাজে লাগব। আর কিছু না পারি, তোমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা তো দিতে পারব। আমাকে ডিঙিয়ে গিয়ে কেউ তোমাদের ছুঁতে পারবে না।'

'তা আমি জানি,' হেসে বলল কিশোর। 'ঠিক আছে। চলুন, যাওয়া যাক। মিকোশা, ডিঙিটা তো আর আমাদের কোন কাজে লাগছে না, এটাকে ভালমত ডুবিয়ে দিন। কসাকরা ফিরে এসে যাতে কোন চিহ্ন না দেখে, বুঝতে না পারে কোনখানে দেখে গিয়েছিল এটা। আমরাও যাতে দেখতে না পেয়ে পার হয়ে চলে না যাই সেদিকেও খেয়াল রাখবেন।'

'কি করে বুঝব, তোমরা এলে, নাকি কসাকরা?'

'আমরা হলে তো নৌকাটা বয়ে আনতেই দেখবেন। যদি আর না ফিরি, আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন তখন। যদি মনে হয়, আমরা আর ফিরব না, এই তুষার-ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তারপর প্লেন নিয়ে ফিরে যাবেন আমেরিকায়। রকি বীচের বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস্টার ভিক্টর সাইমনকে খবর দেবেন। আপনার কাজ শেষ।'

উজানের দিকে ফিরে চলল আবার চারজন হতাশ অভিযাত্রী। পেছন থেকে ঝাপটা মারছে এখন প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া। সুবিধে হচ্ছে এতে। বাতাসের অনুকূলে যাচ্ছে বলে কখনও দৌড়ে, কখনও জোরে হেঁটে এগিয়ে চলল দ্রুত। নৌকাটা কোথায় আছে সেটা রবিন জানে, সে-জন্যে সবার আগে রয়েছে সে, আর সবার পেছনে মিস্টার মিলফোর্ড। ওমর আর তাঁর হাতে পিস্তল। উল্টো দিক থেকে শত্রুপক্ষকে আসতে দেখলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাতে প্রস্তুত।

সব কিছু তুষারে ঢাকা। সব দেখতে এক রকম। সন্দেহ জাগল রবিনের, মারকভের কুঁড়ে খুঁজে পাবে তো!

সন্দেহটা ঠিকই হয়েছে তার। বার বার থেমে, কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করল, কোনখানে আছে জায়গাটা। যাই হোক, অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল বনের ভেতরের পরিষ্কার করা খোলা জমি, যেখানে মারকভের কুঁড়ে। ওখান থেকে কতদূরে কোনখানে আছে নৌকাটা, ধারণা আছে রবিনের। ঘুরে সেদিকে এগোল।

কিন্তু নৌকাটা দেখল না। সহজে দেখবে আশাও করেনি। কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেছে তুষার। তার নিচে ডেবে গেছে নিশ্চয়। পানির কিনারে উঁচু হয়ে থাকা

ছোট ছোট ঢিবিগুলোকে লাথি মেরে মেরে ভাঙতে শুরু করল সবাই মিলে। নৌকার সমান উঁচু ঢিবি খুব বেশি নেই। কয়েক মিনিট পর তিক্ত সত্যটা প্রকট হলো। নৌকাটা নেইই ওখানে।

'নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছে মারকভ,' রবিন বলল।

'তারমানে সময় নষ্ট করছি আমরা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে, তা কি করে জানব!'

কিন্তু এতেও দমল না কিশোর। রবিনকে নিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ বনের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দেখা গেল, তুষারের চাদরের আড়ালে অস্পষ্ট একটা সচল মূর্তি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

'মারকভ! মারকভ!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'কি বলছে ও?' জানতে চাইল কিশোর।

'কি খুঁজছি আমরা জিজ্ঞেস করছে।'

'বলো, ওর নৌকাটা খুঁজছি।'

নৌকাটা কোথায় জিজ্ঞেস করল রবিন।

বিচিত্র পোশাকে এই ঝড়ের মধ্যে অদ্ভুত লাগছে মারকভকে। সারা গায়ে তুষারকণা লেগে আছে। কোমরে কুড়াল। হাতে রাইফেল।

তার সঙ্গে কথা বলে রবিন জানাল, 'নৌকাটা তুলে এনে লুকিয়ে রেখেছে সে। বেশি দূরে না, কাছেই আছে। ওর ধারণা হয়েছিল, কসাকগুলো এসে বিপদে ফেলবে আমাদের। সাহায্য লাগতে পেরে ভেবে এখানে অপেক্ষা করছিল।'

'ওকে বলো, আমাদের নৌকাটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে এক কসাক,' কিশোর বলল। 'জিজ্ঞেস করো, ওরটা ধার দেবে কিনা।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মারকভ। বনের ভেতর নিয়ে গেল ওদেরকে। নৌকাটা কোথায় রেখেছে দেখাল। একমাত্র দাঁড়টা পড়ে আছে নৌকার মধ্যে। ঘন ডালপাতাওয়ালা গাছের নিচে থাকায় ভেতরে তুষার পড়েনি। এটা একটা স্বস্তি। তুষার সাফ করা লাগল না।

নৌকাটা বয়ে নিতে ওদের সাহায্য করল মারকভ। বাতাস এখন মুখোমুখি। এগোনোটা এমনিতেই কঠিন, তার ওপর যুক্ত হয়েছে নৌকার বোঝা, এবং তার ওপর নৌকার গায়ে বাতাসের ঝাপটা; এত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বস্তি পেল কিশোর–নৌকাটা পাওয়া গেছে, আর তুষারপাত ওদের পায়ের চিহ্ন ঢেকে দিচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার, গন্তব্যে যখন পৌঁছাল, মিকোশা ওদের থামতে বলল, তখন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইটা থেমে যাওয়াতে কেমন হতাশই লাগল কিশোরের।

পানিতে নামানো হলো নৌকা। মাত্র দুজন লোক ধরে, তাতেই ডুবু ডুবু। তার মানে দুজন করে যাবে বিমানে, একজনকে নামিয়ে দিয়ে অন্যজন নৌকা নিয়ে ফিরে আসবে, তখন যাবে আরেকজন। অর্থাৎ প্রতিবারে একজন করে লোক প্লেনে উঠতে পারবে।

প্রথমে মিস্টার মিলফোর্ডকে তুলে দিয়ে আসতে বলল ওমর। প্রতিবাদ করলেন না তিনি। করে লাভ নেই। কেউ শুনবে না তাঁর কথা। অহেতুক সময় নষ্ট। উঠে পড়লেন নৌকায়।

বাইতে গিয়ে মিকোশা দেখে, নৌকা ওল্টানোর কোন সম্ভাবনা নেই। নলখাগড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগোনোর সময় গাছগুলো এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি করে দিচ্ছে। ঢেউও তেমন উঠতে দিচ্ছে না। অথচ নদীতে এখন বড় বড় ঢেউ।

তুষারের চাদরের আড়ালে নৌকাটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল কিশোর। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হলো বহু যুগ পরে আবার নৌকা নিয়ে ফিরে এল মিকোশা। এরপর গেল মুসা। মিকোশাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল। তারপর গেল কিশোর। সে নৌকা ভাল বাইতে পারে না। সুতরাং তাকে নামিয়ে দিয়ে আবার মুসাকেই ফিরে আসতে হলো। এরপর কে যাবে এ নিয়ে ঠেলাঠেলি। রবিন যুক্তি দেখাল, ওমরের চলে যাওয়া উচিত। সে নিজে গেলে মারকভের সঙ্গে কথা বলার লোক থাকবে না। চাপাচাপি করল না ওমর। চলে গেল। ফিরে এল মুসাকে নামিয়ে দিয়ে।

নৌকায় চাপল রবিন। ওমরকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল সে। মারকভকে অনুরোধ করল, তাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে।

পৌঁছে দিল মারকভ।

প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। রবিনকে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা।'

মাথা নাড়ল রবিন। বলল, 'না, যাবে না। জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছে, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তীরে ফিরে যাবে। নৌকাটা লুকিয়ে রেখে ঢুকে যাবে জঙ্গলে। তারপর কসাকদের বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধটা শুরু হবে ওর। যতজনকে পারবে, খতম করবে। এত জনের সঙ্গে একা পারবে না, শেষ পর্যন্ত মরতে হবে ওদের হাতে, জানে সে; কিন্তু কেয়ার করে না। জীবনের কোন দাম নেই এখন ওর কাছে, মৃত্যুর পরোয়া করে না।'

'হুঁ,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল মুসার মুখ। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো না, কিছু খাবার নেবে কিনা? তাতে কিছুটা অন্তত মনে শান্তি পাব। আমাদের জন্যে অনেক করেছে ও।'

খাবার নিতে রাজি হলো মারকভ।

কিশোরের পেছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুসা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যে। দুই হাতে করে যতগুলো সম্ভব টিন নিয়ে এসেছে। বলল, 'সব দিয়ে দাও। আমাদের তো আর বেশিক্ষণ থাকা লাগছে না। ফিরে গেলেই খাবার পাব। ও পাবে না।'

সে আর কিশোর মিলে টিনগুলো রবিনের হাতে দিতে লাগল। নৌকার তলায় সেগুলো সাজিয়ে রাখল রবিন।

ধন্যবাদ দিল তাকে মারকভ।

বিমানে উঠল রবিন। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে উঠতে ইচ্ছে করছে না। অদ্ভুত এক মায়া।

ওর দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত বিদায় জানিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করল

মারকভ। দূরে যেতে যেতে একসময় মিলিয়ে গেল তুষারের চাদরের আড়ালে। চিরকালের জন্যে।

'কোনদিন আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে!' গলা ধরে এল রবিনের। আজব এক বিষণ্ণতা।

জবাব দিল না কিশোর বা মুসা। মারকভ আর তার নৌকাটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল তিনজন।

'চলে গেছে?' কেবিন থেকে জানতে চাইল ওমর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা।

'দরজাটা লাগিয়ে দাও। ঠাণ্ডা ঢুকছে।'

কেবিনে ঢুকল ওরা। চেয়ারে নেতিয়ে আছেন মিস্টার মিলফোর্ড। এতক্ষণে ক্লান্তি লাগছে তাঁর। প্রচণ্ড ক্লান্তি। গত কয় মাসে ভয়াবহ ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।

ল্যাগুনে ঢেউ পুরোপুরি ঢুকতে না পারলেও যা ঢুকছে, তাতেই বেশ দুলছে বিমান।

'প্রচুর তুষার জমেছে গায়ে,' ওমর বলল। 'ডানাগুলোতে কয় ইঞ্চি পুরু হয়েছে, খোদাই জানে। বিরাট বোঝা।'

'তাতে কি খুব অসুবিধে হবে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'হবে, যদি জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যায়। আলগা থাকলে ঝেড়ে ফেলতে পারব। ঝাঁকি লাগলেও আপনাআপনি ঝরে যাবে।' থামল ওমর। কান পেতে শুনল বাইরে বাতাসের শব্দ। 'মনে হচ্ছে ঝড় খুব বেশিক্ষণ আর থাকবে না। তবে ঢেউ না কমলে উড়তে পারব না। এত ঢেউয়ে রান করানো যাবে না।'

'তারমানে রাতটা থাকতে হচ্ছে এখানেই,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, কি আর করা। আমি ছদ্মবেশ খুলে আসছি।'

বাথরুমের দিকে চলে গেল সে। ছদ্মবেশ বলতে এখন কেবল পরচুলাটাই আছে, রঙ-টঙ সব ধুয়ে চলে গেছে কখন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে।

স্টোভ ধরিয়ে কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে ততক্ষণে মুসা।

তেরো

বাকি রাতটা কসাকদের উৎপাত ছাড়াই কেটে গেল কোনমতে। অস্বস্তি আর উদ্বেগে ভরা একটা দুর্যোগের রাত। সারারাত বিমানটাকে নিয়ে খেলা করল যেন বাতাস। একটু পর পরই টান মারে, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল শিকল, নোঙর উপড়ানোর পাঁয়তারা করল। ফলে কেউ ঠিকমত ঘুমাতে পারল না। চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগল, আর চমকে চমকে উঠল বার বার। তাই ভোর যখন হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। বাইরের অবস্থা দেখার জন্যে দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর।

তুষারপাত থেমে গেছে। তাপমাত্রা বেড়েছে খানিকটা। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে

উঁকি দিচ্ছে কেমন পানি-ভরা নিস্তেজ সূর্য। বাতাসের গতি অনেক কম। ঝড় থেমেছে অবশেষে। ঘন নলখাগড়ার বনে আশ্রয় নেয়া হাঁসেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। রাস্তার দিকে তাকাল সে। কাউকে চোখে পড়ল না। ফারের ডালে জমা তুষার বোঝা হয়ে গিয়ে খসে খসে পড়ছে।

পাশে এসে দাঁড়াল ওমর। মোহনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঢেউ এখনও যথেষ্ট। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কমে যাবে আশা করছি। তখন ওড়া যাবে। ততক্ষণে ডানা আর পিঠে জমা তুষারও ঝরে যাবে অনেক।'

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বসে রইল ওরা। কসাকরা চলে আসে কিনা দেখছে।

ককপিটে বসল ওমর। ওড়ানোর চেষ্টা করার আগে গরম করা দরকার। চালু করতে অনেক কায়দা-কানুন করতে হলো, কারণ বরফের মত শীতল হয়ে আছে এঞ্জিনগুলো। বেশ কিছু উদ্বিগ্ন মুহূর্ত আর কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর অবশেষে চালু হয়ে গেল একটা এঞ্জিন। তার পর পরই আরেকটা। থ্রটল বাড়াতে ভয় পাচ্ছে ওমর। গর্জন শুনে কৌতূহলী হয়ে যদি দেখতে চলে আসে কসাকরা। মিনিট দশেক চালু করে বন্ধ করে দিল।

এই সময় এসে হাজির হলো পেট্রল বোটটা। গলুইয়ের নিচের পানি কাটার নমুনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে গতি খুব বেশি।

'আমাদের দেখেনি এখনও,' বোটটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওমর বলল। 'মারকভের কুঁড়ের দিকে চলেছে।'

'আমাদের দেখে ফেলবে,' কিশোর বলল। 'প্লেনের ওপর থেকে নলখাগড়াগুলো পড়ে গেছে। পিঠ বেরিয়ে পড়েছে। দেখে ফেলবে, শিওর।'

'না-ও দেখতে পারে। এদিকে না তাকালে দেখবে না। যাচ্ছে তো দূর দিয়ে।'

'তবু বলা যায় না। দূরবীন থাকতে পারে।'

'দেখে যদি ফেলেই, কি হবে?' মুসা বলল। 'উড়ে চলে যাব।'

'চলে যাওয়ার অনেক ঝামেলা। বোটে নিশ্চয় রেডিও আছে। আমরা আকাশে ওড়ার আগেই বাজানো শুরু হবে ওটা। হয়তো দেখা গেল আমরা ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো এক ঝাঁক ফাইটার প্লেন। তাড়া করল আমাদের। পালিয়ে বাঁচতে পারব না।'

'দেখে ফেলেছে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'বললাম না!'

মিস্টার মিলফোর্ড আর মিকোশাও এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে।

'হুঁ,' মাথা দোলাল ওমর। 'আর থাকা গেল না। উড়তেই হচ্ছে এবার। যাও, ভেতরে যাও সবাই। মুসা, দরজাটা লাগিয়ে দাও।'

দ্রুত ককপিটের দিকে চলে গেল ওমর। মুসা দরজাটা লাগিয়ে দিল। যার যার সীটে গিয়ে বসল সবাই।

শক্ত হয়ে বসতে বলল ওমর।

ল্যাগুনের ভেতরে গাছপালার আড়ালে থাকাতে ঢেউয়ের দাপট অতটা বোঝা যায়নি, কিন্তু খোলা নদীতে পড়তেই ভয়ানক দোল খেতে আরম্ভ করল বিমান। ওড়ার চেষ্টা চালাল ওমর। গতি বাড়াতে পারছে না ঢেউয়ের জন্যে। তবে ঢেউই শেষ

পর্যন্ত উড়তে সাহায্য করল ওকে। বড় একটা ঢেউয়ের চূড়া ধাক্কা দিয়ে শূন্যে তুলে দিল বিমানটাকে।

মৃদু হাসি ফুটল ওমরের মুখে। বিপজ্জনক এলাকা থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়তে চাইছে। কিন্তু বেশি ওপরে উঠল না। দ্বীপ থেকে আরও কেউ দেখে ফেলতে পারে এই ভয়ে প্রায় পানি ছুঁয়ে ছুটতে লাগল খোলা সাগরের দিকে। মোহনার কাছে পৌঁছে তারপর ওপরে উঠল। সোজা উড়ে চলল জাপান সীমান্তের দিকে।

'আকাশের দিকে নজর রাখো,' পাশে বসা কিশোরকে নির্দেশ দিল সে।

'আর ওপরে উঠবেন না?'

'না। নিচে থাকলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।'

দশ মিনিটের মধ্যে একটা অদ্ভুত কালো বস্তুর মত দ্বীপটাকে পেছনে ফেলে এল বিমান। আরও কয়েক মিনিট পর দক্ষিণ দিগন্তে ভেসে উঠল একটা নোংরা অস্পষ্ট কালো দাগ। জাপানের সীমারেখা।

'এসে গেছে!' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর।

'কোথায়?'

'লেজ বরাবর পেছনে। পাঁচ হাজার ফুট দূরে।'

'ক'টা?'

'তিন।

'কাছে আসার আগেই পালাতে না পারলে সলিল সমাধি আছে কপালে,' পেছনে তাকাল না ওমর। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। দৃষ্টি নিবদ্ধ দক্ষিণের দাগটার দিকে। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওটা। স্পষ্ট হচ্ছে। 'জাপানের সীমানায় আমাদের তাড়া করার সাহস পাবে না ওরা। রবিনকে বলো এয়ার পোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বিপদে পড়েছি, জানাতে বলো। বলো সাংবাদিকের প্লেন। এঞ্জিনে গোলযোগ। নামার অনুমতি চাই। আরও বলো, আমাদের সঙ্গে একজন জাপানী পাইলটও আছে। কিছুদিন আগে নিখোঁজ হয়েছিল। তাকে পাওয়া গেছে। দরকার হলে তার নামও জানাতে পারো।'

তাড়াতাড়ি উঠে পেছনে চলে গেল কিশোর।

পরের কয়েকটা মিনিট টানটান উত্তেজনার মধ্যে কাটল। শত্রুদের বিমানগুলো অনেক বেশি আধুনিক। দেখতে দেখতে কাছে চলে এল। গুলির রেঞ্জের মধ্যে পেতে দেরি নেই। ঠিক এই সময় উল্টো দিক থেকে উড়ে আসতে দেখা গেল আরও চারটে বিমান। রবিনের মে-ডে পেয়ে দেখতে আসছে কতটা বিপদে পড়েছে সাংবাদিকের বিমানটা।

চারটে জাপানী বিমানকে দেখে গুলি করতে দ্বিধা করল রাশানরা। এই সুযোগে জাপানের সীমানায় ঢুকে পড়ল ওমর। দুই পাশ থেকে ঘিরে এল জাপানী বিমানগুলো। প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে চলল আমেরিকান বিমানটাকে।

রাশানরা সীমানার বাইরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে চলল যেদিক থেকে এসেছিল। বুঝে গেছে, আর লাভ নেই, হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার।

***
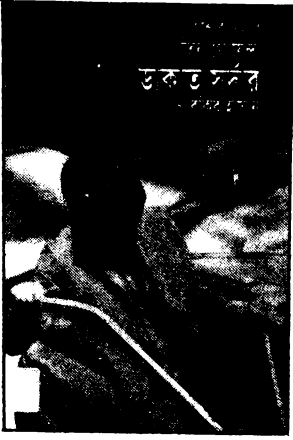
ডাকাত সর্দার

প্রথম প্রকাশ ২০০০

'গেছে উধাও হয়ে!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন।

'কে উধাও হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

রকি বীচ মলে ক্রেতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। সকাল শেষ। দুপুরের দেরি নেই।

'আর কে। মুসা। কোথায় যেতে পারে, বলো তো?'

চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। তারপর হাত তুলল। 'ওই যে, ওপরে যাওয়ার এসক্যালেটরটায়।'

'হুঁ, তাই তো বলি,' মাথা দুলিয়ে বলল রবিন, 'কোথায় যেতে পারে আমাদের মুসা আমান। শিওর, দোতলার রেস্টুরেন্টটায় যাচ্ছে।'

হাসল কিশোর। 'হ্যাঁ, ওর কাছে শপিং মানেই ফাস্ট-ফুড-স্ট্যান্ড।'

দুই বন্ধুকে আসতে দেখে একটা বিমল হাসি উপহার দিল মুসা। 'এসেছ। দোতলাটা একবার ঘুরে আসতে যাচ্ছিলাম। পেটের মধ্যেই জানান দিচ্ছে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।'

'এ আর নতুন কথা কি,' রবিন বলল। 'তোমার পেট তো সব সময়ই লাঞ্চ, ডিনার, নাস্তার সঙ্কেত দিয়েই চলেছে। তবে খাবারের কথা বলে ভালই করেছ, আমার পেটের খিদেটাও জানান দিচ্ছে।'

এসক্যালেটর থেকে নেমে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সব ধরনের রেস্টুরেন্টে ভর্তি এ তলাটা। চায়নিজ, ইটালিয়ান, মেক্সিকান, ইনডিয়ান, জাপানী, এমনকি হাওয়াইয়ান খাবারও পাওয়া যায় এখানে। বাতাসে খাবারের সুগন্ধ।

গদগদ ভঙ্গিতে দুই হাত ডলতে লাগল মুসা। 'সবগুলোই টেস্ট করে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'আমি পিৎসাতেই সন্তুষ্ট।'

'আমিও,' কিশোর বলল। একটা ইটালিয়ান স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলো দুজনে।

দুই স্লাইস পিৎসা আর দুটো লেমোনেড শেষ করে ফিরে তাকাল ওরা। মুসাকে দেখতে পেল ডাইনিং সেকশনের মাঝখানের একটা টেবিলে।

এগিয়ে গেল রবিন। 'টেবিল পেলে কি করে?' গুঙিয়ে উঠল সে। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হলো আমাদের!'

বিজ্ঞের হাসি হাসল মুসা। 'ও সব জানতে হয়। এখানকার নিয়ম-কানুন সব আমার মুখস্থ। ঘন ঘন আসি তো।' একটা এগ-রোলের শেষ অংশটা ঠেসে ঠেসে মুখে পুরল সে। 'হ্যাঁ, হয়েছে। এখন বলো কোথায় যেতে হবে। আমি এখন

পুরোপুরি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত...'

হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করল লোকে। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'দেখলে কাণ্ডটা?'

'কি কাণ্ড!' অবাক হলো রবিন।

'সবুজ সোয়েটার পরা ছেলেটার কাণ্ড? মহিলার পার্সটা কেড়ে নিয়েই দৌড়!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাতে চোরটাকে দেখতে পেল আবার কিশোর। ধরার জন্যে দৌড় দিল। রবিন আর মুসা অনুসরণ করল তাকে।

ওদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে গেল ছেলেটার। ঢুকে পড়ল চমকে যাওয়া ক্রেতাদের ভিড়ে। ঠেলা-ধাক্কা আর গুঁতো মেরে লোকজনকে সরাতে সরাতে ছুটল সে। সবাই কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তাকে ধরার কথাও ভাবছে না কেউ।

ছেলেটার মত একই কায়দায় ওদের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোল তিন গোয়েন্দাও। হাতের ধাক্কায় চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে টামালি, এগ-রোল, চিলি ডগ আরও নানা রকম খাবার।

ভুল এসক্যালেটরে গিয়ে উঠল ছেলেটা। ওপরে উঠছে এসক্যালেটর, সেটা বেয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে তার গতি গেল অনেক কমে। ক্রেতাদের ধাক্কা মেরে সরাতে সরাতে চিৎকার করে উঠল, 'আহ্, সরুন, সরুন!'

তার পিছে লেগে থাকার চেষ্টা করল মুসা আর রবিন। কিশোর ছুটে গেল নিচে নামার এসক্যালেটরটার দিকে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে গেল ছেলেটা। তিন গোয়েন্দা যখন সেখানে পৌঁছল, পুরোদমে দৌড়াতে শুরু করেছে সে।

'ওই যে! ওই যে!' চিৎকার করে মুসাকে দেখাল রবিন।

'ধরো ওকে, ধরো!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

সবই দেখছে লোকে, কিন্তু কেউ ছেলেটাকে থামানোর চেষ্টা করছে না। বরং লাফ দিয়ে সরে জায়গা করে দিচ্ছে যেন ওকে আরও ভালমত দৌড়ানোর জন্যে।

মলের মাঝখানের বড় ফোয়ারাটার দিকে ছুটে গেল সে। সবুজ সোয়েটারটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে লোকের ভিড়ের মধ্যেও।

'ফোয়ারা ঘুরে যাচ্ছে,' চিৎকার করে দুই সহকারীকে জানাল কিশোর। 'এদিক থেকে ঘুরে গিয়ে মুখোমুখি হও। আমি পেছনে থাকছি।'

ফোয়ারা ঘোরার সময় ফিরে তাকাল ছেলেটা। তেড়ে আসা তিন কিশোর এখনও তার পেছনে লেগে আছে কিনা দেখল। থমকে দাঁড়াল। চালাকি করে বাঁয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল। তারপর দৌড় দিল সবচেয়ে কাছে দিয়ে বেরোনোর দরজাটার দিকে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল মুসা।

সহজেই তার পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিতে গেল ছেলেটা। কিন্তু পরক্ষণে উড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। মুসার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে একটা পা বাড়িয়ে দিয়েছে রবিন। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে ছেলেটা।

'চমৎকার, নথি!' রবিনের প্রশংসা করে কলার ধরে চোরটাকে মেঝে থেকে টেনে তুলল কিশোর। সোয়েটারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা লাল পার্স। 'কি মিয়া, এটা তোমার নাকি? একে তো মহিলাদের জিনিস, তার ওপর

লাল, তোমার তো সবুজ পছন্দ। কি জবাব দেবে?'

ভয় পাওয়ার বদলে বরং দাঁত বের করে হাসল ছেলেটা। 'নাহ্, তোমরা সত্যি দারুণ!'

'আমাদের কাজ তাহলে পছন্দ হয়েছে তোমার?' শুকনো স্বরে বলল কিশোর। ছেলেটার রহস্যময় আচরণ অবাক করেছে তাকে। চট করে তাকিয়ে নিল দুই সহকারীর দিকে।

'না, সত্যি বলছি!' চোরটা বলল। 'যে ভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলে। তবে তারপরেও বলতে হবে দেরি করে ফেলেছ। আমি তো মনে করেছিলাম এসক্যালেটরের ওপরই আমাকে ধরে ফেলবে।'

'পারতাম,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল ওই লোকগুলো। ধরার চেষ্টা তো করলই না, উল্টে···আচ্ছা, ধরা পড়াতে মনে হচ্ছে খুশি হয়েছ তুমি?'

'তাই তো! কি ব্যাপার হে?' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন।

'জবাবটা বরং আমিই দিই।'

ওদের ঘিরে জমে ওঠা ভিড় ঠেলে সরিয়ে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। পরনে হালকা ধূসর রঙের স্যুট।

ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ভদ্রলোকের টাকমাথা, বিশাল মোটা দেহ। তাঁর ঠিক পেছনেই রয়েছেন সেই মহিলা, যার পার্সটা ছিনতাই হয়েছে। দুজনেই হাসছেন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে।

'কে আপনি?' ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।

হেসে উঠলেন তিনি। 'কি বুঝলে, ক্যাটালিনা?' মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন। 'বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে? এই নাও তোমার পার্স।' পার্সটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। 'আমি শিওর, সব ঠিকঠাকই পাবে ভেতরে। কিছুই খোয়া যায়নি।' সবুজ সোয়েটার পরা ছেলেটার কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে বললেন, 'ভাল দেখিয়েছ, টিম।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন জনতার দিকে। 'যান, আপনারা। সব ঠিক আছে।'

ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল বিস্মিত জনতা।

তাদের মতই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, 'এ সবের মানেটা কি দয়া করে বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলবেন?' গম্ভীর মুখে কিশোরকে সমর্থন করল মুসা। 'লুকানো টিভি ক্যামেরা-টেমেরা আছে কোনখানে, একটা সত্যিকারের অ্যাকশন দৃশ্য তুলে রাখার জন্যে?' ক্যামেরার চোখটা দেখার জন্যে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল সে।

হাসলেন ভদ্রলোক। 'না, ক্যামেরা নেই। তবে অ্যাকশনটা সাজানো, প্ল্যান করেই করা হয়েছে, এটা ঠিক। চলো না, বসে কথা বলি।'

*

'সাজানো?' ভদ্রলোকের উল্টো দিকে একটা চেয়ারে বসে বলল কিশোর। ঘটনাটা ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে।

ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিলেন ভদ্রলোক। 'আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার নাম জন এফ বোরম্যান।' পাশে বসা মহিলার কাঁধে হাত রাখলেন। 'এ আমার বান্ধবী ক্যাটালিনা হিউমার।' ছেলেটাকে দেখালেন, 'আর ও হলো টিমথি, ক্যাটালিনার নাতি। তোমাদের লাভের জন্যেই ওদের সাহায্যে এই নাটকটার ব্যবস্থা করেছিলাম আমি।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন পুরো ব্যাপারটা ভুয়া?' ভেতরে ভেতরে রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল রবিনের।

বিরক্তি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল কিশোর। 'আমাদের লাভ? কি বলতে চান আপনি?'

'খুব সহজ,' মিস্টার বোরম্যান বললেন। 'তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম আমি। দেখতে চাইছিলাম, তোমাদের সম্পর্কে যা যা শোনা যায়, তা ঠিক কিনা। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যিই শুনেছি।'

'আমাদের সম্পর্কে শুনেছেন আপনি?' রবিনের প্রশ্ন।

'খবরের কাগজ পড়লে যে কেউ তোমাদের নাম জেনে যাবে। শোনো, এত বিনয় দেখানো লাগবে না। তোমরা তিন গোয়েন্দা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

ঝিক করে আলো জ্বলে উঠল বোরম্যানের চোখে। 'তোমাদের অনুসরণ করে মলে এসেছি আমরা। ছোট্ট একটা নাটকের ব্যাবস্থা করেছি। যাতে আসল কাজটায় যেতে পারি।'

হালকা হাসি দেখা গেল মিসেস হিউমার আর তার নাতির মুখে। হেসে বললেন মিসেস হিউমার, 'তোমাদের বোকা বানাতে পেরেছি আমরা, তাই না?'

'তা পেরেছেন,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কিশোর। 'যাকগে, আপনাদের কাণ্ডটা রসিকতা হিসেবেই নিচ্ছি আমরা। কিন্তু একটা প্রশ্ন নিশ্চয় করতে পারি। কেন করলেন এ কাজ?'

হাসলেন বোরম্যান। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, তিনি একাই হাসছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসা বন্ধ করে দিলেন। 'বেশ, আসল কথায় আসা যাক। তোমরা যে ভাবে টিমকে ধরে ফেললে, প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

'ঠিক আছে, করলেন প্রশংসা,' ঠকা খাওয়ার রাগটা এখনও ভুলতে পারছে না কিশোর। 'তারপর?'

কোটের পকেট থেকে চুরুট বের করে দুই হাতের তালুতে ডলে নরম করতে শুরু করলেন বোরম্যান। 'তোমাদের দিয়ে একটা কাজ করানোর কথা ভাবছি আমি।'

কিশোর আর মুসার দিকে তাকাল রবিন। সামনে ঝুঁকল। বোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা কি?'

চোখ নামালেন মিস্টার বোরম্যান। ভাবছেন কিছু। অবশেষে মুখ তুলে তাকালেন। প্রথমে রবিনের দিকে। তারপর মুসা। সবশেষে কিশোরের দিকে। কিশোরের বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখের তারায় চোখ রেখে ঘোষণা করলেন, 'একটা ডাকাতি করতে হবে তোমাদের!'

দুই

'মস্ত ভুল করেছেন আপনি, মিস্টার বোরম্যান!' কঠোর কণ্ঠে বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা, ডাকাত নই।'

'ঠিক!' রবিনও উঠে দাঁড়াল।

মুসা উঠে দাঁড়াল ধীরে সুস্থে। ঘাড় নেড়ে বলল, 'চলো।'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও মিস্টার বোরম্যানের হাসি শুনে থেমে গেল কিশোর। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল বোরম্যানের। রুমাল বের করতে হলো মোছার জন্যে। বললেন, 'জানতাম, চমকে যাবে। কিছু মনে কোরো না, নাটকীয়তা আমার ভীষণ পছন্দ। যাই হোক, সত্যি সত্যি অপরাধ করতে বলছি না তোমাদের।'

রুমালটা পকেটে রেখে দিলেন তিনি। 'যে কার্ডটা দিলাম তোমাদের, পড়ে দেখো; তাহলেই জানবে মাউনটেইন ইনের মালিক আমি। মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা শুনেছ কখনও?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'হ্যাঁ, শুনেছি। কোন কোন হোটেলে সাপ্তাহিক ছুটিতে গেস্টদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুয়া একটা রহস্য তুলে দেয়া হয় তাদের হাতে–এই যেমন খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ছুটি শেষ হওয়ার আগেই রহস্যটার সমাধান করতে বলা হয় তাদের।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার বোরম্যান।

'কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ?' জানতে চাইল রবিন।

'আছে,' ওদেরকে ধাঁধার মধ্যে রাখতে পেরে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন বোরম্যান। 'বহু জটিল কেসের সমাধান করেছ তোমরা, তাই না?'

কোনদিকে এগোচ্ছেন মিস্টার বোরম্যান, বুঝতে পারছে না কিশোর। বলল, 'তা করেছি।'

চুরুটের মাথা দাঁত দিয়ে কাটলেন বোরম্যান। 'আমি আমার গেস্টদের দিয়ে একটা রহস্যের সমাধান করাতে চাই। অপরাধ সৃষ্টি করে, সূত্র রেখে দিয়ে, গেস্টদের মধ্যেই সন্দেহভাজন তৈরি করে রাখতে চাই–মোট কথা, একটা অপরাধ রহস্যের ব্যবস্থা করার ইচ্ছে আমার।'

হাসি ফুটল কিশোর আর রবিনের মুখে। পছন্দ হয়েছে তাদের। মুসার দিকে তাকাল। তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। তার পছন্দ হলো কিনা, বোঝা গেল না।

বোরম্যান বললেন, 'আমি তোমাদের বেশি সম্মানী দিতে পারব না। তবে বিনে পয়সায় পর্বতের ওপরে একটা ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবে। চাইলে দু'একজন বন্ধুকেও সঙ্গে নিতে পারো। তাদের খরচটাও আমিই বহন করব।'

এবার সত্যি সত্যি আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। 'তারমানে আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ করছেন?' মুসার দিকে তাকিয়ে দেখল এখন তার মুখেও চওড়া হাসি।

মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান। 'হ্যাঁ, করছি।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'জিনাকে সঙ্গে নিতে পারি আমরা।'

'যাকেই নাও, তিনজনের বেশি নেবে না। হোটেলে রুম বেশি নেই। যাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি, রুম না থাকলে শেষে তাদেরকেই জায়গা দিতে পারব না।'

'আমরা একজনকেই নেব, তার বেশি না।'

'একটা কথা তোমাদের বলা হয়নি।' হাতের তালুতে সিগারেটটা ডলতে লাগলেন বোরম্যান। মনে মনে কথা সাজাচ্ছেন হয়তো। অপেক্ষা করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'একটা ভুয়া অপরাধ রহস্যের প্ল্যান এবং সেটাতে অভিনয় করার জন্যেই শুধু তোমাদের সাহায্য চাইছি, তা নয়। ওই এলাকার আশেপাশের হোটেলগুলোতে ডাকাতি হয়ে গেছে বেশ কয়েকটা। পুলিশ কোন কিনারা করতে পারেনি। তোমরা তদন্ত করলে হয়তো কিছু বের করে ফেলতে পারবে।'

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল মুসা। 'কি বুঝলে? যাবে? শুধু ভুয়া নাটকে অভিনয় নয়, আসল রহস্যেরও কিনারা করতে হবে। তারমানে, জমবে।'

'যাব তো বটেই,' জবাব দিল কিশোর। 'আসল রহস্য আছে বলেই আগ্রহটা বেড়ে গেছে আমার। রবিন, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'যাচ্ছ তো?'

'খালি খালি একা একা বাড়িতে বসে থেকে কি করব?' হাসল মুসা।

এতক্ষণে দিয়াশলাইর জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন মিস্টার বোরম্যান। 'আমি জানতাম, তোমরা রাজি হবে।'

'দাঁড়ান,' হাত তুলল কিশোর, 'আগে জেনে নিই কোন্ সপ্তাহের ছুটিতে কাজটা করাতে চাইছেন আপনি?'

'তিন সপ্তাহ সময় দেয়া হলো তোমাদের,' বোরম্যান বললেন। 'এ সময়ের মধ্যে প্ল্যান তৈরি করবে তোমরা। আমি করব বিজ্ঞাপন। হেডিংটা এভাবে দেয়া যেতে পারে: চমৎকার একটা রহস্য খুঁজছেন? নজর রাখুন এই বক্সের দিকে। এখানেই জানতে পারবেন, মাউনটেইন ইন-এ সময় কাটাতে হলে কি কি করতে হবে আপনাদের।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন। 'কেমন হলো? আশা করি, এ ভাবে লিখলে গেস্টরা আকৃষ্ট হবেই।'

শেষ পর্যন্ত চুরুটটা ধরালেন মিস্টার বোরম্যান। গোটা দুই লম্বা টান দিয়ে বাদামী রঙের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন ফকফক করে। 'তাহলে ওই কথাই রইল।' পকেট থেকে লম্বা একটা সাদা খাম বের করে বাড়িয়ে দিলেন। 'হোটেলটা সম্পর্কে সব কথা, আর কিভাবে যেতে হবে বিস্তারিত লেখা আছে এতে। খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

আগ্রহের সঙ্গে খামটা নিল কিশোর।

মিস্টার বোরম্যানের সঙ্গে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দা।

'ও, আরেকটা কথা,' বললেন তিনি। 'তোমাদের প্ল্যান করা হয়ে গেলে চিঠি লিখে জানাবে আমাকে। হোটেলের ঠিকানায় লিখবে না। কার্ডে যে পোস্ট বক্স আছে, সেই ঠিকানায় লিখবে। আমি চাই না, আমাদের প্ল্যানের কথা আর কেউ

জেনে যাক।'

'জানবে না,' কথা দিল কিশোর। 'অন্তত আমাদের কাছ থেকে তো নয়ই।'

পিস্তলের নলের মত করে চুরুটটা ওদের দিকে তুলে ধরে নাচালেন মিস্টার বোরম্যান। 'তাহলে, সামনের শুক্রবারের পরে, তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় দেখা হচ্ছে আমাদের।'

ক্যাটালিনা আর তার নাতিকে নিয়ে সবচেয়ে কাছে যে বেরোনোর দরজাটা দেখলেন, সেটার দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি। পেছনে, বাতাসে রেখে গেলেন ধোঁয়ার জাল।

মুসা বলে উঠল, 'উঁহ্, চুরুট না কচু! পুরানো মোজার গন্ধ!'

'চুপ! আস্তে! শুনবে!' সাবধান করল রবিন। হেসে রসিকতা করল, 'তবে যা-ই বলো, তেজ আছে ধোঁয়ার। নাকের সর্দি পরিষ্কার করে দিয়েছে আমার। চলো, যাওয়া যাক।'

উত্তরের করিডরটার দিকে রওনা হলো কিশোর।

রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা। 'আরেকবার দোতলার এসক্যালেটরটায় চেপে বসলে কেমন হয়?'

'উঁহু...' বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। এসক্যালেটরের ওপর থেকে একটা লোক তাকিয়ে আছে যেন ওদেরই দিকে। পরনে চামড়ার তৈরি কালো পোশাক। কালো রঙের বিশাল একটা নকল সাপ পেঁচিয়ে রেখেছে তার মোটর সাইকেল আরোহীর হেলমেটটাকে। হেলমেটের কালো প্ল্যাস্টিকের ঢাকনাটা পুরোপুরি টেনে দেয়া, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল লোকটা। তারপর আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে ওপরে উঠে মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

*

সেদিন বিকেলে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে আলোচনায় বসল ওরা।

মিস্টার বোরম্যানের দেয়া নির্দেশাবলীর কাগজপত্রগুলো সামনের ছোট টেবিলটায় রাখল রবিন। 'এই দেখো,' একটা পুস্তিকা তুলে নিয়ে পড়ে বলল সে, 'মাউনটেইন ইন হোটেলটা ছোট। গেস্টদের জন্যে মাত্র বারোটা কামরা। তাতে পাতানো রহস্যের খেলা খেলতে সুবিধেই হবে। বেশি গেস্ট থাকলে সন্দেহভাজনের সংখ্যা বেড়ে যেত, খেলাটা খুব জটিল হয়ে যেত।'

উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল রবিনের চোখে। 'নামটা যেমন ইন, মানে সরাইখানা, পুরানো আমলের সেই সরাইখানার যুগে চলে যাওয়ার ব্যবস্থাই করেছেন মিস্টার বোরম্যান। কোন কামরাতেই রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই। একটামাত্র টেলিভিশন রাখা হয়েছে লবিতে...'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই, কাটাব কি করে?'

'সুইমিং পুল আছে,' রবিন বলল।

'আবহাওয়া খুব বেশি ঠাণ্ডা,' মুসা বলল। 'সাঁতার কাটা যাবে না।'

'টেনিস কোর্ট আছে, টেনিস খেলতে পারবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা-ও সম্ভব না। মিস্টার বোরম্যান আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন কাজের জন্যে।

ডাকাতির তদন্ত বাদ দিয়ে খেলে বেড়াই, এটা নিশ্চয় চাইবেন না তিনি।'

'তাহলে আর সময় কাটানো নিয়ে চিন্তা করছ কেন?' কিশোর বলল। একটা ফাইল ঠেলে দিল রবিনের দিকে। 'খবরের কাগজের কাটিং। মল থেকে ফিরে এসে কেটে রেখেছি। মাউনটেইন ইনের আশেপাশের এলাকায় যে সব ডাকাতি হয়েছে, তার রিপোর্ট।'

আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করল রবিন। পড়া শেষ হলে বলল, 'মনে হচ্ছে একই লোকের কাজ।'

'কিংবা দলের,' কিশোর বলল। 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, ডাকাতিগুলো সব সঙ্ঘটিত হয়েছে গত এক মাসে?'

'তারমানে, ডাকাতেরা ওই এলাকায় নতুন,' রবিন বলল।

'সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না। হতেও পারে, না-ও পারে। ওখানে না গিয়ে কিছু বুঝতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আসল অপরাধের আলোচনা আপাতত বাদ। নকল রহস্য তৈরির জন্যে মাথা ঘামানো দরকার।'

পেছনের দুই পায়ের ওপর চেয়ারটাকে কাত করে দোলাতে দোলাতে মুসা বলল, 'জিনাকে তো নিচ্ছ, নাকি?'

'হ্যাঁ, নেব,' জবাব দিল কিশোর। 'ডাকাতির শিকার বানাব ওকে।'

'কি ভাবে?'

'নকল হীরার একটা নেকলেস আছে না ওর, আসল হীরার মত মনে হয় যেটা; সেটাকে কাজে লাগাব।'

'তারমানে ওটাকে চুরি করানো হবে,' মুসা বলল। 'চোরটা হবে কে?'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'তুমি।'

এতটাই চমকে গেল মুসা, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। তারপর কোনমতে বলল, 'আমি!'

'অসুবিধে কি?' মুচকি হাসল কিশোর। 'তোমার ওই দেবদূতের মত নিষ্পাপ চেহারা দেখে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না তুমি চোর হতে পারো। সন্দেহ করবে না কেউ।'

শেষ প্রশ্নটা করল রবিন, 'কিন্তু জিনা কি যেতে রাজি হবে?'

'না হওয়ার কোন কারণ তো আমি দেখছি না,' কিশোর বলল। 'যদি অন্য কোন কাজ তার না থাকে। এত কথার দরকার কি? চলো না, তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক।'

তিন

নির্বিঘ্নেই কেটে গেল পরের তিনটে হপ্তা। জিনার সঙ্গে কথা হয়েছে তিন গোয়েন্দার। তার নেকলেসটা পরীক্ষা করে দেখেছে কিশোর। কাজ হবে এটা দিয়ে। জিনাও যেতে রাজি। যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো ওরা। একটা ভ্যান ভাড়া করা

হলো।
নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করল। দেখতে দেখতে পেছনে মিলিয়ে গেল রকি বীচ। লোকাল রোড ছেড়ে হাইওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা। মাউনটেইন ইনে যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। তারমানে পৌছতে পৌছতে বেলা দুটো।
'হোটেলে ঢুকে গেস্টদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে প্রচুর সময় পাব,' কিশোর বলল।
হেসে বলল জিনা, 'ডিনারের সময় হারটা পরব আমি আজ।'
'পরলেই বা কি,' তেমন উৎসাহ বোধ করল না মুসা। 'আসল হার তো নয়। চুরি করে মজা পাবে না চোর।'
'আসল নয় কি করে জানলে?' ভুরু নাচাল জিনা। 'আসলটাও তো পরতে পারি আমি। ঠিক আছে কিছু?'
'পরলে পস্তাবে। নকল হলে যা-ও বা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আসল হলে একেবারেই নেই।'
'কেন,' মুচকি হাসল রবিন। 'নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে নাকি?'
জবাব দিতে যাচ্ছিল মুসা, বাধা দিল কিশোর, 'থাক থাক, গাড়ি চালানোর সময় কথা বলার দরকার নেই। পাহাড়ী রাস্তায় শেষে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে।'
সকালের দিকে এখন যানবাহনের ভিড় তেমন নেই। ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার গতিবেগে সীমাবদ্ধ রাখল মুসা। দুই পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল তার পাশে বসা কিশোর। পেছনের সীটে একটা বই খুলে বসল রবিন। জিনা ঝিমুনো শুরু করল।
এক ঘণ্টার বেশি কেটে গেল। একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেল কিশোর। ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল।
বই থেকে মুখ তুলল রবিন। 'কি হলো?'
'মনে হয় অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদের!' জবাব দিল কিশোর।
রবিনও ফিরে তাকাল, 'সেই লোকটা নাকি?'
মলের কালো পোশাক পরা লোকটার মতই পোশাক পরা একটা লোক মোটর সাইকেল নিয়ে পেছন পেছন আসছে।
'আধঘন্টা ধরেই দেখছি ওকে,' মুসা জানাল।
'খসানোর চেষ্টা করো,' কিশোর বলল।
সামনে মাথা তুলে রেখেছে পাহাড়-শ্রেণী। পথটা সামনে বাঁক নিয়েছে। ওপাশের কিছু দেখা যায় না। সেটা পার হয়ে আসতে পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল মোটর সাইকেল আরোহী। সামনে হাইওয়ে থেকে নেমে গেছে আরেকটা কাঁচা রাস্তা। ব্যবহার হয় না। ঘাস জন্মে আছে। সেটাতে নেমে পড়ল মুসা। ঘন গাছপালার আড়ালে গাড়ি ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।
মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ চলে যেতে শুনল হাইওয়ে ধরে। পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করে আবার স্টার্ট দিল মুসা। ফিরে এল হাইওয়েতে। সামনে আঁকাবাঁকা পথে দেখা গেল না আর মোটর সাইকেল আরোহীকে।
রাস্তায় ছোট একটা শহরে থেমে ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে খেয়ে নিল ওরা।

তারপর আবার চলল।
পর্বতের ওপরে পৌঁছল ওরা অবশেষে। মুসা বলল, 'চোখ রাখো। সাইনবোর্ডটা দেখা যায় কিনা।'
বলেও সারতে পারল না সে, উজ্জ্বল রঙের একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রাস্তার পাশে। মাউনটেইন ইন-এর বিজ্ঞাপন। ওটা পার হয়ে আসতে কানে এল মোটর সাইকেলের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জে ওঠার শব্দ।
ফিরে তাকাল কিশোর। সাইনবোর্ডের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেই কালো পোশাক পরা লোকটা। ওদেরকে অনুসরণ করল না। উল্টো দিকে চলে গেল। হারিয়ে গেল মোড়ের অন্যপাশে।
পাঁচ মিনিট পর দিক-নির্দেশনা দেখে অন্য একটা পথে গাড়ি ঢোকাল মুসা। দুই পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর, মুসা আর জিনা–হোটেলটা কোথায় আছে দেখার জন্যে।
'ওই যে!' প্রায় একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিনজনে।
গাড়ি থামাল মুসা। নেমে গেল। ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। প্ল্যান মত কাজ করতে হবে এখন থেকে। গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাবে তিনজনে। মুসা আসবে পরে। ভাবটা দেখাবে, যেন ওদের সঙ্গে আসেনি।
লম্বা লম্বা পাথরের থামওয়ালা গেটের ভেতর গাড়ি ঢোকাল কিশোর। খোয়া বিছানো একটা লম্বা গাড়িপথ ধরে এগিয়ে চলল। দুই পাশে গাছের সারি। একটা পাহাড়ের কোল বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পথটা। শেষ হলো এসে হোটেলের কাছে। পুরানো, ভিকটোরিয়ান স্টাইলের একটা বাড়ি। দুই পাশ থেকে ছড়ানো সবুজ লন চলে গেছে কয়েকশো ফুট দূরে, ঢুকে গেছে সীমানা ঘিরে থাকা বনের ভেতরে।
'বাপরে! ভুতুড়ে মনে হচ্ছে!' জিনা বলল।
'মুসার সামনে আর এ কথা বোলো না,' সাবধান করল কিশোর। 'ভয় ধরিয়ে দিলে কাজ করানোই মুশকিল হয়ে যাবে ওকে দিয়ে।'
গেস্টদের জন্যে সংরক্ষিত পার্কিং লটে গাড়ি রাখল কিশোর।
ব্যাগ-সুটকেসগুলো বের করে নিয়ে দ্রুতপায়ে সামনের সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে।
বড় একটা হলঘরে ঢুকল। ওক কাঠের প্যানেলিং করা। বাঁ দিকে ওক কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে।
ডানে, এক সময় যেটা ছোট সিটিং রূম ছিল, এখন সেটা লবি। বাঁয়ে পারলার। দুই জোড়া দম্পতি বসে আছে। সবারই বয়েস তিরিশের কোঠায়।
'ওখানেই মনে হয় নাম লেখাতে হবে,' লবির দিকে ইঙ্গিত করে বলল কিশোর।
ডেস্কের দিকে এগোল ওরা।
লবির একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দেয়াল-সমান পুরানো, একটা আরামদায়ক কাউচ। মুখোমুখি রাখা একটা টেবিলের ওপাশে দুটো আর্মচেয়ার। টেবিলে রাখা একটা রীডিং ল্যাম্প। ঘরের শেষ মাথায় কাউন্টারের সামনে বসে আছে ডেস্ক ক্লার্ক। তার পেছনে ছোট একটা অফিসে বড় একটা ডেস্ক। দেয়ালে ছোট ছোট কয়েক সারি

খোপ। সেগুলোতে চাবি ঝোলানো।

খবরের কাগজ পড়ায় এতটাই মগ্ন ক্লার্ক, গোয়েন্দাদের আগমন লক্ষই করল না। কাছে গিয়ে কিশোর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বলল, 'হাই।'

চমকে গেল লোকটা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত থেকে পড়ে গেল কাগজ।

'সরি, তোমাদের ঢুকতে দেখিনি,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল সে। ছোটখাট, হালকা-পাতলা মানুষ। মাথাজোড়া টাক। সামান্য যে ক'টা চুল রয়েছে, সেগুলোকে লম্বা করে টাকের ওপর যত্ন করে বিছিয়ে রেখেছে। চঞ্চল চোখ দুটো দ্রুত নড়ছে।

পরিচয় দিল কিশোর, 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু রবিন মিলফোর্ড...'

বাধা দিয়ে জিনা বলল, 'আর আমি ওর বোন! জরজিনা মিলফোর্ড! ডাকনাম জিনা।'

মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি এলান উইকেড। মাউনটেইন ইনে স্বাগতম।' কথা বলার সময় অবচেতন ভাবেই বাঁ হাতে একটা রূপার ডলার নিয়ে ঘোরাল টেবিলের ওপর। পয়সা রেখে ডান হাতে লেজার উল্টে সঠিক তারিখে এসে থামল। 'হ্যাঁ, এই যে। দুটো ঘর রিজার্ভ করা আছে তোমাদের নামে। রেজিস্টারে সই করে দাও, আমি তোমাদের চাবি দিয়ে দিচ্ছি।'

ওরা যখন সই করছে, পেছনের ঘর থেকে গিয়ে চাবি বের করে আনল এলান। একটা কিশোরের হাতে, অন্যটা জিনার হাতে দিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা দুজন দুশো সাত নম্বরটা শেয়ার করবে। আর তোমাদের বোনের দুশো ছয়। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' হেসে জবাব দিল কিশোর।

'ভাবলাম, কাছাকাছি থাকতে চাইবে তোমরা,' আন্তরিকতা দেখানোর ভঙ্গি করল এলান। 'সে-জন্যেই এ ভাবে রূম দিলাম।'

লবিতে নিয়ে আসা হলো রবিনকে। দেখেটেখে রবিন বলল, 'বাহ্, সুন্দর তো।'

লবিটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'খুব সুন্দর।'

হাসি ফুটল এলানের মুখে। 'হোটেলের বর্তমান মালিক, মিস্টার বোরম্যান কয়েক বছর আগে হোটেলটা কেনার পর সংস্কার করিয়ে নিয়েছেন। পুরানো পরিবেশ পুরোপুরি বজায় রাখতে চেষ্টা করি আমরা।'

'সত্যিই সুন্দর,' কিশোর বলল। 'মিস্টার বোরম্যান এখন কোথায়?'

'এখানে নেই। ব্যবসার কাজে বাইরে গেছেন।'

বিস্ময় চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'বাইরে গেছেন? আমি তো ভাবলাম, এখানেই পাওয়া যাবে।'

'পরিচয় আছে নাকি তাঁর সঙ্গে?' আগ্রহী মনে হলো এলানকে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা বুঝে ফেলল কিশোর। ওদের সঙ্গে মিস্টার বোরম্যানের আলোচনার খবর নিশ্চয় গোপন রাখা হয়েছে, জানানো হয়নি এলানকে।

প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে বলল, 'না না, পরিচয় আর থাকবে কোত্থেকে। তাঁর কথা উঠল তো ভাবলাম, এখানেই বুঝি আছেন।'

'হুঁ। আমার ধারণা, অ্যানটিক খুঁজতে গেছেন মিস্টার বোরম্যান।'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে সাহায্য করল রবিন, 'আপনাদের এই জায়গাটা সত্যি দারুণ, মিস্টার উইকেড। মনে হচ্ছে, টাইম মেশিনে করে একশো বছর পিছিয়ে চলে এসেছি।'

'হ্যাঁ, এখানে এলে এমনই লাগে,' এলান বলল। 'মাঝে মাঝে রাতের বেলা আমার নিজেরই মনে হয়, অতীতকালে রয়েছি।'

'ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা আছে নাকি এখানে?' জানতে চাইল রবিন।

'না,' ভাবসাব দেখে মনে হলো, নেই বলে যেন দুঃখই হচ্ছে এলানের। 'আস্তাবলটা আর ব্যবহার হয় না আজকাল। তবে একটা গোরস্থান আছে।'

'গো-গো-গোরস্থান?' তোতলানো শুরু করল জিনা। এ সব ব্যাপারে তাকে ভয় পাওয়ার অভিনয় করতে শিখিয়ে এনেছে কিশোর, তার আসল স্বভাবটা যাতে প্রকাশ না পায়। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, হোটেলের সীমানার মধ্যে একটা কবরস্থান আছে, আর সেটার কাছাকাছি রাত কাটাতে হবে আমাকে?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল এলানের ঠোঁটে। 'এসেছ যখন থাকতে তো হবেই। পুরানো পরিবেশ বজায় রাখার জন্যেই এ ব্যবস্থা। আগের দিনে পরিবারের প্রিয়জনদেরকে বাড়ির কাছাকাছি কবর দিত লোকে।'

'বলবেন না, বলবেন না! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার!'

হাসিটা বাড়ল এলানের। বেরিয়ে পড়ল হলুদ দাঁত। 'সত্যি কি তুমি গোরস্থানকে ভয় পাও?'

'আমি পাই না,' কিশোর বলল।

'আমিও না,' সুর মেলাল রবিন।

দুজনের দিকে তাকাল জিনা। 'ভাগ্যিস তোমরা দুজন কাছাকাছি থাকছ। নইলে ভয়েই মরে যেতাম।'

কাউন্টার টপটা তুলে এপাশে বেরিয়ে এল এলান। 'চলো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি। অন্য গেস্টদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।'

ক্লার্কের পিছু পিছু পারলারে বেরিয়ে এল ওরা। সেখানে এখন ছয়জন লোক কথা বলছে।

'এক্সকিউজ মী,' ওদের উদ্দেশ্যে করে বলল এলান, 'এ উইকএন্ডে আরও তিনজন গেস্ট এসেছে আমাদের। এর নাম জিনা। আর এ হলো কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড।'

কাউন্টারে রাখা বেল বাজল। আরেকবার 'এক্সকিউজ মী' বলে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল এলান।

সুন্দরী একটা মেয়ে উঠে দাঁড়াল। বয়েস বিশের কোঠায়। গোয়েন্দাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাই। আমি ইভা ফিফার।'

হাত মেলাল জিনা আর দুই গোয়েন্দা।

বাকি পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ঘুরল মেয়েটা। 'এর নাম ড্রেক্সেল ফিলিপ।'

ফিলিপ যার নাম, সে খাটো, হর্ন-রিমড গ্লাসের ভেতর দিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে

তাকাল। বয়েস ইভার সমান। 'হাই,' বলল সে। 'মিস্ট্রি উইকএন্ডে যোগ দিতে এসেছ তোমরা?' বসে পড়ল আবার।

'হ্যাঁ।' যেন কোন ধারণাই নেই, এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এ সম্পর্কে জানেন নাকি কিছু?'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে যেটুকু পড়েছি। তবে রহস্য আমার ভাল লাগে,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে দুই হাতে হাঁটু ডলতে শুরু করল ফিলিপ। 'রহস্য কাহিনী ছাড়া আর কিছু পড়ি না আমি।' এত দ্রুত কথা বলে সে, অনেক শব্দই স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বাকি দুজন বয়স্ক দম্পতির দিকে ফিরল গোয়েন্দারা। ওরা বেলডেন আর ডকনেস। ইতিমধ্যেই খাতির হয়ে গেছে ওদের। তারমানে ছুটিটা মোটামুটি একসঙ্গেই কাটাবে ওরা।

কিশোররা বসলে ইভা জিজ্ঞেস করল, 'এই মিস্ট্রি উইকএন্ডটা শুরু হচ্ছে কবে? দুপুর বেলা থেকে এসে বসে আছি। এ পর্যন্ত কিছুই তো ঘটল না।'

'হবে হয়তো ছুটির মধ্যেই কোন এক সময়,' রবিন বলল। 'একআধটা অপরাধ ঘটানো হবে। তারপর গেস্টদের বলা হবে সেটার সমাধান করার জন্যে।'

'তাড়াতাড়ি কিছু ঘটলে ভাল হত,' ইভা বলল। 'হাত গুটিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না।'

এই সময় লম্বা, পেশিবহুল, সোনালি চুল এক যুবক গটমট করে ঘরে ঢুকল। বেশ হামবড়া একটা ভাবভঙ্গি। বসে থাকা গেস্টদের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'বাহ্, লোক সমাগম তো ভালই হয়েছে।'

কিশোরের মনে হলো এ রকম একটা চরিত্রের সঙ্গে তারই প্রথমে পরিচয় করে নেয়া উচিত। হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'আমি কিশোর পাশা।'

কিশোরের বাড়ানো হাতটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল যুবক, যেন হাত নয়, সাপ। অবশেষে ধরল হাতটা, যেন কৃপা করল। ঝাঁকি দিল। 'আমি জন। জন ম্যাক্‌করমিক। আমার ধারণা, তথাকথিত ওই মিস্ট্রি উইকএন্ডের জন্যে আগমন ঘটেছে সবারই।'

'আপনি কেন এসেছেন?' পাল্টা প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না রবিন। জনের হামবড়া আচরণে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার।

'আমি এসেছি দেখতে,' কড়া স্বরে জবাব দিল জন, 'গোয়েন্দাগিরি ব্যাপারটা কি জিনিস।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মানে সহজ। আমার ধারণা, রহস্যের কিনারা করাটা কোন ব্যাপারই না। যে কোন আধবোকা লোকও সেটা করে ফেলতে পারে।'

'তাই নিজেকে আধবোকা প্রমাণ করতে এসেছেন?' প্রশ্নটা না করে পারল না রবিন।

হেসে উঠল ফিলিপ। জনের কঠোর দৃষ্টি তার হাসিটা থামিয়ে দিল মাঝপথে। হাঁটুতে হাত বোলাতে শুরু করল ফিলিপ। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সবার কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল জন। 'দেখা যাবে। উইকএন্ড শেষ হতে হতেই জেনে যাব আমরা, কে বেশি চালাক।' তারপর সে-ও ঘুরে দাঁড়িয়ে গট গট করে হাঁটতে শুরু করল ফিলিপের পেছন পেছন।

জিনার দিকে কাত হয়ে মুচকি হেসে বলল রবিন, 'কি বুঝলে? হিরো, না?'

'হ্যাঁ, হিরো,' নাকমুখ কুঁচকে বলল জিনা। 'পচা হিরো।'

এলান উইকেডের কথা মনে পড়ল তার। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার উইকেড কোথায়? আমি আমার ঘরে যাব। জিনিসপত্র খুলতে হবে।'

জাদুমন্ত্রের মত এসে দরজায় উদয় হলো এলান উইকেড। 'এদিক দিয়ে এসো,' জিনাকে বলে গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মিস্টার পেকস! মিস্টার পেকস!'

বিশালদেহী, পেশিবহুল একটা লোক এলানের পাশে এসে দাঁড়াল। 'মিস্টার পেকস আমাদের সিকিউরিটি গার্ড। এ ছাড়াও সব কাজের কাজি। যা করতে বলা হয়, সবই করে। পেকস, আপনি কি এদের ব্যাগগুলো ওপরতলায় দিয়ে আসতে পারবেন?'

'পারব, মিস্টার উইকেড।' বিশাল থাবা দিয়ে আলগোছে দুটো ভারী সুটকেস এমন করে তুলে নিল পেকস, যেন ওগুলো খালি। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদিক দিয়ে।'

তাকে অনুসরণ করল কিশোর, রবিন আর জিনা। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ওরা, সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। তাকে স্বাগত জানাচ্ছে এলান।

'আমি মুসা আমান,' বলল সে। 'এইমাত্র বাসে করে এসে নামলাম।'

'এসো,' এলান বলল। 'রেজিস্টারে সই করো। আমি তোমার চাবি বের করে দিচ্ছি।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। ওদের প্ল্যান মতই সব ঘটছে।

ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলে কাপড়-চোপড় বের করে রাখল দুজনে। তারপর কিশোর বলল, 'গা-টাগুলো সব নোংরা লাগছে। কাপড় বদলানো দরকার।'

সোয়েটারটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল চেয়ারের ওপর। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ভিকটোরিয়ান আমলের। খাট দুটোর ভারী লোহার ফ্রেম। মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে। নিজের খাটে বসে চাপ দিয়ে দেখল কিশোর, গদিটা কতখানি আরাম।

'নরমই,' জানাল সে, 'তবে স্প্রিংগুলো শক্ত।...আরি, এটা কি?' বালিশের ওপর রাখা একটা ছোট বাক্স তুলে নিল সে। 'চকলেট! কে রেখে গেল?'

বিছানায় শুয়ে পড়ে বাক্স বাঁধার সোনালি সুতোটা খুলতে শুরু করল সে। ডালার একপাশ ধরে উঁচু করতে গেল। বেমক্কা টান লেগে কাত হয়ে গেল বাক্সটা। ঝরঝর করে সমস্ত চকলেট পড়ে গেল তার গায়ের ওপর।

এক এক করে আবার চকলেটগুলো সব বাক্সে ভরে রাখতে লাগল সে।

শেষ চকলেটটা তোলার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে, স্থির হয়ে গেল হাতটা।

মাকড়সা!

চার

নিথর হয়ে পড়ে রইল কিশোর। আট পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিম্ভূত রোমশ প্রাণীটা। ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করল বাহু বেয়ে। গলার দিকে আসছে। মাকড়সাটা বিষাক্ত কিনা তা-ও বোঝার উপায় নেই। সামান্যতম নড়াচড়াও এখন তার প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। নড়লেই কামড়াবে।

কিছুই করার নেই তার, শুধু চুপচাপ পড়ে থেকে পেশিগুলোকে যতটা সম্ভব শক্ত করে রাখা; আর মনে মনে দোয়া করা ছাড়া যাতে মাকড়সাটা তাকে না কামড়ে নেমে যায়।

চোখের কোণ দিয়ে বাঁ দিকে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল কিশোর। তারপর সাদা ঝিলিক। তারপর বাতাসের ঝাপটা। ছপাৎ করে একটা শব্দ।

তোয়ালে দিয়ে বাড়ি মেরেছে রবিন। মাকড়সাটাকে ফেলে দিল মেঝেতে। গোল করে পাকানো একটা ম্যাগাজিন দিয়ে বাড়ি মেরে, মেরে ফেলল মাকড়সাটাকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল ভাল করে দেখার জন্যে।

বিছানায় উঠে বসল কিশোর। গত দুই মিনিটের মধ্যে এই প্রথম ভাল করে দম নিল। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম। ইচ্ছে করে কেউ মাকড়সাটা বাক্সে রেখে দিয়েছিল।' নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, 'কে? কেন?'

'হ্যাঁ, কেন?' এক টুকরো কাগজে করে মাকড়সাটাকে তুলে নিল রবিন। 'সাধারণ একটা কালো মাকড়সা। এর মানেটা হলো, ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে স্রেফ আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে।'

কপালের ঘাম মুছল কিশোর। 'এবং কোন সন্দেহ নেই, সফল হয়েছে সে।' হাসল সে। কাঁপা কাঁপা শোনাল হাসিটা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'ভয় যায়নি এখনও?'

সহসা গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'ভয় না, রাগ!' রবিনের কাঁধ চেপে ধরল সে। 'এটা কেবল শুরু। এমন ঘটনা আরও ঘটার সম্ভাবনা আছে। সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু আমরা তো এসেছি একটা ভুয়া অপরাধ ঘটাতে, গেস্টদের বিনোদনের জন্যে।'

'ডাকাতির কথা ভুলে যাচ্ছ,' কিশোর বলল। 'কি বলেছিলেন মিস্টার বোরম্যান? মিস্ট্রি উইকএন্ডের আড়ালে একটা আসল ডাকাতির তদন্ত করতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হয়তো আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাতদের চোখ পড়ে গেছে আমাদের ওপর। আমাদের আসাটা ওদের পছন্দ হচ্ছে না।...কিন্তু ওরা জানল কিভাবে আমরা কে? তা ছাড়া আমাদের আসার আসল উদ্দেশ্যটাও তো এখানে কারও জানার কথা নয়। এমনকি হোটেলের ম্যানেজার এলানকেও জানানো হয়েছে বলে মনে হয় না।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ!'

দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

অবাক হয়ে গেল রবিন। 'কি হলো?'

'জিনা!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের যদি ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে, ওকেও বাদ দেবে না!'

কিশোরের পিছু পিছু দৌড় দিল রবিন। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে জিনার দরজায় থাবা মারতে শুরু করেছে কিশোর।

'জিনা! জিনা!' চিৎকার করে ডাকতে লাগল কিশোর।

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল জিনা। চোখে কৌতূহল। 'কি ব্যাপার?' মোটা টেরি-ক্লথের ঢোলা পোশাকটা ভালমত টেনে দিল গায়ের ওপর।

'ভেতরে আসা যাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'গোসল করতে যাচ্ছিলাম···ঠিক আছে, এসো।'

ঘরে ঢুকে মাকড়সাটার কথা খুলে বলল কিশোর।

'তারমানে পরিস্থিতি বিপজ্জনক,' জিনা বলল।

'হ্যাঁ, সেজন্যেই সাবধান করতে এলাম তোমাকে।···তোমার ঘরটায় খুঁজে দেখা দরকার।'

'সেটা আমি ঢুকেই দেখে ফেলেছি। তোমার সন্দেহ থাকলে আরেকবার দেখতে পারো। আমি শাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল জিনা। বন্ধ করার আগেই বাষ্প মেশানো গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল দুই গোয়েন্দার গায়ে।

'খুব বেশি গরম পানি ব্যবহার করে ও,' মন্তব্য করল কিশোর। সেদিকে আর নজর না দিয়ে খোঁজা শুরু করে দিল।

কয়েক মিনিটেই দেখা শেষ হয়ে গেল দুজনের। কিছু পাওয়া গেল না।

'শাওয়ার বন্ধ করতে কি এতক্ষণ লাগে নাকি?' বাথরুমের দিকে তাকিয়ে ডাকল রবিন। 'জিনা, কি করছ?'

জবাব এল না।

'জিনা?'

এবারেও সাড়া নেই।

দরজার দিকে ছুটে গেল দুই গোয়েন্দা।

লক করা। শাওয়ার বন্ধ করতে ভেতর থেকে লক করা লাগে না! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল রবিন, 'জিনা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

জবাব না পেয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করল রবিন। এত সহজে হার মানল না ভারী ওক কাঠের দরজা। মিনিট তিনেক প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি করার পর অবশেষে খুলে গেল পাল্লা।

বাষ্পে ভরে আছে। অন্ধ হয়ে গেল যেন ওরা। গরম পানির কণা মেশানো ভারী বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শাওয়ারের চারপাশের বাষ্প বেশি ঘন। দেখা যায় না কিছু। নবটার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। গরম পানিতে হাত পুড়ে যাওয়ার অবস্থা।

দু'তিন মোচড়ে নবটা বন্ধ করে দিল সে।

মেঝেতে কুঁকড়ে পড়ে থাকা জিনাকে দেখতে পেল রবিন। টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে এল পানির নিচ থেকে। নব বন্ধ করতেই পানি পড়া কমতে কমতে বন্ধ হয়ে গেল।

জিনার গায়ে টেরি ক্লথের যে পোশাকটা জড়ানো, রবিনের মনে হলো গরম পানি শুষে নিয়ে কুড়ি পাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে ওটার। তবে ওটা গায়ে থাকায় বেঁচে গেছে জিনা, নইলে সরাসরি চামড়ায় লাগত গরম পানি। ধরাধরি করে তুলে এনে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল জিনার। উঠে বসতে গিয়েও ধপ করে পড়ে গেল বিছানায়। 'উফ্, প্রচণ্ড মাথা ঘুরছে,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'বাথরুমের দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল কেউ। আমি দরজা খুলতেই আমার চুল চেপে ধরল একটা হাত। দেয়ালে কপাল ঠুকে দিল। বেহুঁশ হয়ে গেলাম।'

শোনার পর এক মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। আবার দৌড় দিল বাথরুমের দিকে। রবিনও এসে দাঁড়াল তার পেছনে। এখন আগের চেয়ে ভালমত দেখতে পাচ্ছে। শাওয়ার বন্ধ করে দেয়াতে অনেক কমে গেছে বাষ্প। উল্টো দিকে আরেকটা দরজা। পাশের রুমে যে থাকবে, তার জন্যে। এক বাথরুম দুই ঘরের লোক ব্যবহার করে। এই দরজা দিয়েই ঢুকেছে লোকটা। ওটার পাল্লায় থাবা মারতে শুরু করল ওরা। জবাব দিল না কেউ। জোরে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। উঁকি দিল কিশোর। মনে হলো, এটা ইভার ঘর। কিন্তু সে নেই ঘরে। কাপড়-চোপড় যেগুলো পরনে ছিল, বদলানোর পর ফেলে রেখে গেছে বিছানায়।

জিনার ঘরে ফিরে এল দুজনে।

উঠে বসল আবার জিনা। গায়ের কোনখানে পুড়েছে কিনা দেখল। নাহ্, বেঁচে গেছে। বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে ভারী পোশাকটা।

বাড়ি ফিরে যেতে বলল তাকে কিশোর আর রবিন। কিন্তু কোনমতেই রাজি হলো না জিনা। সাফ জানিয়ে দিল, প্রতিশোধ না নিয়ে এই হোটেল থেকে এক পা নড়বে না সে।

জিনার জেদ জানা আছে দুজনের। আর চাপাচাপি না করে ডিনারের জন্যে তাকে পোশাক বদলানোর সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

জিনার ঘর থেকে বেরোতেই পেকসকে চোখে পড়ল কিশোরের। যেন সম্মোহিত হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, কোন কথা না বলে আচমকা ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

পেকের আচরণ সন্দেহজনক। নিজেদের ঘরে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আবার কিছু রেখে গেল কিনা দেখার জন্যে খুঁজতে শুরু করল ঘরে। খাটের নিচে চকচকে একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। টর্চ জ্বেলে দেখল। 'কয়েন মনে হচ্ছে।'

সাবধানে তুলে আনল মুদ্রাটা।

'রূপার ডলার!' অবাক হলো সে। 'এখানে এল কি করে?' রবিনের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

প্রায় একসঙ্গে নামটা বেরিয়ে এল দুজনের মুখ থেকে, 'এলান!'

'বার বার এটা ঘোরাচ্ছিল এলান, মনে আছে?' টেবিলে রেখে নিজেও মুদ্রাটা

ঘোরানো শুরু করল কিশোর।
'এটাই কি সেটা?' রবিনের প্রশ্ন।
'বলা কঠিন। তবে দুর্লভ মুদ্রা। তবে সবার কাছে থাকার কথা নয়।'
'খাটের নিচে গেল কি করে? মাকড়সাটার কথা বলার দরকার নেই। শুধু এটার কথা জিজ্ঞেস করব। দেখব, কি বলে।'
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। তার প্রতিক্রিয়াটা দেখা দরকার।'
অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারে ভিজে গোসল করল দুজনে। কাপড় বদলাল। ডিনারের উপযোগী টাই আর জ্যাকেট পরল। নামার আগে জিনার ঘরে টোকা দিয়ে জেনে এল, আর কোন সমস্যা হয়েছে কিনা। তারপর চকচকে পালিশ করা সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল হলঘরে যাওয়ার জন্যে।
এলান বসে আছে তার নির্ধারিত জায়গায়। কাউন্টারের পেছনে। কাগজ পড়ছে। নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। পদশব্দ ঢেকে দেয় দামী পারসিয়ান কার্পেট।
'শুনছেন?' ডাক দিল কিশোর।
ভীষণ চমকে গিয়ে টুলের ওপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে বসল এলান। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল ছেলেদের দেখে। 'ও, তোমরা! হাঁটার সময় তো একবিন্দু শব্দ হয় না তোমাদের। বিড়াল নাকি!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।
জবাবে মৃদু হাসল দুই গোয়েন্দাও।
'আপনাকে ভড়কে দেয়ার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই,' রবিন বলল। 'কাউকে ভয় দেখানোটা ভাল কথা নয়, সেটা যে কোন ভাবেই হোক।'
রবিনের ইঙ্গিতটা বুঝল কিনা এলান, বোঝা গেল না। অকারণে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল। 'তা, কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?'
পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। মুদ্রাটা বের করে হাতের তালুতে নিয়ে বাড়িয়ে দিল এলানের দিকে। 'আপনার না?'
কুঁচকে গেল এলানের ভুরু। কিশোরের হাত থেকে তুলে নিল মুদ্রাটা। 'আমারই তো মনে হচ্ছে।' নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নিজের পকেট খুঁজে দেখল। পেল না। 'হ্যাঁ, আমারটাই। পেলে কোথায়?'
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এলানের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের ঘরে। আমার খাটের নিচে।'
দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এলানকে। 'তোমাদের খাটের নিচে গেল কি করে!' মুদ্রাটা ঘোরানো শুরু করল কাউন্টারের ওপর। 'তবে···তোমাদের রুম চেক যখন করতে গিয়েছিলাম, তখন কোনভাবে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই বা কিভাবে···'
'অন্য কেউ নিয়ে ফেলে আসেনি তো?'
'তা আমি কি করে বলি, বলো? কাউন্টারের ওপর ভুলে ফেলে রেখে যাই অনেক সময়···কিন্তু কে নেবে? আর তোমাদের ঘরেই বা ফেলে আসবে কেন?'
প্রশ্নগুলো কিশোরেরও।
'রুম চেক করতে যান কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
হাসল এলান। 'ডিউটি। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে আসি কাজের বুয়াটা সব

ঠিকমত করেছে কিনা। কাজে ফাঁকি দেয়া ওর স্বভাব। ভুলেও যায়। সাবান দিতে মনে থাকে না, তোয়ালে বদলে দেয়ার কথা বললে গায়ে জ্বর আসে…'

'আর চকলেট দিতে বললে?' এলানের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না কিশোর।

'হ্যাঁ, চকলেট নিয়েও একই কাণ্ড করে। প্রায়ই দিতে ভুলে যায়। তোমাদেরগুলো পেয়েছ?'

'পেয়েছি,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আমারটা খুলেওছিলাম। কিন্তু একটা চকলেট গায়েব। তার জায়গায় পাওয়া গেল একটা মাকড়সা। মাকড়সাটা বোধহয় খুব ক্ষুধার্ত ছিল। চকলেটটা খেয়ে ফেলেছে।'

আরও জোরে মুদ্রাটা ঘোরাতে শুরু করল এলান। 'মাকড়সা! কিসের মাকড়সা?'

'আট পাওলা জ্যান্ত মাকড়সা! যেগুলো কিলবিল করে চলে!' এলানের নির্বিকার ভঙ্গি রাগিয়ে দিল রবিনকে।

মুদ্রা ঘোরানো বন্ধ করল এলান। ঘটনাটাকে এতক্ষণে গুরুত্ব দিল মনে হচ্ছে। 'ভালমত শোনা যাক। চকলেটের বাক্সে জ্যান্ত মাকড়সা ঢুকে বসে ছিল। এই তো বলতে চাও?'

দুজনেই মাথা ঝাঁকাল।

'তো এতে অবাক হওয়ার কি আছে?' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল যেন এলান। 'ফ্যাক্টরিতে প্যাক করার সময়ই ঢুকে পড়েছে। কত কিছুই তো ঢোকে। মাছি, মশা, পিঁপড়ে…'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, আপনি যতখানি বলছেন, ততখানি ঢোকে না। তাহলে আর ব্যবসা করে খেতে হত না কোম্পানিগুলোর। তা ছাড়া আরও একটা ব্যপার, এত সময় বাক্সে আটকে থাকলে বাঁচত না মাকড়সাটা।'

'কি জানি! সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না,' জবাব দিল এলান। 'ভাল দোকান থেকে ভাল কোম্পানির জিনিস কিনে আনি। তবে ঘটনাটার জন্যে আমি দুঃখিত, আমার হোটেলেই তো ঘটল। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, বাক্সে গেল কিভাবে ওটা!'

টোকা দিয়ে মুদ্রাটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল এলান। লুফে নিল। পর পর দুবার। তৃতীয়বারে আর ধরতে পারল না। পড়ে গেল মাটিতে। কার্পেট নেই ওখানে। টুং করে শব্দ হলো। তুলে নেয়ার জন্যে নিচু হলো।

'তাহলে কি ধরে নেব,' কিশোর বলল, 'প্রকৃতির এটাও আরেকটা বিচিত্র খেয়াল, মিস্টার উইকেড?'

মুদ্রাটা তুলে নিয়ে সোজা হলো এলান। 'কোনটা?'

'মাকড়সাটা। বাক্সে ঢুকে এতকাল বেঁচে থাকল কি করে?'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই!' মুখে হাসি ফোটাল এলান। 'পোকা-মাকড়েরা বড় বিস্ময়কর প্রাণী। এমন সব জায়গায় থেকেও বেঁচে যায়…'

কথা শেষ না করেই টেবিলে মুদ্রা ঘোরানো শুরু করে দিল এলান।

ধূর, এর সঙ্গে কে কথা বলে! বিরক্ত লাগল কিশোরের। আর কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। রবিনকে নিয়ে সরে এল।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কয়েনটা এলান ফেলে আসেনি,' জবাব দিল রবিন। 'অন্য কেউ নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছে, এলানের ওপর সন্দেহ জাগানোর জন্যে।'

*

পারলারে বসে অন্য গেস্টদের সঙ্গে আলাপ করছে দুজনে, এই সময় ডিনারের ঘোষণা দেয়া হলো। হোটেলের পেছনের অংশে নিয়ে আসা হলো ওদের। রান্নাঘরের লাগোয়া খাবার ঘর।

প্লেস কার্ড বিতরণ করা হলো টেবিলে। রেখে দেয়া হলো একটা করে চেয়ারের সামনে। প্রতিটা কার্ডে নাম লেখা। কে কোনখানে বসবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের নাম দেখে বসে পড়ল রবিন আর কিশোর। ওদের পাশের একটা খালি চেয়ারের সামনে জিনার নাম লেখা। পরিকল্পনা মাফিক সামান্য দেরি করে আসবে জিনা। যাতে সব গেস্টদের চোখে পড়ে তার নকল হীরার হারটা।

'এখন পর্যন্ত তো সব ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

খাবার সরবরাহ শুরু করেছে ওয়েইট্রেস, এই সময় এসে হাজির হলো জিনা। 'সরি, দেরি করে ফেললাম। কোনমতেই হারটার হুক লাগাতে পারছিলাম না।'

সবার চোখ ঘুরে গেছে তার দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্রেক্সেল ফিলিপ। ভদ্রতা করে টেনে দিল জিনার চেয়ারটা।

হারটা দেখে ইভার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। দ্রুত চোখ নামাল খাবারের দিকে। একমাত্র জন ম্যাক্‌করমিক কোন রকম গুরুত্ব দিল না হারটাকে, জিনার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। যেন ভাল করে তাকালে নিজের ওজন, 'হামবড়া' জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কারও দিকে তাকানোর চেয়ে উল্টো দিকের আয়নায় নিজের চেহারা দেখার প্রতিই তার নজর বেশি। অতিরিক্ত অহঙ্কারী লোক—মনে হলো রবিনের।

'থ্যাংক ইউ, ফিলিপ,' একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিল তাকে জিনা। 'আপনি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক।' রবিন আর কিশোরকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার ভাই কিংবা তার বন্ধুটির মত নয়।'

রবিন বলল, 'এই হারটা পরে আসা উচিত হয়নি তোমার। মা কত করে মানা করল, শুনলে না।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল জিনা। 'হীরার হার কেন কেনে মানুষ? পরার জন্যেই তো, না বাড়িতে আলমারিতে রেখে দিয়ে আসার জন্যে?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার খাওয়ায় মন দিল।

হঠাৎ গলা চেপে ধরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'উহ্, মরে গেলাম! শ্বাস নিতে পারছি না আমি!'

পাঁচ

চোখের পলকে কিশোরকে মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে, মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে শুরু করল রবিন। জিনা ছুটল ডাক্তারকে ফোন করতে। নম্বরটা পেল টেবিলে রাখা তার নামের কার্ডে।

দ্রুত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করাতে অবস্থার উন্নতি হলো কিশোরের। ডাক্তার এসে পৌঁছতে-পৌঁছতে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল তার। ডাক্তারের অনুরোধে কিশোরকে ধরাধরি করে পারলারে বয়ে নিয়ে এল জন আর রবিন। জন ডাইনিং রুমে ফিরে গেল।

কিশোরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কিছু প্রশ্ন করার পর ডাক্তার জেনসেন বললেন, 'সাধারণ অ্যাজমা অ্যাটাক বলে মনে হচ্ছে আমার।'

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো রবিনকে।

উঠে বসল কিশোর। 'অ্যাজমা! কই, ধরার আগে তো কোন লক্ষণই বুঝলাম না।'

'সব সময় যে জানান দিয়ে রোগ আসবে, তার কোন ঠিক নেই। অনেক কিছু থেকেই শুরু হতে পারে এটা। এমন কি এক টুকরো পনির থেকেও। কেমন লেগেছিল, বলো তো শুনি?'

মাথা নেড়ে আবার শুয়ে পড়ল কিশোর। 'হঠাৎ করেই মনে হলো, আমার গলনালীটা আটকে গেল।'

অবাক মনে হলো ডাক্তারকে। 'ইমারজেন্সিতে যাবে? কয়েকটা টেস্ট করানো দরকার।'

রাজি হলো না কিশোর। 'না না, দরকার নেই। আর এখন খারাপ লাগছে না আমার। থ্যাংক ইউ।'

ব্যাগ বন্ধ করলেন ডাক্তার। হাসলেন। 'আমারও মনে হচ্ছে, আপাতত সেরে গেছে তোমার। আবার যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে।'

বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। পেছনে পারলারের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'আমার খাবারে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল।'

একমত হলো রবিন। 'হ্যাঁ, খাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তো একেবারে সুস্থ দেখলাম। মেশালে শুধু তোমার খাবারেই মিশিয়েছে। আমার তো কিছু হলো না।'

'এক ধরনের ওষুধ আছে, জানি, খাবারে মেশালে কণ্ঠনালীতে বাধা সৃষ্টি করে, মনে হয় অ্যাজমার আক্রমণ।'

'যেটা খেয়ে হলো, একটুও রাখোনি প্লেটে,' রবিন বলল। 'থাকলে পরীক্ষা করে দেখা যেত।'

সোফায় উঠে বসল কিশোর। 'কে বলল রাখিনি? সব তো খাইনি আমি! কি হলো বাকিটার?'

ভারী দম ফেলল রবিন। 'গোলমালের মধ্যে নিশ্চয় তোমার প্লেট থেকে সব

সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল,' কিশোর বলল, 'খাবারে ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি খাওয়ার পর সরিয়ে ফেলেছে, যাতে কেউ কিছু প্রমাণ করতে না পারে।'

ঠিক এই সময়, ঘরে ঢুকল মুসা। অপরিচিতের ভান করল। 'হাই, আমি মুসা আমান। তোমার কাণ্ড দেখে তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। এখন কেমন আছ?'

মুসা তাকে না চেনার ভান করলেও, ঘাবড়ে যাওয়ার কথাটা যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতক্ষণ নিশ্চয় অস্থির হয়ে ছিল সে, কি হয়েছে জানার জন্যে। ডাক্তারকে বেরোতে দেখে চলে এসেছে।

কিশোর হাসল। 'এখন ভাল। আমার নাম কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড।'

কে কোন্‌খান থেকে কান পেতে আছে, জানা নেই, তাই সাবধান রইল কিশোর। সে-ও অপরিচিতের ভান করে রইল।

'কোন সাহায্য দরকার হলে কোন রকম সঙ্কোচ না করে জানাবে আমাকে,' মুসা বলল। 'আমার খাওয়া শেষ হয়নি। ডাইনিং রূমে যাই। আসবে নাকি তোমরা?'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'খাবে কিছু? ইচ্ছে আছে?'

'নাহ্, খিদে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তা তো হবেই। কিন্তু তাই বলে পেট খালি রাখাটাও ঠিক নয়। এখন আর কেউ কোন ওষুধ মেশাবে বলে মনে হয় না।'

ভারী দম নিল কিশোর। 'তা ঠিক। চলো। সাবধান থাকতে হবে আরকি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একের পর এক যে ভাবে আক্রমণ আসছে।'

ডাইনিং রূমে ফিরে এল ওরা। বাকি গেস্টদের খাওয়া তখন শেষ পর্যায়ে। আর কেউ কিশোরের মত অসুস্থ হয়নি। সে এখন ভাল আছে, সবাইকে এ কথাটা জানিয়ে রবিনের পাশে বসে পড়ল কিশোর।

'যাক, ভাল আছ শুনে শান্তি পাচ্ছি,' জিনা বলল।

তার সঙ্গে একমত হয়ে সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল অন্য গেস্টরা। দ্রুত গিয়ে খাবার নিয়ে এল ওয়েইট্রেস।

খাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান রইল কিশোর আর রবিন। খাচ্ছে, আর একই সঙ্গে নজর রাখছে গেস্টদের ওপর। কারও কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা বুঝতে চাইছে।

একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে ড্রেক্সেল ফিলিপ। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। খেতে খেতে বই পড়ছে, রহস্য গল্প।

খাওয়া শেষ করে ফিলিপ উঠে চলে যাওয়ার পর নিচু স্বরে রবিনকে বলল কিশোর, 'হয় সে ভদ্রতা জানে না, নয় তো রহস্য গল্পের পোকা।'

হাসল রবিন। 'অভদ্র তো মনে হয়নি প্রথম থেকে। আসলে, রহস্য কাহিনী নিয়ে সে তার নিজের জগতে থাকতেই ভালবাসে।'

খাওয়া শেষ করে পারলারে বসল তিন গোয়েন্দা, অন্য গেস্টদের সঙ্গে। টেলিভিশন খুলে দেয়া হয়েছে। জন আর ইভা পাশাপাশি বসে একটা পুরানো ছবি দেখছে। বয়স্করা বেশিক্ষণ থাকল না। যার যার ঘরে চলে গেল বিশ্রাম নিতে।

কয়েক মিনিট দেখার পর কিশোর বলল, 'সারাটা দিন বহু ধকল গেছে। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। ঘরে গিয়ে ঘুমাইগে।'

মুখ বাঁকাল ইভা। 'ধূর, কিসের মিস্ট্রি উইকএন্ড। রহস্য যা দেখতে পেলাম, শুধু টেলিভিশনে।'

'সময় হোক,' কিশোর বলল, 'দেখা যাবে ঠিকই জটিল এক রহস্য এসে হাজির হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ বলেছে যখন করবে, কিছু একটা ব্যবস্থা করবেই।'

'করে ফেললেই ভাল হত,' নাক টেনে খোঁত-খোঁত শব্দ করল ইভা। 'আমার এখন রীতিমত বিরক্ত লাগছে।'

'কি আশা করেছিলে তুমি?' জন বলল, 'আলমারি থেকে ধমাধম লাশ পড়তে থাকবে! জেলপালানো কোন খুনী জেল থেকে পালিয়ে এসে ঘটাচ্ছে সে-সব হত্যাকাণ্ড, এ ধরনের কিছু?'

'কি জানি। তবে কিছু একটা ঘটুক, সেটা চেয়েছিলাম। এ ভাবে নিরামিষ বসে থাকা নয়।'

কিশোর বলল, 'টাকা যখন নিয়েছে, কিছু একটা করবেই ওরা, আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই তাতে। কি ঘটবে কিছুই আপনি জানেন না। সেটাও একটা রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না আপনার?'

কিশোরের কথাটা ভেবে দেখল ইভা। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে, অস্বীকার করছি না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখাটাও একটা রহস্য।'

হাসল কিশোর। 'তারমানে ধরে নেয়া কি যায় না যে রহস্যটা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই? আমার মতে কি ঘটবে, সেটা আসল কথা নয়; কখন ঘটবে, সেটাই হলো আসল।'

আর কোন কথা না বলে 'গুড নাইট' জানিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর। তার সঙ্গে চলল রবিন।

ঘরে এসে জ্যাকেটটা খুলে ঝুলিয়ে রাখল কিশোর। 'আসল মজাটা শুরু হবে কাল থেকে, যখন জিনার হারটা গায়েব হয়ে যাবে। কিভাবে সবাই ওটার দিকে তাকাচ্ছিল, লক্ষ করেছ? ডাইনিং রুমে মোমের আলোয় একেবারে আসল মনে হচ্ছিল জিনিসটাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'নাটকের শুরুটা মন্দ হয়নি...'

কথা শেষ হলো না তার। হলওয়ে থেকে শোনা গেল মহিলাকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'জিনা নাকি!' বলেই দরজার দিকে দৌড় দিল রবিন।

ছুটে হলে বেরিয়ে এল সে আর কিশোর। জিনা নয়, ইভা। নিজের ঘরের দরজার সামনে থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। কিশোরদের দেখে দৌড়ে এল ওদের দিকে।

'কে যেন ঢুকে বসে আছে আমার ঘরে!' ফিসফিস করে বলল সে।

'সত্যি?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে এখন ইভার কণ্ঠ। 'তালা খুলে দরজায় ঠেলা দিতেই দেখি কে যেন ঘোরাফেরা করছে ঘরের মধ্যে জানালার ধারে।'

'চলুন, দেখছি। আপনি আমাদের পেছনে থাকুন,' সাবধান করল কিশোর। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট থাকায় পুরোপুরি নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে পারল ইভার ঘরের দিকে। ঘর অন্ধকার। অস্পষ্ট ভাবে লোকটার নড়াচড়া দেখেই চিৎকার করে সরে এসেছিল ইভা, আলো জ্বালানোর আর সময় পায়নি।

দরজার পাশে একটা সেকেন্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকল দুই গোয়েন্দা। তারপর আস্তে করে একপাশে সরে সুইচ বোর্ডের জন্যে হাত বাড়াল কিশোর। টিপে দিল সুইচ। ঘরে ঢুকল।

খালি! কেউ নেই। তবে ইভার ঘরটা তছনছ করে দিয়ে গেছে। ড্রেসারের ড্রয়ার টেনে নামানো। জিনিসপত্র সব মেঝেতে ছড়ানো। সুটকেসটা খুলে উপুড় করে সমস্ত জিনিস ঢেলে দিয়েছে বিছানার ওপর।

'এখন তো কাউকে দেখছি না,' রবিন বলল। 'তবে দেখে মনে হচ্ছে, ছোটখাট একটা টর্নেডো আঘাত হেনেছিল এ ঘরে।'

'এবং খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিল লোকটা,' কিশোর বলল। 'আপনি তালায় চাবি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গিয়েছিল সে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। মুখে এখনও হাত চাপা। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অবশেষে বলল, 'আ-আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'জিনিসপত্রগুলো খুঁজে দেখুন,' কিশোর বলল, 'কিছু খোয়া গেছে কিনা। আমি আর রবিন সূত্র খুঁজছি।'

খুঁজতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল ইভা, 'হায় হায়, আমার এত দামের ঘড়িটা গেছে!...ক্যামেরাটাও নেই!'

তার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'ভাল করে দেখেছেন তো?'

'ড্রেসারের ওপরই রেখেছিলাম। নেই। তারমানে নিয়ে গেছে।'

বিছানার কিনারে বসে কাঁদতে শুরু করল ইভা।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তার কাঁধে হাত রাখল কিশোর। 'ভাববেন না, চোরটাকে খুঁজে বের করবই আমরা। আপনার জিনিসগুলোও ফিরিয়ে আনব।'

বাথরুম থেকে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কিশোর, দেখে যাও! জলদি!'

ছুটে গেল কিশোর।

বাথটাবের কিনারে বসে কি যেন দেখছে রবিন। 'পায়ের ছাপ। টাবের নিচে।'

ঝুঁকে বসে ছাপগুলো ভালমত দেখতে লাগল কিশোর। 'রাবার সোলের জুতো। তলার ডিজাইনটা দেখো, গোল কাঁটা কাঁটা। ছাপটা সে-জন্যেই ঝাঁঝরির মত লাগছে।'

টাবের ওপর দিকে হাত তুলল রবিন। 'জানালাটাও খোলা।'

'তারমানে ওই পথেই পালিয়েছে চোর।'

'কিন্তু এটা তো দোতলা। নিচে নামল কি করে?'

'দেখো জানালা দিয়ে উঁকি মেরে। পাইপ-টাইপ নিশ্চয় দেখতে পাবে।'

জানালার চৌকাঠের কাছে উঠে বাইরে উঁকি দিল রবিন। অন্ধকার। তবে বাথরুমের আলো বাইরে যেটুকু গেছে, তাতেই দেখতে পেল পাইপটা। সেটা বেয়ে চোরের নামার সময় দেয়ালে যে পায়ের ছাপ পড়েছে তা-ও চোখে পড়ল।

'জলদি চলো, নিচতলায়,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

তার পেছন পেছন দৌড়ে হলে বেরিয়ে এল রবিন। ইভা তার ঘরে রয়ে গেল জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্যে।

বিল্ডিঙের সামনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা। পাশ দিয়ে ঘুরে চলল ইভার বাথরূমের নিচে। পাইপটার কাছাকাছি এসে থেমে গেল কিশোর। 'সাবধানে পা ফেলো। ছাপ থাকলে যেন নষ্ট না হয়।'

'যা অন্ধকার,' রবিন বলল, 'কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।'

'এক মিনিট,' পকেট থেকে পেন-টর্চ বের করল কিশোর। 'ওই দেখো!' ড্রেনপাইপের নিচে নরম মাটিতে জুতোর ছাপ। 'প্যাটার্নটা দেখো। একই রকম। ঝাঁঝরির মত।'

শিস দিয়ে উঠল রবিন। 'এসেছিলাম একটা নকল অপরাধ করতে, কিন্তু জড়িয়ে গেলাম আসল অপরাধের সঙ্গে।'

'তা তো জড়াবই। আসল ডাকাতরা কাছেপিঠে আছে নিশ্চয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রহস্যটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হোটেলের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে থেমে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, ঠিকপথেই এগোচ্ছে কিনা বোঝার জন্যে।

হঠাৎ কাছেই একটা ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ শোনা গেল।

'কথা বোলো না!' রবিনকে সাবধান করে একটানে তাকে সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। টর্চটা পকেটে রেখে দিল। 'কেউ আছে ওখানে!'

জড়াজড়ি করে থাকা ডালপালার ভেতর থেকে হঠাৎ একটা মূর্তি লাফিয়ে বেরিয়ে দৌড় দিল সামনের দিকে।

পিছু নিল দুই গোয়েন্দা। পাতাবাহারের ঝোপ আর ফুলের বেড ডিঙিয়ে লোকটার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে লোকটাকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে রাখতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

'পার্কিং লটের দিকে যাচ্ছে!' পাশাপাশি ছুটতে থাকা রবিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল কিশোর।

গতি আরও বাড়িয়ে দিল দুজনে। ছুটন্ত মূর্তি আর দুজনের মাঝের দূরত্ব খানিকটা কমিয়েও আনল। দ্রুত পার্কিং লট পার হয়ে বনে ঢুকে পড়ল মূর্তিটা।

'ওকে পালাতে দেয়া চলবে না!' আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর। পরিশ্রমের কারণে ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। পায়ের পেশিতে টান লাগছে। কিন্তু গতি কমাল না ওরা। মনের জোরে গায়ের শক্তি বাড়িয়ে ছুটে ঢুকে পড়ল অন্ধকার বনের মধ্যে। গাছপালার আড়ালে লোকটা হারিয়ে যাওয়ার আগেই কাছে পৌঁছে গেল তার।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল কিশোর। একই সঙ্গে দুই হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। ধরে ফেলল ছুটন্ত মূর্তিটার পা। হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। তার আগেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে লোকটা। পা উঁচু করে প্রচণ্ড এক লাথি মারল কিশোরের কাঁধে। পেছনের গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল

কিশোর। বুঝতে পারল, খালি হাতের মারপিটে ওস্তাদ লোকটা। অত সহজে তাকে কাবু করা যাবে না।

ছয়

একে দৌড়ে আসার পরিশ্রম, তার ওপর এ রকম একটা আঘাত–সহ্য করতে কষ্ট হলো কিশোরের। দম আটকে এল। শ্বাস নিতে পারছে না। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, আরেকটা লাথি ছুটে আসছে। কিন্তু গায়ে লাগার আগের মুহূর্তে কোনমতে সরে গেল সে। লাথিটা লাগতে দিল না। তবে সরতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, আর মারার সুযোগ দিল না প্রতিপক্ষকে। কারাতের মার কমবেশি তারও জানা। হাতের আঙুলগুলো সোজা করে দা চালানোর মত করে মেরে দিল লোকটার চোয়ালের নিচে।

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ায় কিশোরকে সাহায্য করতে পারছে না রবিন। কাকে মারতে গিয়ে কাকে মেরে বসে, এই ভয়ে। তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে গেল। মূর্তিটাকে পেছন থেকে জাপটে ধরতে এল। লাভ তো কিছু হলোই না, কনুইয়ের প্রচণ্ড এক গুঁতো খেল পেটে।

একটা মুহূর্তের জন্যে দুজনেরই মনে হলো, মূর্তিটাকে পাকড়াও করা আর হলো না। কিশোরকে আঘাত করতে তৈরি হয়েছে আবার সে। খানিক দূর থেকে মাথা নিচু করে ছুটে আসতে লাগল। সুযোগ দিল না কিশোর। চোখের পলকে পাশে সরে গিয়ে একটা পা বাড়িয়ে দিল সামনে। পায়ে পা বেধে ধুড়ুস করে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল লোকটা। রবিন আর কিশোর দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ঘাসের মধ্যে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি শুরু করল তিনজনে। হাত আর পা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে সমানে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কিল-ঘুসি মেরে কাবু করার প্রচেষ্টা। অবশেষে দুদিক থেকে দুই হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এসে লোকটাকে আটকে ফেলল দুই গোয়েন্দা। টেনে তুলল মাটি থেকে। তারপর ঠেলে নিয়ে চলল পার্কিং লটের আলোর দিকে। সেখানে এনে একটা গাড়ির গায়ে ঠেসে ধরে সামনের দিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল।

'ফিলিপ!' চিৎকার করে উঠল রবিন। এ রকম একজন হাড্ডিসার লোকের গায়ে এমন জোর, কল্পনাই করতে পারেনি সে।

'হুঁ,' কঠিন স্বরে কিশোর বলল, 'এবার আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।'

'কিসের প্রশ্ন?' রেগে উঠল ফিলিপ। 'আমি তো ভাবছি, প্রশ্নের জবাবটা তোমাদেরই দেয়া প্রয়োজন।'

'যদি কিছু মনে না করেন,' খানিকটা ব্যঙ্গের স্বরেই বলল রবিন, 'জবাবগুলো আপনিই আগে দেয়া শুরু করুন। নইলে কপালে খারাবি আছে। প্রথম প্রশ্ন, ইভার ঘরে কি করছিলেন আপনি? তার ঘড়ি আর ক্যামেরা চুরি করেছেন কেন?'

'কি বলছ তোমরা?' বুঝতে পারছে না যেন ফিলিপ।

'ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।
'আর আমাদের দেখে দৌড়েই বা পালাচ্ছিলেন কেন?' রবিনের প্রশ্ন।
'তোমরাই বা তাড়া করলে কেন আমাকে?' ফিলিপ বলল, 'আমি কিছু করিনি। জগিং করতে বেরিয়েছিলাম। হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, এ সময় চোখে পড়ল হোটেল থেকে বেরিয়ে মাটিতে চোখ বোলাতে বোলাতে এগিয়ে যাচ্ছে দুটো ছায়ামূর্তি। ডাক দিতে গিয়েও দিলাম না। মনে হলো, এরা যদি চোর হয়? পিছু নেয়ার ভাবনাটাও নাকচ করে দিলাম। মনে হলো, কি দরকার, শুধু শুধু ঝামেলায় জড়ানোর। নিঃশব্দে সরে পড়তেই চেয়েছিলাম। আবার মনে হলো, দেখিই না মূর্তি দুটো কি করে? লুকিয়ে পড়লাম একটা ঝোপের মধ্যে। তারপর বুঝলাম, তোমরা। তোমাদেরকে আসতে দেখে নড়েচড়ে বসতে গিয়ে শব্দ করে ফেললাম। শুনে ফেললে। ভয় পেয়ে গিয়ে উঠে দিলাম দৌড়। ভেবেছিলাম, তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু দৌড়ানোয় তোমরা যে আমার ওস্তাদ, কল্পনাই করিনি।' এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে বলল ফিলিপ, 'তারপর, তোমরা যখন ধরে ফেললে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করলাম। কারাতের ট্রেনিং আছে আমার, বুঝেছ নিশ্চয়।'
'অবশ্যই,' কাঁধের ব্যথাটার কথা এতক্ষণে মনে পড়ল কিশোরের। আহত জায়গাটা ডলতে শুরু করল সে।
'নিজেকে নিরপরাধ বলছেন,' রবিন বলল। 'অথচ, যে ফাইটটা দিলেন, সাংঘাতিক!'
'ফাইট দিলেই কি মানুষ নিরপরাধ হয় না?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফিলিপ। 'এ রকম একটা পরিস্থিতিতে পড়লে তোমরা কি করতে? আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে না? তা ছাড়া আমি যদি চোরই হই, তাহলে চোরাই মালগুলো কোথায়? খুঁজে দেখতে পারো আমার পকেট-টকেট সব।'
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এ কথাটা অবশ্য ঠিক। মালগুলো নেই তার কাছে।'
'অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে হয়তো,' ফিলিপের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও কিশোর। 'পরে তুলে নিয়ে আসবে।'
ফিলিপ বলল, 'আমার আচরণ দেখে অবশ্য এ ধরনের কিছু ভাবাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাদের আরেকটা তথ্য দিতে পারি। ভেবে দেখো, তাতে কোন সুবিধে হয় কিনা। তোমরা হোটেল থেকে বেরোনোর আগে আরেকজন লোককে দেখেছি, হোটেলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে পালাল।'
চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'তাই নাকি? চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'
জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ফিলিপ। 'জানতাম, বললেই এ প্রশ্নটা করবে। না, চেহারার বর্ণনা দিতে পারব না। এত অন্ধকারে কি আর কাউকে চেনা যায়। তবে আমার চেয়ে শরীরটা তার অনেক বড়, এটুকু বলতে পারি।'
'এখানে দাঁড়ান। যাবেন না।'
'যাব না।' বলে বিশ্রাম নেয়ার ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিল ফিলিপ।
কথা বলার জন্যে রবিনকে ডেকে দূরে নিয়ে গেল কিশোর।

'কি মনে হচ্ছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চালাকি করছে না তো?' রবিন বলল, 'মিথ্যে কথা বলে ধাপ্পা দিয়ে তার ওপর থেকে আমাদের সন্দেহ দূর করার জন্যে? আরেকজন লোককে দৌড়ে পালাতে দেখেছে, এ কথাটা সত্যি না-ও হতে পারে।'

'তা ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'আর ওই নিরীহ ভঙ্গি করে রাখাটাও একটা চালাকি হতে পারে।' এক মুহূর্ত থেমে বড় করে দম নিল সে। 'আবার, তার কথা সত্যিও হতে পারে। কোনটা বিশ্বাস করব?'

দুজনেই ফিরে তাকাল ফিলিপের দিকে। একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের অপেক্ষা করছে সে।

'সত্যি বলছে কিনা জানার একটাই উপায়,' কিশোর বলল। 'চলো।'

ফিলিপের কাছে ফিরে এল দুজনে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে আদেশ দিল কিশোর, 'দেখি, পা তুলুন তো?'

দ্বিধা করতে লাগল ফিলিপ। 'কেন?'

'যা বলা হচ্ছে করুন,' হুমকি দিল রবিন, 'যদি ভাল চান তো। পা তুলুন। নিশ্চয় কোন কঠিন কাজ না সেটা।'

'না, তুলব না,' বলে দিল ফিলিপ। 'কারণ তোলার কোন যুক্তি দেখছি না আমি।'

দ্বিধা করতে লাগল সে। অবশেষে দুই গোয়েন্দার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, যা করতে বলছে ওরা সেটা করাই ভাল। ধীরে ধীরে ডান পা'টা উঁচু করল সে।

'আরও ওপরে,' কিশোর বলল। 'আলোর দিকে তুলে ধরুন জুতোর তলা।'

যা করতে বলা হলো, করল ফিলিপ। হালকা হলুদ আলোয় এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার জুতোর তলা। প্রমাণ যা দরকার, পেয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

ফিলিপের জুতোর তলায় গোল গোল অসংখ্য কাঁটা।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর আর রবিন। তারপর তাকাল আবার ফিলিপের দিকে।

'আরও অনেক প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে, ফিলিপ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর।

অবাক মনে হলো ফিলিপকে। 'কি বলতে চাও?'

'ইভার বাথরূমে পাওয়া জুতোর ছাপের সঙ্গে আপনার জুতোর তলার হুবহু মিল,' কিশোর বলল।

'তার জানালার নিচের ছাপও একই রকম,' রবিন বলল। 'কেন এ রকম হলো, নিশ্চয় বোঝাতে পারবেন আমাদের?'

'প্রথম কথা, এ ধরনের রাবার সোলওয়ালা জুতো হরদম ব্যবহার করে লোকে, দৌড়ানোর জন্যে,' দমল না ফিলিপ। 'তাতে প্রমাণ হয় না আমার জুতোর ছাপই দেখেছ তোমরা। একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, আমি ঢুকিনি ইভার ঘরে। জানালার নিচেও যাইনি।'

'এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন!' রবিন বলল।

'করা না করা তোমাদের ইচ্ছে!'

ফিলিপের হাত ধরে টান দিল কিশোর। 'বেশ, আসুন আমাদের সঙ্গে। আর একটা জিনিস চেক করতে হবে। যদি সেটা থেকে বাঁচতে পারেন, তাহলে আপনি মুক্ত।'

ফিলিপকে নিয়ে বাথরুমের জানালার নিচে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল কিশোর। ম্লান হলুদ আলোয় মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছাপগুলো। ফিলিপকে ডাকল, 'দেখি, আসুন তো, ছাপের ওপর আপনার জুতো রাখুন।'

ডান পা তুলে একটা ছাপের ওপর রাখল ফিলিপ।

চোরের রেখে যাওয়া ছাপ ফিলিপের জুতোর চেয়ে বড়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফিলিপ। 'আমি তোমাদের বলেছি, যে লোকটাকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি, তার শরীর আমার চেয়ে বড়।'

হতাশ হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। আসল চোরটা এখনও মুক্তই রয়ে গেছে।

সাত

শনিবার দিন সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ল রবিন আর কিশোর। অন্য গেস্টরা উঠে পড়ার আগেই নিজেদের পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করে দিতে হবে।

দ্রুত কাপড় পরে নিল ওরা। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পা রাখল হলে। কাউকে দেখতে পেল না।

'পরিস্থিতি ভালই মনে হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রবিন।

হাসল কিশোর। 'বেশি ভোরের পাখি খাবার খুঁজে পায় সহজে। আর আমরা সহজে রেখে আসতে পারব সূত্র।'

সামান্যতম শব্দ না করে লম্বা সিঁড়িটা বেয়ে নেমে এল দুজনে। লবিতে পৌঁছে খুশি হলো, যখন দেখল এলান উইকেড তার জায়গায় নেই।

বাইরে বেরিয়ে ভ্যানে চাপল। রওনা হলো কাছের গ্রামটার মলে। গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। গেস্টদের লিস্ট বের করে খতিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর।

'কি মনে হচ্ছে তোমার, রবিন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন ব্যাপারে?'

'এই, গেস্টদের স্বভাব-চরিত্র?'

'জন ম্যাককরমিক সারাক্ষণ চিউয়িং গাম চিবায়। ওটা কোন ব্র্যান্ডের, জেনে নিয়েছি আমি। ট্রিপল মিন্ট। এক প্যাকেট ওই গাম কিনে নিতে পারি আমরা,' রবিন বলল।

'কেনা যাবে,' কিশোর বলল। 'ইভা কি পারফিউম ব্যবহার করে, জিনা আমাকে জানিয়েছে। রুবেন।'

'রুবেন?' হাসল রবিন। 'তারমানে এমন একটা জিনিস ব্যবহার করে ইভা, যেটার গন্ধ স্যান্ডউইচের মত? মুসার খুব পছন্দ হবে।'

রবিনের রসিকতায় হেসে উঠল কিশোর। 'যাই হোক, জিনা বলেছে, যে কোন ড্রাগস্টোর থেকে ওই জিনিস কিনে নিতে পারব আমরা।'

'ড্রেক্সেল ফিলিপের সন্দেহ ফেলার জন্যে কি করা যায়?'

ভেবে বলল রবিন, 'সারাক্ষণ পেপারব্যাক বই পড়ে সে। রহস্য কাহিনী। কালি দিয়ে বইয়ের মলাটের ভেতরের দিকে নিজের নাম লিখে রাখে, দেখেছি। ভাবছি, পড়ার কথা বলে একটা বই তার কাছ থেকে নিয়ে সূত্র হিসেবে ফেলে রাখব নাকি?'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'আর কারও ওপর সন্দেহ ফেলার দরকার অছে? কি মনে হয়? নাকি তিনজনই যথেষ্ট?'

'বেশি লোক হলে জটিলতা বেড়ে যাবে না?'

'তা যাবে।'

মলের একটা ড্রাগস্টোরের সামনে এনে গাড়ি রাখল রবিন। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনতে সময় লাগল না। ফিরে এসে আবার উঠল গাড়িতে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিনলাম তো। রাখব কোথায় এ সব সূত্র?'

'জিনার ঘরে,' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'লাঞ্চের সময় ঘর থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরোবে জিনা। বলবে তার হারটা চুরি হয়ে গেছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রবিন। 'তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। গেস্টরা যাতে আবার ভেবে না অবাক হয়–নাস্তার সময় কোথায় ছিলাম আমরা?'

আলোচনা করতে করতে চলল ওরা।

'দারুণ হবে!' কিশোর বলল। 'হঠাৎ করেই একে অন্যকে সন্দেহ শুরু করে দেবে ওরা।'

'মুসাকে সন্দেহভাজন করার জন্যেও তো কিছু রাখা উচিত,' রবিন বলল। 'কারণ সে-ই তো হবে আসল চোর…'

'রাখব,' কিশোর বলল।

'কি?'

'এক প্যাকেট চকলেট।'

'কিন্তু এত সব সূত্র আবিষ্কার করতে যাচ্ছে কে?'

'গেস্টদের মধ্যে যার বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি। গোয়েন্দাগিরিতে যার আগ্রহ আছে। ওদেরকে রহস্য সমাধানের কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের তদন্ত শুরু করে দেব। ভুয়া রহস্যের জন্যে এতই ব্যস্ত হয়ে গেছি আমরা, আসলটার দিকে নজরই দিতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, তখন তদন্ত করলেই ভাল হবে। সবাই ভাববে, জিনার হার খুঁজছি আমরা। কিন্তু আমরা আসলে খুঁজব ইভার ক্যামেরা আর ঘড়ি।' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'কিশোর, একটা কথা। যদি রহস্যটার সমাধান করতে না পারে গেস্টরা?'

'তাহলে তাদের হয়ে আমরা সেটা করে দেব,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে, গেস্টদের কেউ করতে পারলেই ভাল হয়। মজাটা বাড়বে। যদি দেখি, খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে ফেলতে যাচ্ছে কেউ, উইকএন্ড শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই,

নতুন করে সূত্র রোপন করব আমরা। তাতে করে পানিটা ঘোলা থাকবে বেশি সময়। আমরাও নির্বিঘ্নে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারব।'

ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি। হোটেলের সামনে এনে থামাল রবিন।

ওদের স্বাগত জানাতে লবি থেকে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এলান। 'এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কয়েকটা জরুরী জিনিস কিনতে,' জবাব দিল রবিন।

হাসল এলান। 'হ্যাঁ, টুরিস্টদের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যখন তখন বেরিয়ে পড়ে স্যুভনির কিনতে।'

'আপনি কি করে জানলেন, এত ভোরে বেরিয়েছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সব ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হয় আমাকে,' ভোঁতা কণ্ঠে জবাব দিল এলান। 'হোটেলের সব খবরা-খবর রাখা আমার দায়িত্ব। চোখ এড়ালে চলবে কেন?'

'সে তো বটেই।' হেসে এলানের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর।

রবিনও ঢুকল। কিনে আনা জিনিসগুলো ঘরে রেখে আসতে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোল। কিশোর চলল ডাইনিং রুমে। অর্ধেক পথ গিয়েই থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার উইকেড, মিস্টার বোরম্যান কি ফিরেছেন?'

হেসে জবাব দিল এলান, 'না, এখনও শহরে। এ উইকএন্ডে আর আসবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

*

নাস্তার পর নিজেদের ঘরে ফিরে এল কিশোর আর রবিন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর চুপচাপ আবার বেরিয়ে গিয়ে টোকা দিল জিনার দরজায়। সাবধানে খুলে দিল জিনা। ফিসফিস করে বলল, 'ঢুকে পড়ো জলদি!'

কিন্তু সবার অলক্ষে ঢুকতে পারল না দুই গোয়েন্দা। ঢুকে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কিশোর দেখতে পেল, তার রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে জন।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে জানাল কিশোর, 'জন আমাদের ঢুকতে দেখেছে।'

গুরুত্ব দিল না রবিন। 'তাতে কি? ও জানে, জিনা আমার বোন। বোনের ঘরে ঢুকব, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

সাথে করে আনা ব্যাগটা খুলল কিশোর। জিনাকে বোঝাতে লাগল, কিভাবে কি করতে হবে তার।

'দারুণ!' কিশোরের কথা শেষ হলে বলল জিনা।

তিনজনে মিলে সেট সাজানো শুরু করে দিল। সাজানো হয়ে গেলে কিশোর বলল, 'চলো এবার নিচে যাই। ফিলিপের ব্যবস্থা করা দরকার।'

লবি ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় ফিলিপকে পারলারে দেখতে পেল ওরা। বই পড়ছে। পাশ কেটে চলে এল ওরা। বসার ঘরে ঢুকে কিশোরকে বলল রবিন, 'ওকে ওখান থেকে সরানোর চেষ্টা করো, যাতে বইটা নিতে পারি।'

'ধার নিতে ওকে সরাতে হবে কেন?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'আসলে চুরিই করতে হবে,' রবিন বলল। 'ধার চাইলে দেবে বলে মনে হয়

না। তা ছাড়া তাকে জানিয়ে নিলে পরে যখন বইটা পাওয়া যাবে জিনার ঘরে, কি জবাব দেব?'

'তা ঠিক। যাচ্ছি আমি।'

পারলারে এসে, ভেতরে উঁকি দিয়ে কিশোর বলল, 'ফিলিপ, এক মিনিট। একটু আসবেন? আপনার সঙ্গে কথা আছে।

অবাক মনে হলো ফিলিপকে। 'আমার সঙ্গে?' বইটা বন্ধ করে টেবিলে রেখে তাড়াহুড়ো করে উঠে এল সে।

'চলুন, পায়ের ছাপগুলো দেখে আসি আরেকবার,' কিশোর বলল। 'হয়তো জরুরী কিছু আছে ওখানে, কাল রাতে অন্ধকারে চোখে পড়েনি।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ফিলিপ। 'কি আর থাকবে? জুতোর ছাপও তো দেখা হলো। আমার পায়ের চেয়ে বড় মাপের। ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি। ভয় পাবেন না। আপনাকে আর সন্দেহ করছি না আমরা। আসুন।'

ফিলিপকে নিয়ে কিশোর বেরিয়ে যেতেই ঢুকে পড়ল রবিন। বইটা চট করে তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ইভাকে দেখতে পেল এ সময়। দৌড়ে এসে হলওয়েতে ঢুকল আবার রবিন। 'হাই, ইভা!' কথা বলে বুঝতে চাইল, তাকে পারলারে ঢুকতে দেখে ফেলেছে কিনা ইভা।

ফিরে তাকাল ইভা। সন্দেহ দেখা দিল চোখে। 'কি ব্যাপার? খুব একটা ব্যস্ত সকাল কাটাচ্ছ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, খুব ব্যস্ত,' জানাল রবিন। 'ভোর বেলা উঠেই গাঁয়ের মলে গিয়েছিলাম আমি আর কিশোর, বাজার করতে। আপনার কেমন লাগছে আজকে?'

হাসল ইভা। 'ভাল। মনে হচ্ছে, আমাদের মিস্ট্রি উইকএন্ড শুরুই হয়ে গেল।'

অবাক হলো রবিন। ওদের কাজকর্ম দেখে সন্দেহ করতে আরম্ভ করল নাকি ইভা? 'শুরু হয়ে গেল মানে?'

'হলো না? কাল রাতে আমার ঘর থেকেই শুরুটা হলো,' ইভা বলল। 'আমার ক্যামেরা আর ঘড়ি চুরি দিয়ে রহস্যের উদ্বোধন হলো। ভাল লাগছে আমার। দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি। পরের ঘটনাটা কি ঘটে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

বেরিয়ে গেল ইভা। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন, পেছন থেকে কিশোর এসে যখন ডাকল তাকে, ভীষণ চমকে গেল। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেছে কিশোর, তাই দেখতে পায়নি।

'ওর ঘরে যে সত্যি সত্যি ডাকাতি হয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করছে না ইভা,' কিশোরকে জানাল রবিন।

ফুসফুস খালি করে বাতাস ছাড়ল কিশোর। 'তুমি হলে করতে, মিস্ট্রি উইকএন্ডে মজা করতে এসে যদি দেখতে তোমার ঘরে ডাকাতি হয়েছে? ইভা যা করেছে, ঠিকই করেছে। তাতে আসল চোরটাকে ধরতে আমাদের সুবিধে হবে।'

'ফিলিপ কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'বাইরে রেখে এসেছি। ঘড়ি-চোরের সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। আন্তরিক ভাবেই সাহায্য করতে চাইছে সে।'

'কে জানে! হয়তো জরুরী কোন সূত্র আবিষ্কারও করে ফেলতে পারে।'
শেষ সূত্রটা রোপণ করার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। ফিরে এসে যখন ভেতরে ঢুকল আবার, পারলারে জন আর ইভার কথা কানে এল।
'ওই ছেলেগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি,' জন বলছে।
'আমিও না,' ইভার কণ্ঠ। 'ভোর বেলা বেরিয়ে যেতে দেখেছি ওদের। আর সব সময় কেমন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। নিরীহ ভালমানুষ লোকেরা কখনও ওরকম করে না।'
মাথা ঝাঁকাল জন। 'হ্যাঁ। ওদের আচরণ সত্যি সন্দেহজনক। নাস্তার পর জিনার ঘরে ঢুকেছিল চোরের মত। এমন ভঙ্গি করছিল, যেন ওদের ওপর নজর রাখছে কেউ। ভুয়া রহস্যের আড়ালে আসল ডাকাতির পরিকল্পনা যেটা করা হয়েছে, আমার ধারণা তার সঙ্গে জড়িত এই ছেলেগুলো।'
'তাই!' চমকে গেল মনে হলো ইভাকে দেখে। 'এটা তো ভাবিনি। তাহলে কি আমার জিনিসগুলো ওরাই চুরি করল?'
'করাটা কি অস্বাভাবিক?' জনের কথার ভঙ্গিতে মনে হলো, ইভাকে উস্কে দিচ্ছে সে।
নীরব হাসিতে ভরে গেল কিশোরের মুখ। 'যাক, এ রকম সন্দেহ করতে থাকা ভাল। রহস্যটা জমবে।'
'আমি ঘরে যাচ্ছি,' কিশোরকে বলল রবিন। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল দোতলায়।
সরু হলওয়ে ধরে সিঁড়ির দিকে প্রায় দৌড়ে চলল সে। নিজেদের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। অবাক কাণ্ড! তালাটা কি না লাগিয়ে চলে গিয়েছিল! কানে এল শিসের শব্দ। কাজের বুয়াটাকে দেখতে পেল হলের একপ্রান্তে। হাসল রবিন। হতে পারে, ঘর পরিষ্কার করার পর তালাটা লাগাতে ভুলে গেছে মহিলা।
আঙুলের মাথা দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে ভেতরে পা রাখল রবিন। পরক্ষণে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল তার মাথায়। তীব্র ব্যথা বিস্ফোরিত হলো মগজে। লাফ দিয়ে চোখের সামনে উঠে আসতে শুরু করল মেঝেটা।

আট

ঘড়ি দেখল মুসা। দুই হাতের তালু ঘষতে শুরু করল আনন্দে। 'দুপুর হয়ে গেছে। দশ মিনিটের মধ্যেই খাবার দেবে।'
'জিনারও অভিনয় করার সময় এসে গেছে,' খাবারের প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'কিন্তু রবিন আসতে এত দেরি করছে কেন? গেল এক মিনিটের কথা বলে, দশ মিনিট হয়ে যাচ্ছে। নামতে দেখেছ ওকে?'
'নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা। 'গিয়ে দেখে আসব?'
'উঁহু। আমি যাচ্ছি।' রবিনের বিপদের আশঙ্কায় পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরল কিশোরের। ঘন ঘন শ্বাস নিতে শুরু করল, স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার জন্যে। রওনা

দিল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকেই ২০৭ নম্বর ঘরের দরজাটা খোলা দেখতে পেল। দৌড়ে ঢুকতে গিয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল রবিনের পড়ে থাকা দেহটায় হোঁচট খেয়ে।

রবিনের শার্টের লেখাটা দেখে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল কিশোরের। ম্যাজিক মার্কার দিয়ে লেখা রয়েছে: বাঁচতে চাইলে বাড়ি যাও!

গুঙিয়ে উঠল রবিন। নড়েচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করল।

'উঠো না, উঠো না!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

'কিন্তু বসলেই ভাল লাগবে,' রবিন বলল। 'দেখি, ধরো আমাকে। উঠি।'

'বেশ। তবে আস্তে আস্তে। তাড়াহুড়ো কোরো না।' রবিনের হাত ধরল কিশোর। 'মনে হচ্ছে মাথার পেছনে বাড়ি মেরে কেউ বেহুঁশ করে ফেলেছিল তোমাকে। কে মেরেছে, দেখেছ?'

'না। ঘরে ঢুকে চোখের সামনে তারা ফোটা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। তারপর তোমার মুখ,' চোখ মিটমিট করল রবিন।

'হুঁ!' রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর। 'নাও, ওঠো।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। বলল, 'আমি যে আক্রান্ত হয়েছি, কারও কাছে বোলো না কিন্তু। লাঞ্চের টেবিলে হামলাকারী থেকে থাকলে, আমার প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে তাকে মজা পেতে দেব না।'

'নাকি ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নেবে?'

'না। শুয়ে থাকতে পারব না।' শার্টটা বদলে নিল রবিন। তারপর কিশোরের সঙ্গে নিচে নেমে এল। ডাইনিং রূমে সব গেস্টরাই আছে, কেবল জিনা বাদে। যার যার সীটে বসে পড়ল কিশোর আর রবিন। উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে ইভা।

'অবশেষে শুরু হলো আমাদের মিস্ট্রি উইকএন্ড,' বলছে সে। 'কাল রাতে আমার ঘর থেকে আমার ক্যামেরা আর ঘড়িটা চুরি গেল। সে রহস্যের সমাধান এখন করতে হবে।'

'কি করে জানলেন আপনি, ওটা আসল চুরি নয়?' জিজ্ঞেস করল ফিলিপ। 'এই তো, খানিক আগে আমার নাকের ডগা থেকে আমার একটা বই কে জানি মেরে দিল!'

'বই আর কে চুরি করবে। হয়তো পড়তে নিয়েছে কেউ। মনে করেছে, বইটা এই হোটেলের। গেস্টদের পড়ার জন্যে রেখেছে।'

খরখর করে উঠল ফিলিপ। 'তা কি করে হয়? বইয়ের মলাটে পরিষ্কার করে আমার নাম লেখা রয়েছে।'

'তাহলে ফেরত পাবে, ধরে নিতে পারো,' হাত নেড়ে এমন করে বলল ইভা, যেন পাত্তাই দিল না ব্যাপারটাকে।

রেগে গেল ফিলিপ। কারও দিকে আর না তাকিয়ে খাওয়ায় মন দিল।

'যাই হোক,' ইভা বলল, 'এখন থেকে আমাদের সূত্র খোঁজা শুরু করে দেয়া উচিত। কিশোর আর রবিন কিছু কিছু নাকি পেয়েও গেছে ইতিমধ্যে।'

কেশে উঠল কিশোর। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। কয়েকটা পায়ের ছাপ।' ছাপগুলো

দেখতে কেমন, তা বলল না, কারণ সেটা আসল ডাকাতির সূত্র।

এই সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল জিনা। বিধ্বস্ত লাগছে তাকে। 'আমার হারটা চুরি হয়ে গেছে! নানীর দেয়া হীরার হার…মা আর আস্ত রাখবে না!'

তাকে বসতে সাহায্য করল কিশোর। শান্ত হতে বলল। তারপর বলল, 'জিনা, ঘরে সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ তো? অন্য কোথাও রাখনি? তুমি তো আবার রেখেটেখে ভুলে যাও।'

রাগ করে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। 'তাই বলে আমার নানীর দেয়া জিনিসের কথা ভুলব? তুমি আমাকে কি মনে করো? অ্যানটিক জিনিস ওটা। কয়েক হাজার ডলার দাম হবে।'

'তখনই বলেছিলাম, সঙ্গে আনার দরকার নেই, শুনলে না,' রবিন বলল। 'কোথায় রেখেছিলে?'

'ড্রেসারের ড্রয়ারে। সকালেও ছিল। কয়েকটা মোজার নিচে একটা বাক্সে ভরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বাইরে থেকে ফিরে দেখি ঘরের দরজা খোলা। ড্রয়ার খুলে মোজাগুলো সহ জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে রেখেছে মেঝেতে। কেবল হারটা নেই!' দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল সে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ইভা। 'দারুণ! দারুণ! জমে উঠেছে রহস্য। একটার বদলে দুটো রহস্যের সমাধান করতে হবে এখন আমাদেরকে।'

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল জিনা। 'আপনি বলতে চাইছেন আসল ডাকাতি নয় এটা?'

'অবশ্যই না!' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে ইভার চোখ। 'সব সাজানো রহস্য। আমাদের সমাধানের জন্যে। সুতরাং আর দেরি না করে কাজে লেগে পড়া উচিত।'

কিশোর আর রবিনের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নোয়াল। ইঙ্গিতে বোঝাল, তাদের পরিকল্পনা কাজে লাগতে যাচ্ছে।

যার যার প্লেটের খাবারগুলো গপ্‌গপ্ করে গিলে নিল সবাই। তারপর রওনা হলো জিনার ঘরে, তদন্ত করার জন্যে। গেস্টদের গোয়েন্দাগিরি দেখে মনে মনে হাসতে লাগল কিশোর আর রবিন।

জিনার ঘরে ঢুকে সূত্র খুঁজতে শুরু করল ওরা।

'কেউ কিছু ধরবেন না,' সাবধান করল কিশোর। 'কোন সূত্র পেলে যেখানকারটা সেখানেই রেখে দেবেন। কোন চিহ্ন নষ্ট করা চলবে না। বলা যায় না, এটা আসল ডাকাতিও হতে পারে।'

'সত্যি?' খুব উৎসাহী মনে হলো ফিলিপকে।

'এ এলাকায় বেশ কিছু হোটেল-ডাকাতি হয়ে গেছে,' জানাল রবিন। 'ডাকাতেরা এই মিস্ট্রি উইকএন্ডের সুযোগে আসল ডাকাতিও করে বসতে পারে।'

মুখ তুলল জন। 'ঠিক এই কথাটাই ইভাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আমি। কয়েকজনকে সন্দেহও করছি।'

'তাই নাকি?' কিশোরের প্রশ্ন। 'কারা?'

'এখন বলব না। আগে প্রমাণ জোগাড় করে নিই, তারপর।'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

'আরে, দেখো কি পেয়েছি!' একটা ট্রিপল মিন্ট চিউয়িং গামের মোড়ক তুলে ধরল ফিলিপ। 'এ জিনিস আগে কারও চোখে পড়েছে?'

জন বলল, 'এত জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। এটা আর কে না দেখে।'

সন্দেহ দেখা দিল ফিলিপের চোখে। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এখানে কেবল আপনাকেই এ জিনিস চিবুতে দেখা যায়। বিচ্ছিরি ভাবে চিবান আপনি, পিচ্চি পোলাপানের মত মুখ থেকে বের করেন আর ভরেন, ঘেণ্না লাগতে থাকে।'

'ট্রিপল মিন্ট চিবাই, তো কি হলো?' পাল্টা আক্রমণ করল জন। 'তাতেই প্রমাণিত হয় না, আমি হারটা চুরি করেছি।'

'তাহলে এই মোড়ক জিনার ঘরে এল কি করে?' ছাড়ল না ফিলিপ। 'জিনা, তুমি জনকে তোমার ঘরে দাওয়াত দিয়েছিলে?'

'নাহ্, তা দিতে যাব কেন?' কর্কশ স্বরে জবাব দিল জিনা। 'চিনিই না ভালমত।'

একটা অ্যাশট্রে তুলে ধরল ফিলিপ। 'দেখো, অ্যাশট্রের মধ্যে গাম ফেলেছে! কি নোংরা স্বভাব!'

ভয়ানক রেগে গেল জন। 'দেখো, খোঁচা মারা কথা আমি একদম সইতে পারি না! আর একটা কথা বললে ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব বলে দিলাম!'

হাসল ফিলিপ, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

হাসি ঠেকাতে কষ্ট হলো কিশোর আর রবিনের। ওরা জানে, হাড়সর্বস্ব, ছোটখাটো ফিলিপের ক্ষমতা।

ঘুসি মারল না জন। বরং পিছিয়ে গেল। 'এ ঘরে কখনই ঢুকিনি আমি! ওই জিনিস কেউ রেখে গেছে এখানে, আমাকে চোর বানানোর জন্যে।'

'তা ঠিক,' দুজনকে থামানোর জন্যে মধ্যস্থতা করতে এল মুসা। 'জিনিস তো চুরি করেছেই, অন্যের ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে নানা রকম সূত্রও রেখে গেছে চোরটা। আমাদেরকে বিপদে ফেলার জন্যে।'

ফিলিপ আর জনের ঝগড়া বন্ধ হতেই আবার গোয়েন্দাগিরিতে মন দিল গেস্টরা। আচমকা মুসার কাপড় খামচে ধরে তাকে আলমারির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল জিনা। 'ওদিকে কি? আমার জিনিসপত্র ঘাঁটতে যাচ্ছ কেন?'

'সূত্র খুঁজতে যাচ্ছি, আর কিছু না,' জিনার অভিনয় বুঝতে পারল মুসা।

'না, আমার জিনিসপত্রে কেউ হাত দিতে পারবে না,' ধমকে উঠল জিনা। কাপড়ের হ্যাঙ্গারগুলো নিয়ে র‍্যাকে ঠেসে ভরতে শুরু করল সে। স্থির হয়ে গেল হঠাৎ। নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কোটটা টেনে বের করে এনে সেটা শুঁকে দেখল।

'পারফিউমের গন্ধ!' বিমূঢ় ভঙ্গিতে বলল সে। 'কিন্তু এ গন্ধ তো আমার পারফিউমের না!'

'দেখি তো,' হাত বাড়িয়ে কোটটা নিয়ে শুঁকে দেখল জন। 'এ তো চেনা গন্ধ! ইভা ব্যবহার করে।'

চিৎকার করে উঠল ইভা, 'কি-ক্কি বলছ!'

ইভার দিকে কোটটা বাড়িয়ে ধরল জন, 'নিজেই শুঁকে দেখো। দেখো, চিনতে

পারো কিনা। এখানে একমাত্র তুমিই এই পারফিউম ব্যবহার করো।'
কোটটা নিয়ে শুঁকতে শুরু করল ইভা। 'এ তো রুবেন।'
কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়াল জিনা। 'আমি ভুলেও রুবেন ব্যবহার করি না। ইভা, আপনি আমার ঘরে ঢুকে আমার কোট পরেছিলেন!'
এগিয়ে এল ফিলিপ। 'ঠিক। এখানে আর কি কি করেছিলেন আপনি? জিনার নানীর হারটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে?'
'পাগল নাকি লোকগুলো! কি বলে!' পিছিয়ে গেল ইভা। মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার ঠেকানোর চেষ্টা করল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, এক মিনিট! আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন না...'
'ভাবছি!' তার দিকে আরেক পা এগিয়ে গেল ফিলিপ। 'কাল রাতে আপনার ঘরের চুরির ব্যাপারটাও নিশ্চয় মিথ্যে, আপনার সাজানো নাটক। যেন আপনিও ডাকাতির শিকার। আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলেন। বাহ্, চালাকিটা কিন্তু ভালই করেছিলেন। তবে সবার চোখে ধুলো দেয়ার মত নয়।'
মনে মনে হাসল কিশোর। একটা রহস্য কাহিনীতে গোয়েন্দার বলা সংলাপ মেরে দিয়েছে ফিলিপ।
ফিলিপের কথায় রীতিমত চুপসে গেল ইভা। 'কি বলেন না বলেন! আমি ওকাজ করতে যাব কেন? সত্যি সত্যি আমার ঘরে চুরি হয়েছে। কিশোর আর রবিন জানে। ঘরে ঢুকে দেখেছে ওরা।'
ভুরু ওপরে উঠে গেল জনের। 'তাই নাকি? ঘরে ঢুকেছিল?'
'আমার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছিল ওরা,' জবাব দিল ইভা।
'তাতে প্রমাণটা কি হয়? কি করে জানছি, ওরাই চোর নয়?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জন।
'আমি...জানি না,' জবাব খুঁজে পাচ্ছে না ইভা। 'কোন্‌টা বিশ্বাস করব আর কোন্‌টা করব না, নিজেই বুঝতে পারছি না এখন।'
কিশোর বলল, 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সবাই আমরা এখন সন্দেহভাজন।'
তার কথায় সুর মেলাল রবিন, 'হ্যাঁ। এবং চোর এ ঘরেই রয়েছে। আমাদের মধ্যেই কোনও একজন।'
'সেটা আপনিও হতে পারেন,' ফিলিপের দিকে আঙুল তুলল জিনা। 'কাল রাতে ইভার ঘরে চুরি হওয়ার পর আপনাকে জানালার নিচে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি আমি। ওখানে কি করছিলেন?'
বিব্রত মনে হলো ফিলিপকে। 'আমি?...রাতে আমি জগিং করতে বেরোই। রোজ অন্তত এক মাইল দৌড়াই। কাল রাতে খাওয়ার পর দৌড়াতেই বেরিয়েছিলাম।'
তার পক্ষে সাক্ষ্য দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছে ও। কাল রাতে ওর সঙ্গে আমাদেরও দেখা হয়েছিল। দৌড়াতেই বেরিয়েছিল।'
'তাই নাকি?' বাঁকা চোখে তাকাল জন। 'এ রকম যে কেউ বলতে পারে দৌড়াতে বেরিয়েছিল। কি করে জানব, সেটা সত্যি? তা ছাড়া তোমরা তিনজনই যে এতে জড়িত নও, তাই বা জানছি কি করে? তিনজনে মিলে প্ল্যান করেই ডাকাতিটা

করেছ…'

'হয়েছে, থামুন,' হাত তুলে বাধা দিল কিশোর, 'প্রমাণ ছাড়া এ ভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকলে কোন সমাধানেই পৌছতে পারব না আমরা।'

'ঠিক,' একমত হলো ইভা। 'মাউনটেইন ইন যদি এ খেলার পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে ওদেরও কোন কর্মচারী এতে জড়িত রয়েছে।'

'মিস্টার এলান উইকেডের মত কেউ,' ফিলিপ বলল। 'কিংবা মিস্টার পেকস।'

'পেকসকে দেখলে তাই মনে হয়,' জিনা বলল, 'তাকে দিয়ে সব সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল ইভা, 'একবিন্দু বিশ্বাস হয় না আমার লোকটাকে।'

হাসি চাপতে কষ্ট হলো কিশোরের। যা আশা করেছিল, তার চেয়ে ভালভাবে এগোচ্ছে খেলাটা। একে অন্যকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে গেস্টরা। হোটেলের কর্মচারীরাও আর এখন বাদ পড়ছে না।

ইভাকে কোণঠাসা করার জন্যে জিনা বলল, 'হোটেলের কর্মচারী এতে জড়িত থাকুক বা না থাকুক, তাতেও প্রমাণ হয় না, আপনি এ ঘরে ঢুকে আমার কোট পরার চেষ্টা করেননি।'

মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারল না ইভা। চিৎকার করে উঠল সে, 'তোমার ঘরে আমি ঢুকিনি! আর তোমার ওই পচা কোটটার ধারে-কাছেও যাইনি!'

ঝগড়াঝাঁটিতে জিনাও কম যায় না, 'পচা কোট নয় এটা! দামী বলেই লোভ সামলাতে পারেননি…'

'আরে থামো, থামো!' রবিন বলল। 'কি শুরু করলে?'

'আমাকে চোর বলার কোন অধিকার নেই মেয়েটার!' ইভা বলল।

'আপনিই বা মেজাজ খারাপ করছেন কেন?' রবিন বলল। 'এ তো একটা খেলা। মজা।'

লজ্জা পেল ইভা। 'সরি! কিন্তু এটা খেলা, না আসল, কি করে জানব? কোন্‌টা বিশ্বাস করব, সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

হাসল কিশোর। 'কালকে না একঘেয়েমি কাটছে না বলে খুব বিরক্ত লাগছিল আপনার? এখন কেমন লাগছে?'

লাল হয়ে গেল ইভা। 'সাংঘাতিক!'

'এই উত্তেজনাটার জন্যেই এসেছি আমরা।'

'টাকাটা উসুল হচ্ছে এখন,' ইভা বলল।

জিনা বলল, 'আপনাদের তদন্ত যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, দয়া করে এখন গেলে খুশি হব।'

'তা তো যাবই। থাকতে কি আর এসেছি,' সবার পরে দরজার দিকে রওনা দিল জন।

'আপনার কথাবার্তাগুলো ভাল শোনাচ্ছে না, জন,' রবিন বলল।

'তোমার এত লাগে কেন?' ছ্যাঁৎ করে উঠল জন।

'লাগবে না? ও আমার বোন।'

'হুঁ…' বিড়বিড় করে আরও কি কি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জন।

সবাই যাতে শুনতে পায়, সেজন্যে গলা চড়িয়ে জিনাকে বকতে শুরু করল

রবিন, 'আমি বুঝতে পারছি না, কেন মা'র কথা অমান্য করে হারটা তুমি আনলে! মা যে কি বকাটা বকবে, দেখো।'

হলওয়েতে শেষ পদশব্দটাও মিলিয়ে গেলে ফিসফিস করে জিনা বলল, 'কেমন অভিনয়টা করলাম?'

'দারুণ! তুলনা হয় না!' রবিন বলল। 'সব ক'টার মধ্যে বাধিয়ে দিয়েছি। কেউ আর কাউকে বিশ্বাস করবে না।'

এই সময় দৌড়ে এল এলান। দরজায় উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পেকসকে দেখেছ?' তীক্ষ্ণ, চড়া কণ্ঠ তার।

'পেকস?' জবাব দিল কিশোর। 'না তো। শেষবার দেখেছি নিচতলায়।'

'তাকে আমার জরুরী দরকার!' চিৎকার করে উঠল এলান। বেজির মত চোখ দুটো অস্বস্তিতে চঞ্চল। 'আমাদের অফিসের সেফ ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে গেছে সব!'

নয়

সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে এলান, সঙ্গে কিশোর আর রবিন; এ সময় দেখা গেল পেকসকে। দৌড়ে উঠে আসছে। 'কি হয়েছে, মিস্টার উইকেড?'

'ডাকাতি। অফিসের আলমারিতে!' বিশালদেহী লোকটার কাঁধ খামচে ধরে তার চোখের দিকে তাকাল এলান। 'তালা ভেঙে টাকা-পয়সা আর গেস্টদের দামী দামী যা জমা রেখেছিল আমার কাছে, সব নিয়ে গেছে!'

একটা কথাও আর না বলে ঘুরে দৌড় মারল পেকস। এত বড় শরীরের একজন মানুষ এ ভাবে দৌড়াতে পারে, না দেখলে ভাবা যায় না। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা আর এলান।

লবি পার হয়ে এসে ছোট অফিস ঘরটায় ঢুকল ওরা। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে রাখা কালো, মোটা একটা লোহার আলমারি। তিন ফুট উঁচু। দরজার পাল্লাটা এখন হাঁ করে খোলা।

'মিস্টার বোরম্যান জানলে আর আস্ত রাখবেন না আমাকে,' গুঙিয়ে উঠল এলান। এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কব্জি মোচড়ানো শুরু করল সে।

পেকসের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সেফের ভেতরে উঁকি দিল কিশোর আর রবিন।

'সাফ করে নিয়ে চলে গেছে ব্যাটারা,' মৃদু শিস দিয়ে উঠল রবিন।

'ব্যাটারা!' কথাটা ধরে বসল পেকস। 'ব্যাটা নয় কেন?'

থতমত খেয়ে গেল রবিন। জবাব দিতে সময় লাগল। 'না, এমনি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বহুবচন।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পেকসের দৃষ্টি। 'কাজটা করার জন্যে দুজন লোক দরকার।' কিশোর আর রবিনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

দরজায় হট্টগোল শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। ইভা, ফিলিপ, জন আর জিনা

দাঁড়িয়ে আছে। দরজা-খোলা সেফটার দিকে চোখ সবার। কেউ বা হাঁ। কারও চোখ বড় বড়।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল ইভা। 'সাংঘাতিক ঘটনা! একের পর এক রহস্য জমেই চলেছে!'

উঠে দাঁড়াল পেকস। প্রচুর কথা বলল, এত কথা সাধারণত বলে না সে। 'এটাকেও মিস্ট্রি উইকএন্ডের নাটক ভেবে থাকলে ভুল করবেন। সাংঘাতিক একটা ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। এ জায়গা ছেড়ে কেউ নড়বেন না। কার কাজ, জানা দরকার। আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি।'

ফোনের দিকে এগিয়ে গেল পেকস। জন এসে বসল কিশোর আর রবিনের কাছে।

'হাত দেবেন না কোন কিছুতে,' সাবধান করল কিশোর। 'আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।'

কড়া চোখে তার দিকে তাকাল জন। 'আমাকে নির্দেশ দেয়ার তুমি কে হে? নিজেকে সর্দার ভাবার প্রবণতা! তোমাদের এই হামবড়া ভাবভঙ্গি অতিষ্ঠ করে দিয়েছে আমাকে।'

'আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসে আছেন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আসলে সাহায্য করতে চাইছি আমরা। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, অপরাধ যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানকার কোন কিছুতে হাত দেয়া ঠিক না।' উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে।

'যথেষ্ট হয়েছে মিস্ট্রি উইকএন্ড! আমি আর এর মধ্যে নেই,' বলে গটমট করে সেখান থেকে চলে গেল জন।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'ঘটনাগুলো সবার স্নায়ুতেই চাপ দিতে আরম্ভ করেছে।'

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াল পেকস। 'পুলিশ আসছে। সবাই এ ঘর থেকে বেরোন। কোন কিছুতে হাত দেবেন না।'

জনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর।

পেকস বলল, 'যান, সরুন! লবিতেও থাকবেন না কেউ।'

হলের ভেতর দিয়ে পারলারে এসে ঢুকল সকলে। সবাই চুপচাপ। যার যার চিন্তায় মগ্ন।

সবার আগে কথা বলল ইভা। 'পেকস একটা সত্যিকারের ভাল অভিনেতা। রাগের কি চমৎকার অভিনয়টাই না করল। বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে।'

তার দিকে কাত হলো রবিন। 'ইভা, আমার মনে হচ্ছে, এটা ভুয়া রহস্যের অংশ নয়।'

ঝাঁজিয়ে উঠল ইভা। 'হয়েছে, হয়েছে আমাকে আর শেখাতে এসো না। তোমার কি ধারণা, সত্যিকারের ডাকাতি?'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'সত্যিকারের কিনা একটু পরেই বুঝতে পারবেন। নাহলে পুলিশকে ফোন করল কেন পেকস?'

'পুলিশ? হয়তো ওরাও অভিনেতা। স্থানীয় থিয়েটার থেকে ভাড়া করা হয়েছে।

বসে থাকলে ঠকতে হবে। একটু পরেই হয়তো পেকস এসে হেসে বলবে, সব ফাঁকি। গাধা বনতে হবে তখন।'

হাসল ফিলিপ। 'ইভার কথাই ঠিক। এই ডাকাতিটাও সাজানো। টাকা নিয়েছে, এখন খেলা দেখিয়ে সেটা উসুল করছে।'

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তর্ক না করে যা বলছে সবাই, তাতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 'ঠিক আছে। চুপচাপ বসে বসে উপভোগ করা যাক তাহলে।'

'তাই নাকি? এটাকে মোটেও সাজানো ঘটনা মনে হচ্ছে না আমার। চোর খুঁজতে বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না, এখানেই আছে দুজনে,' কিশোর আর রবিনকে ইঙ্গিত করে বলল জন।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'আপনার থিয়োরিতে একটা ভুল রয়েছে, জন।

'কি?'

'আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। হলে রওনা হলো। পেছন পেছন চলল রবিন।

হলে ঢুকে আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল মুসার সঙ্গে।

'কিশোর! জলদি এসো!' মুসা বলল।

'কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

জবাব না দিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল মুসা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চলো আমার ঘরে। গেলেই বুঝবে।'

ঘরের দরজা খুলে ধরল মুসা। ভেতরে ঢুকল কিশোর আর রবিন।

'হ্যাঁ, বলো এবার?' মুখ তুলল কিশোর।

ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'কিছু টের পাচ্ছ?'

সারা ঘরে চোখ বোলাল কিশোর আর রবিন। পরিবর্তন চোখে পড়ল না।

'চোখে দেখার জিনিস নয়,' মুসা বলল। 'অদ্ভুত একটা গন্ধ পাচ্ছ না?'

'চুরুটের গন্ধ!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'চেনা লাগছে না?'

'মিস্টার বোরম্যান!' বলে উঠল রবিন।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তীব্র দুর্গন্ধওয়ালা চুরুট।'

'ঠিক বলেছ,' কিশোর বলল। 'পায়ে দেয়া ঘেমো মোজার গন্ধ। তারমানে আশেপাশেই কোথাও আছেন মিস্টার বোরম্যান।'

'থাকলে,' রবিন বলল, 'দেখা দিচ্ছেন না কেন?'

'আর আমার ঘরেই বা কি খুঁজতে এসেছিলেন?' মুসার প্রশ্ন।

*

দুটো পুলিশ কার এসে থামল হোটেলের সামনে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। গাড়ির ওপরের লাল আলোগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওদের মুখে।

পুলিশের পোশাক পরা তিনজন, আর লাল-চুল, সাদা পোশাক পরা একজন

লোক নামল গাড়ি থেকে। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল লবিতে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে এল তিন গোয়েন্দা।

'সাংঘাতিক!' ইভা বলছে। 'একেবারেই আসল পুলিশের মত লাগছে।'

'আসলই ওরা, ইভা,' কিশোর বলল।

দ্বিধায় পড়ে গেল ইভা। 'সত্যি বলছ?'

'ধূর, বিশ্বাস কোরো না ওদের কথা!' ফিলিপ বলল ইভাকে।

হল ছেড়ে পুলিশকে অনুসরণ করে লবিতে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। এলান আর পেকস রয়েছে তাদের অফিসে।

'কোন কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি,' পেকস বলল। 'যা যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবেই রেখে দেয়া হয়েছে।'

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সেফের ভেতরটা দেখল দুজন অফিসার। বাকি দুজন সূত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল।

'পেশাদার লোকের কাজ মনে হচ্ছে, সার্জেন্ট,' সেফের কাছ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল একজন অফিসার। সাদা পোশাক পরা লাল-চুল লোকটার সঙ্গে কথা বলছে সে। ফিরে তাকাতেই দুই গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল তার। ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, তোমরা এখানে কি করছ?'

'আমরা এ হোটেলের গেস্ট,' জবাব দিল কিশোর।

নিজের পরিচয় দিল লোকটা। জানা গেল, সে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর ডিটেকটিভ সার্জেন্ট, নাম সমারস। 'অন্যদের সঙ্গে গিয়ে পারলারে বসো। পরে আসছি আমরা। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

বাধ্য ছেলের মত পারলারে ফিরে এল দুজনে।

'আপাতত সরে থাকাই ভাল,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে এক্ষুণি আমাদের আসল পরিচয় ফাঁস করার দরকার নেই।'

'মিস্টার বোরম্যান এখন এখানে থাকলে ভাল হতো,' রবিন বলল।

'আশেপাশেই কোথাও আছেন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু সামনে আসছেন না কেন?'

'তিনি সামনে না এলে প্রমাণও করতে পারব না, তাঁর কথাতেই কাজ করতে এসেছি আমরা।'

'হ্যাঁ। কাজেই চুপচাপ থেকে গোপনে গোপনে আমাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।'

*

পারলারে ওই সময় ইভার ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে ফিলিপ। 'এই ভাঁড়গুলো পুলিশ অফিসার, এ কথা ছাগল না হলে কেউ বিশ্বাস করবে?'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। এটা যে সত্যিই ডাকাতি, এ কথাটা ওরা যে ভাবে বুঝছে, আর কেউ বুঝছে না।

'হুড়মুড় করে যে ভাবে ঘরে ঢুকল নকল পুলিশগুলো,' ফিলিপ বলছে, 'অভিনয় যে, এটা পাগলেও বুঝবে।'

দরজায় এসে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। 'এখান থেকে নড়বেন না কেউ। আমরা

দোতলার ঘরগুলো দেখে আসি।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের কাছে?' রসিকতা করে জিজ্ঞেস করল জন। সবজান্তার হাসি দিল।

'কেন? গোপন করার আছে নাকি কিছু তোমার?' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল সমারস।

হাসিটা দূর হয়ে গেল জনের। 'না-না, অফিসার! আসলে···ঠিক আছে, যান, আপনাদের কাজে যান।'

কিন্তু এত সহজে আর জনকে ছাড়ল না সমারস। 'কথামত না চললে সার্চ ওয়ারেন্ট আনতে দেরি হবে না আমাদের।'

'আমার ঘরে যেতে চান?' ফিলিপ বলল, 'যান। কিছুই পাবেন না।'

'আমার ঘরেও না,' ইভা বলল।

বাধা দিল এলান, 'আপনাদের যেখানে ইচ্ছে যান, অফিসার। আমি অনুমতি দিচ্ছি। হোটেলের যে ঘরে ইচ্ছে ঢুকে দেখুন। আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা বিহিত হয়ে যাক।' ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে সে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। 'মিস্টার বোরম্যান এলে কি জবাব দেব, সেই চিন্তায় আমি অস্থির।'

আর চুপ থাকতে পারল না কিশোর। 'তিনি এখনও আসেননি?'

'না, আসেননি!' জবাব দিল এলান।

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল মুসা, কিশোর, রবিন। একই কথা ভাবছে তিনজনে। মিস্টার বোরম্যান যদি এখনও না-ই এসে থাকেন, মুসার ঘরে চুরুটের গন্ধ কে রেখে এসেছে?

এলান বলল, 'আমার কাছে ফোন নম্বর আছে। মিস্টার বোরম্যানকে ফোন করা যাবে। পুলিশের তদন্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাই আমি করব।'

কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করল রবিন, 'অবাক কাণ্ড! গতকালও না বলল, মিস্টার বোরম্যান কোথায় আছেন, জানে না সে?'

'তাই তো,' কিশোর বলল। 'ও বলেছে, দূরে কোথাও চলে গেছেন মিস্টার বোরম্যান, অ্যানটিক খোঁজার জন্যে।'

'রহস্যময় ব্যাপার!'

দোতলায় চলে গেল পুলিশ। রহস্য নিয়ে আবার মাথা ঘামানো শুরু করল গেস্টরা। এসেছিল একটার আশায়, পাওয়া গেল একাধিক। উত্তেজনাটা উপভোগ করছে ওরা।

'জন,' ফিলিপ আবার চেপে ধরল তাকে, 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি, তোমার চিউয়িং গামের কাগজ জিনার ঘরে গেল কি করে?'

ডান হাতের তর্জনীটা পিস্তলের নলের মত ফিলিপের বুকে ঠেসে ধরল জন। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করো, না? তোমার জন্যেও একটা জিনিস আছে আমার কাছে।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ফিলিপের হারানো বইটা টেনে বের করল জন। 'জিনার ঘরের জানালার নিচে পেয়েছি এটা। কি জবাব দেবে?'

অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ফিলিপের মুখ থেকে। 'ওখানে গেল কি

করে?'

'হারটা চুরি করে জানালা গলে যখন পালাচ্ছিলে, তখনই কোনভাবে পড়ে গেছে,' বিজয়ীর হাসি হাসল জন।

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল ফিলিপ। 'বইটা কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ফেলে রেখেছিল ওখানে। কালকে পারলারে রেখে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আর পাইনি। এখন বুঝতে পারছি কে নিয়েছিল। তুমি তুলে নিয়ে গিয়েছিলে, আমাকে ফাঁসানোর জন্যে।'

হেসে উঠল জন। 'তাই নাকি? তোমার মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে?'

দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল কিশোর। মারামারি যাতে না বাধে, সেজন্যে। 'আহ্, থামুন না আপনারা! এমনিতেই প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে। মারামারি করে সমস্যা আর বাড়াবেন না।'

ফিলিপের কাছ থেকে সরে গেল জন। 'তবে বইটা আমি ফেরত দিচ্ছি না। প্রমাণ হিসেবে রেখে দিলাম।'

ফিলিপকে একধারে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল রবিন। কাঁধে হাত রাখল। 'ফিলিপ, এখানে সবাই গোয়েন্দাগিরির খেলা খেলতে এসেছি আমরা, তাই না? চিন্তা করবেন না। রহস্যটার সমাধান হয়ে গেলেই আপনার বই আপনি ফেরত পাবেন।'

বিড়বিড় করে বলল ফিলিপ, 'কিন্তু সব কিছুই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!'

সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ হলো। নেমে এসে পারলারে ঢুকল দুজন পুলিশ অফিসার।

'দুশো সাত নম্বর ঘরটা কার?' জিজ্ঞেস করল ডিটেকটিভ সমারস।

'আমাদের,' জবাব দিল কিশোর।

'এসো আমাদের সঙ্গে,' কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল সমারস। গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ঘটনাটা কি? ডিটেকটিভের পেছন পেছন সিঁড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। বাকি দুজন অফিসার ওদের পেছনে রইল।

কিশোরদের ঘরের দরজাটা হাট হয়ে খোলা। দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার।

আদেশ দিল সমারস, 'ঘরে ঢোকো।'

কি ঘটছে কিছু বুঝতে পারছে না কিশোর আর রবিন। কি এমন ঘটেছে ওদের ঘরে? নাকি একান্তে কথা বলতে চায় ওদের সঙ্গে ডিটেকটিভ?

ঘরে ঢুকল দুজনে।

'দরজা লাগিয়ে দাও!' পাহারারত অফিসারকে আদেশ দিল ডিটেকটিভ। তারপর একটা বিছানার কাছে গিয়ে গদির এককোনা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কি?'

গদির নিচে তাকিয়ে চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। মুখ খোলা। নানা রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আছে ওটা থেকে।

'আমি তোমাদের ঝামেলা কমিয়ে দিচ্ছি,' কঠোর কণ্ঠে বলল সমারস, 'কি জিনিস এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি। বার্গলার'স টুলস।'

'বার্গলার'স টুলস!' প্রায় সমস্বরে বলে উঠল কিশোর আর রবিন।

'হ্যাঁ। এগুলোর সাহায্যে জানালা-দরজা-আয়রন সেফের তালা খোলা থেকে শুরু করে আরও হাজারটা কাজ করা যায়। চোর-ডাকাতদের প্রয়োজনীয় জিনিস এগুলো।' হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সমারসের কণ্ঠ। 'আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করলাম!'

দশ

'অ্যারেস্ট!' রবিন বলল। 'কোন্ অপরাধে?'

'ডাকাতির সন্দেহে,' চাপা গর্জন করে উঠল সমারস। 'মনে হচ্ছে, এ এলাকার হোটেল ডাকাতিগুলোর পেছনে তোমাদেরও হাত আছে।'

ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ অফিসার রবিন আর কিশোরের দুই হাত টেনে পিঠের ওপর নিয়ে এল। কব্জিতে ইস্পাতের হাতকড়ার ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল দুই গোয়েন্দা।

'আমরা কে জানেন?' বলতে গেল কিশোর, 'আমরা...'

ধমক দিয়ে ওদের থামিয়ে দিল সমারস, 'তোমরা কে জানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। শুধু জানি, এই যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে সেফ খোলা হয়।'

'ওগুলো কেউ রেখে গেছে এখানে!' মরিয়া হয়ে বলল রবিন। 'আমরা চোর নই। আমরা শখের গোয়েন্দা। আমি রবিন মিলফোর্ড। ও কিশোর পাশা। আমার বাবা খবরের কাগজের লোক...'

ব্যঙ্গ করে হাসল সমারস। 'আমি তাহলে দেবদূত! বাজে কথা বলে কোন লাভ নেই। এই, নিয়ে চলো ওদের!' দরজার দিকে এগোতে গেল সে।

গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলল, 'আমাদের কথা বলার সুযোগ তো দেবেন, নাকি?'

'থানায় গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বোলো যা বলার।'

কাঁধে ধাক্কা দিয়ে দুজনকে ঠেলে নিয়ে চলল দুই পুলিশ অফিসার। পাহারারত অফিসারকে বলল সমারস, 'ডেভ, ওই টুলসগুলো নিয়ে এসো। দরজাটা সীল করে দাও। আমি না বললে কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে।'

গদির নিচ থেকে ব্যাগটা বের করে আনল অফিসার ডেভিড। আরেকজন অফিসার হলুদ রঙের টেপের মোড়ক ছাড়াতে শুরু করল। টেপের ওপরের ইংরেজি লেখাটার বাংলা করলে দাঁড়ায়:

অপরাধের স্থান হিসেবে চিহ্নিত।
বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।
আদেশক্রমে: পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

হাতকড়া পরানো অবস্থায় দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল পুলিশ।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এলানকে। দুই গোয়েন্দার অবস্থা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কিশোররা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাপা গলায়

বলল, 'কি সর্বনাশ! কাউকেই আর বিশ্বাস করার উপায় নেই!'

'আমরা চোর নই, মিস্টার উইকেড,' রবিন বলল।

'দেখে তো আসলেও সেটা মনে হয় না,' মুখটা সামান্য ওপরে তুলে নাকের সমান্তরালে ওদের দিকে তাকাল এলান। 'চমকে যাবেন। রীতিমত চমকে যাবেন মিস্টার বোরম্যান, যখন শুনবেন তাঁরই হোটেলের দুজন গেস্ট এই কাণ্ড করেছে।'

'কিন্তু আমরা…' চিৎকার করে উঠতে গেল রবিন।

'চুপ করে থাকো,' থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। 'ওকে বলে কোন লাভ নেই। বিশ্বাস করাতে পারবে না।'

পারলার থেকে ছুটে এল মুসা আর জিনা। পেছন পেছন এগোল। সামনের সিঁড়ি দিয়ে ড্রাইভওয়েতে নেমে এল। ঘাবড়ে গেছে।

'ভয় নেই,' পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে বলল কিশোর। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব আমরা।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কিছু করার আছে?'

'চোখ খোলা রেখো কেবল।'

স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। রবিন আর কিশোরকে আসামী বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে–বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। গাড়িটা চলে যাওয়ার পর ফিরে তাকিয়ে দেখে, বারান্দায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গেস্টরা সব।

কথা বলে উঠল ইভা, 'দারুণ অভিনয় করল পুলিশগুলো।' হাসল। 'আরেকটু হলেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে ওরা আসল।'

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল জিনা আর মুসা।

থানায় এনে দুই গোয়েন্দাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল সমারস। জবাব শুনে বলল, 'মিস্টার বোরম্যান তোমাদের রহস্যের অভিনয় করাতে এখানে পাঠিয়েছেন, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'মিস্টার বোরম্যান এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সমারস। 'তার সঙ্গে কথা বলব।'

'সেটাই তো সমস্যা,' কিশোর বলল। 'ম্যানেজার উইকেডের কথামত, মিস্টার বোরম্যান এখন দূরের কোন শহরে রয়েছেন, হোটেলের জন্যে অ্যানটিক কেনায় ব্যস্ত।'

'তারমানে তোমাদেরই কপাল খারাপ,' সমারস বলল। 'তোমাদের পক্ষে সাফাই দেয়ার মত কেউ নেই আর?'

'আছে। রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।'

'এ রকম একটা আষাঢ়ে গল্প নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে বলো?'

'এ ছাড়া আর কিভাবে বুঝবেন? ফোন করেই দেখুন। নিরাশ হবেন না।'

'মিথ্যে বললে বিপদ বাড়বে, মনে রেখো।'

'আপনি করুন।'

অবশেষে ফোন তুলে নিল সমারস। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই মুখের ভাব বদলে গেল তার। ফোনটা তুলে দিল কিশোরের হাতে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হালো, ক্যাপ্টেন?...হ্যাঁ হ্যাঁ, নাটকই তো করতে এসেছিলাম। এখন তো আসল ডাকাতির কেসে ফেঁসে গেছি।...না না, আপাতত কোন সাহায্য লাগবে না।...ঠিক আছে, প্রয়োজন পড়লে ফোন করব। থ্যাংক ইউ।'

রিসিভারটা সমারসের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। কানে ঠেকিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের কথা শুনল সমারস। তারপর নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

কিশোর আর রবিনকে না ছেড়ে আর কোন উপায় নেই। কিন্তু ছাড়তে ভাল লাগল না তার। কড়া গলায় বলল, 'ঠিক আছে, ছাড়ছি আপাতত। তবে আমার সন্দেহের তালিকা থেকে এখনও বাদ পড়োনি তোমরা। কেসের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ এলাকা ছেড়ে যেতে পারবে না।'

অবাক হলো কিশোর। 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরেও?'

বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল সমারসের ঠোঁটে। 'কিশোর পাশা ও রবিন মিলফোর্ডের ব্যাপারে সাফাই দিয়েছেন তিনি। তোমরাই যে সে দুজন, বুঝব কি করে?'

'কেন, আমি যে সরাসরি কথা বললাম—আমার কণ্ঠস্বর কি চিনতে ভুল করেছেন তিনি?'

'কোন্‌খান দিয়ে যে কোন ভুল হয়ে যায়, বলা মুশকিল।...ঠিক আছে, এখন যেতে পারো তোমরা। তবে ওই যে বললাম, শহর ছেড়ে যাওয়া চলবে না...'

উঠে দরজার কাছে চলে এসেছে দুজনে, পেছন থেকে ডাকল সমারস, 'ক্যাপ্টেন তো প্রচুর প্রশংসা করলেন তোমাদের, তোমরা নাকি খুব বড় গোয়েন্দা। সত্যি যদি আসল কিশোর আর রবিন হও তোমরা, ডাকাতিগুলোর ব্যাপারে কোন কিছু জানতে পারো—যে কোন কিছু—সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবে আমাকে। আমি চাই না, একা একা কতগুলো ডাকাতের পিছে লাগতে গিয়ে বিপদ ঘটুক তোমাদের।'

থানা থেকে বের করে এনে একটা পেট্রল কারে তোলা হলো দুজনকে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দা, আসল ডাকাতটাকে ধরতেই হবে এখন, তার আগে এ শহর থেকে কোনমতেই সমারস ওদের বেরোতে দেবে না।

এগারো

'তোমাদের অ্যারেস্ট করেছিল কেন?' হোটেলের পারলারে ঢোকামাত্র কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ইভা।

'পলিশ নাকি একটা বার্গলার কিট পেয়েছে তোমাদের ঘরে?' ফিলিপ জিজ্ঞেস

করল। তার কণ্ঠে উত্তেজনা।

'যদি প্রমাণ সহই ধরে থাকে,' জনের প্রশ্ন, 'তাহলে নিয়ে গিয়ে আবার ছেড়ে দিল কেন?'

জিনা পর্যন্ত এসে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তারমানে পুলিশগুলো সত্যি সত্যি নকল ছিল?'

'আরে থামো, থামো!' চিৎকার করে উঠল প্রশ্নবাণে জর্জরিত কিশোর। 'রেহাই দাও বাবা! কারটার জবাব দেব?'

'আসলে আমাদের অ্যারেস্ট করা হয়নি,' রবিন বলল। 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেবল।'

'নিশ্চয় সন্দেহভাজন হিসেবে?' জনের কণ্ঠে সন্দেহ। 'অকারণে তো আর কোন ভদ্র নাগরিককে থানায় টেনে নিয়ে যায় না পুলিশ, তা-ও আবার হাতকড়া লাগিয়ে।'

কঠোর দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল কিশোর। 'রবিন তো বললই, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে গিয়েছিল। কেন, বিশ্বাস হলো না? পুলিশকে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, ডাকাতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'কি করে করলে?' জানতে চাইল ইভা।

'সেটা গোপন ব্যাপার,' রবিন বলল। 'আপনাকে বলা যাবে না।'

'তাই নাকি!' ইভার কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর। 'তাহলে তো তোমরা রহস্যময় মানুষ! হয়তো খানিক পরেই বলে বসবে তোমরা সি-আই-এর লোক।'

'তাই তো! কি করে বুঝলেন?' রবিনও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না।

'তোমাদের বিছানার নিচে যে টুলসগুলো পাওয়া গেল,' জন বলল, 'তার কি ব্যাখ্যা দেবে?'

'আমাদের ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে রেখে দিয়েছে,' জবাব দিল রবিন। 'এ তো সহজ কথা।'

'পুলিশ সে কথা বিশ্বাস করল?' ফিলিপের প্রশ্ন।

'না করার কি আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'কিশোর, ঘরে চলো,' রবিন বলল। 'টায়ার্ড লাগছে।'

নিচে থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল গেস্টরা, যতক্ষণ না দোতলার ল্যান্ডিঙে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজনে।

ঘরে এসে আর্মচেয়ারে এলিয়ে পড়ল রবিন। কিশোর বসল বিছানার ধারে। রবিনের দিকে তাকাল। 'ভালমত জড়ালাম এখন। এসেছিলাম নাটক করতে, হয়ে গেলাম সন্দেহজনক-ডাকাত।'

'আসল ডাকাতটাকে ধরতে পারলেই শুধু,' রবিন বলল, 'আমরা সন্দেহমুক্ত হতে পারব।'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। তারপর বলল, 'শুরু থেকেই আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর পাঁয়তারা চলছিল। মোটর সাইকেলে করে অনুসরণ। গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেয়া। আমার খাবারে ওষুধ মিশিয়ে দেয়া। তারপর শুরু হলো আক্রমণ। তোমার মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে গেল।

জিনাকে সেদ্ধ করতে চাইল। তাতেও যখন দমলাম না আমরা, ফাঁসিয়ে দিয়ে হাজতে পাঠানোর বন্দোবস্ত করল।'

উঠে পায়চারি শুরু করল সে। 'শুরু থেকেই এখানকার কেউ একজন আমাদের পরিচয় জেনে গেছে। আমাদের এখানে আসাটা পছন্দ হয়নি তার।'

'জানেন তো একজনই,' রবিন বলল, 'মিস্টার বোরম্যান। কিন্তু তিনি তো এখনও এলেন না।'

'এটাই বুঝতে পারছি না। আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে কেন তিনি অ্যানটিক কিনতে চলে গেলেন?'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'আমিও বুঝতে পারছি না। হয়তো মনে করেছেন, এ পরিস্থিতি আমরা একাই সামাল দিতে পারব। প্রচুর খোঁজ-খবর নিয়েছেন আমাদের ব্যাপারে। আস্থা জন্মে গেছে হয়তো।'

'হয়তো। তারপরেও ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে।...মলের ঘটনাটাই বা কি প্রমাণ করে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।

'পুলিশ যখন আমাদেরকে চোরের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো দেখাতে নিয়ে এল, অস্বাভাবিক কোন কিছু খেয়াল করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তারমানে তুমিও করেছ। গন্ধ। চুরুটের পচা মোজার মত দুর্গন্ধ। হালকা ভাবে বাতাসে ভাসছিল।'

'বোরম্যানের চুরুট!'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।' আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'কিন্তু মিস্টার বোরম্যান আমাদের বিছানার নিচে যন্ত্রপাতি রাখতে আসবেন কেন? তা ছাড়া তিনি তো এখানে নেইই।'

'আমার কি মনে হয় জানো?' রবিন বলল, 'মিস্টার বোরম্যানের মত আরও কেউ একই ব্র্যান্ডের চুরুট টানে।'

'অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। বড় বেশি কাকতালীয়।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম তোমার কথা—আমাদের ফাঁসাতে চাইছে। কিন্তু তাহলে আমাদের ঘর বাদ দিয়ে প্রথমে মুসার ঘরে ঢুকল কেন?'

আবার খানিক পায়চারি করে নিল কিশোর। থামল। ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। 'ভুল করে। মুসার ঘরটাকেই আমাদের ঘর ভেবেছিল প্রথমে।'

মাথা নাড়ল রবিন, 'মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। মিস্টার বোরম্যানই যদি হবেন, আমাদের ফাঁসাতে যাবেন কেন?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এ প্রশ্নটার জবাব পেলে রহস্যটারই সমাধান হয়ে যায়।'

দরজায় টোকা পড়ল। রবিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল একবার কিশোর। তারপর এগিয়ে গেল দরজা খুলে দিতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জিনা। হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা পেলাম দরজার নিচে।'

কাগজটা দ্রুত খুলে নিল কিশোর। লেখা রয়েছে: **তোমার বন্ধুদের থামতে**

বলো। নইলে!

'আরেকটা হুমকি!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'নইলের মানেটা কি?' জিনার প্রশ্ন।

'যা খুশি বুঝে নাও।'

'নইলে খুনও করতে পারে, এই তো! ভয় লাগছে না তোমার?'

'না লাগার কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল।

'তাহলে এক্ষুণি ব্যাগ-সুটকেস গুছিয়ে চলে যাচ্ছ না কেন?'

'যেতে দেবে না সমারস। পালানোর চেষ্টা করলেই নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে।'

'হুঁ! ভাল গেঁড়াকলেই পড়েছ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জিনা। 'যা হোক, সাবধানে থেকো।'

একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'জিনা, এর মধ্যে তুমিও রয়েছ, ভুলে যেয়ো না। তুমিও সাবধান!'

ঠোঁটে আঙুল রেখে দুজনকেই চুপ করতে ইশারা করল রবিন। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল দরজাটা।

ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফিলিপ।

'আপনি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'চমৎকার! এখানে আপনার দেখা পাব, কল্পনাও করিনি!'

'দরজায় কান লাগিয়ে কি শুনছিলেন?' রেগে গেল কিশোর।

তোতলাতে শুরু করল ফিলিপ, 'আ-আমি কিছু শুনিনি...। হলে একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেটা খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছিলাম তোমাদের দরজার কাছে...।'

'তাই, না?' মুখ বাঁকাল রবিন। 'খোঁজারও আর জায়গা পেলেন না, একেবারে আমাদের দরজার সামনে!'

মাথা সোজা করল ফিলিপ। 'বেশ, আড়ি পেতে কথাই শুনছিলাম। তাতে হয়েছেটা কি? মিস্ট্রি উইকএন্ড পালন করছি আমরা। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আড়ি পাতাটা এখন দোষের কিছু নয়।'

আহত হলো কিশোর। 'কিন্তু আমাদের পেছনে লাগলেন কেন, ফিলিপ? ইভা, জন কিংবা মুসার পেছনে নয় কেন?'

লাল হয়ে গেল ফিলিপের মুখ। 'মনে হচ্ছিল, অনেক কিছু জানো তোমরা। বলছ না।'

'কাজেই আপনি ভাবলেন, আড়ি পেতে শুনে জেনে নেবেন?' রবিন বলল।

হাবার মত তাকিয়ে রইল ফিলিপ। চোখ নামাল মেঝের দিকে। 'অনেকটা ওই রকমই।'

'ফিলিপ, আপনার মজা নষ্ট করতে চাই না আমরা,' কিশোর বলল। 'বরং আপনি যে আমাদের সাহায্য করছেন এ জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

'সাহায্য করছি?' ফিলিপ অবাক।

'হ্যাঁ, তাই করছেন না? আমাদের সন্দেহমুক্ত হতে সাহায্য করছেন। আপনি তদন্ত করে আমাদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারলে পুলিশকে বোঝাতে পারবেন। তাই না?'

'তোমরা নিরপরাধই।'

'আমাদের ঘরে যন্ত্রপাতিগুলো পাওয়ার পরেও এ কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ। 'হ্যাঁ। ওগুলো এখানে রেখে যাওয়া হতে পারে।'

'কাল রাতে ইভার ঘরের সামনে আমাদের দেখেছেন, তার ঘরে চুরি হয়েছে,' কিশোর বলল, 'এত কিছুর পরেও আমাদের বিশ্বাস করবেন?'

'হ্যাঁ, করব,' রাতের কথা ভাবল ফিলিপ। 'কারণ তোমরা আমাকে তাড়া করেছিলে। তোমরা মনে করেছ আমিই চুরিটা করেছি। তারমানে তোমরা জানো, তোমরা করোনি।'

'আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে চাতুরি করেও তো এ কাজ করতে পারি আমরা,' রবিন বলল।

'আমি…আমি ভেবেছিলাম…' বলতে না পেরে থেমে গেল ফিলিপ। 'নাহ্, দিলে আমাকে একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলে। তারচেয়ে বলো, তোমাদের কি বক্তব্য। আসলে কি বলতে চাচ্ছ তোমরা?'

'বলতে চাচ্ছি,' কিশোর বলল, 'লোকে কিছু কিছু ব্যাপারকে এমন পেঁচিয়ে ফেলতে পারে, ভাল একজন মানুষকেও তখন অপরাধী মনে হয়।'

'আপনার জন্যে একটা প্রস্তাব আছে, ফিলিপ,' রবিন বলল। 'আমরা আপনার সাহায্য চাই।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফিলিপের চোখ। 'বেশ, বলো। কি করতে হবে আমাকে?'

'চোখ খোলা রাখুন,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'আপনি জিনার হারটা উদ্ধারের চেষ্টা করুন, আমরা সেফ ডাকাতির ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করি।'

কিশোরের কথার খেই ধরে যোগ করল রবিন, 'পরে আমরা একত্র হয়ে নোট নিয়ে মিলিয়ে দেখব, ঘটনা দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা।'

'তোমাদের কথা বুঝতে পারছি আমি,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ। 'ভাল বুদ্ধি। সত্যি এখন মনে হচ্ছে আমার, দুটো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় কোন যোগসূত্র আছে।'

'তাহলে এই কথাই রইল?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, রইল!' কিশোর আর রবিনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ফিলিপ।

হঠাৎ বেজে উঠল ফোন। ঘরের সবাইকে চমকে দিল।

হেসে বলল রবিন, 'স্নায়ুতে সবারই খুব চাপ পড়েছে। টান টান হয়ে আছে।' রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে।

'এলান বলছি,' ফোনে বলল একটা কণ্ঠ। 'মিস্টার বোরম্যান লবিতে বসে আছেন। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, এক্ষুণি।'

লাইন কেটে গেল।

'বোরম্যান এখানে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'নিচতলায় অপেক্ষা করছেন

আমাদের জন্যে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'যাক, অবশেষে এলেন। আমাদের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এতদিনে!'

দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একসঙ্গে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে এল নিচে। লবি ধরে ছুটল অফিসের দিকে।

এলানের ডেস্কের ওপাশে বসে থাকতে দেখল একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে।

বারো

'আপনি মিস্টার বোরম্যান?' কিশোর তো অবাক।

'নিশ্চয়,' রাগত স্বরে জবাব দিলেন লম্বা, হালকা-পাতলা ভদ্রলোক। 'তোমরা কে, সেটা কি জানতে পারি?'

কিশোর আর রবিন তো হতবাক।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, 'আপনি যদি আসল মিস্টার বোরম্যান হন, তাহলে রকি বীচ মলে যার সঙ্গে দেখা হলো, যিনি আমাদের কাজ দিলেন, তিনি কে?'

'রকি বীচ মল?' মিস্টার বোরম্যান বললেন, 'কি বলছ তুমি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তোমাদের কাজ দিয়েছে? কেন?'

'খুলেই বলি সব। না কি বলেন?'

'বলো। তোমাদের সব কথা শোনা দরকার আমার। কারণ, ভীষণ বিপদের মধ্যে আছ তোমরা।'

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার বোরম্যান। 'ওরকম কোন মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা জানা নেই আমার। আমি ছিলাম বহুদূরে। এখনও দূরেই থাকতাম। কিন্তু অ্যানটিকগুলো কিনতে পারলাম না বলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

'খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও তো দেয়া হয়েছে,' রবিন বলল। 'তাতে বলা হয়েছে, মাউনটেইন ইনের গেস্টরা এবারে একটা মিস্ট্রি উইকএন্ডে অংশ নেবে।'

এলানের দিকে তাকালেন মিস্টার বোরম্যান। 'কি, এলান, তুমি কি এ রকম কোন বিজ্ঞাপনের কথা জানো?'

হলুদ দাঁত বের করে সঙ্কোচের হাসি হাসল এলান। 'স্থানীয় খবরের কাগজ কখনও পড়ি না আমি, স্যার। আমার ধারণা, ছেলেগুলো এ সব বানিয়ে বলছে।'

এমন করে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসবে এলান, কল্পনা করেনি দুই গোয়েন্দা।

'খবরের কাগজের অফিসে ফোন করতে পারি আমরা,' রবিন বলল। 'তাদের

জিজ্ঞেস করতে পারি, মাউনটেইন ইনে মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা লিখে কাগজে কোন বিজ্ঞাপন গিয়েছিল কিনা।'

'পাঁচটার বেশি বাজে,' দাঁত বের করা হাসি হেসে জবাব দিল এলান। 'অফিস কি আর এতক্ষণ খোলা রেখেছে।'

'কাল সকাল বেল উঠেই আগে ফোন করব ওদের,' দমল না রবিন। 'বুঝতে পারবেন, আমরা সত্যি বলছি কিনা।'

'কাগজে যদি বিজ্ঞাপন দিয়েও থাকে,' মিস্টার বোরম্যান বললেন, 'আমি কি করে বিশ্বাস করব, তোমাদের এখানে আসার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে?'

'রকি বীচের পুলিশ ক্যাপ্টেন আমাদের হয়ে সুপারিশ করবেন,' কিশোর জবাব দিল। 'তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, ভিক্টর সাইমনের নাম শুনেছেন? বিখ্যাত গোয়েন্দা?'

'অবশ্যই শুনেছি। তাঁর নাম কে না জানে। আমার হোটেলে এসে থেকেও গেছেন তিনি।' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি তোমাদের চেনেন?'

'ফোনটা একবার লাগিয়েই দেখুন না। তা ছাড়া এখানে আরও সাক্ষি আছে, যারা আমাদের পক্ষে কথা বলবে। হোটেলের গেস্ট হিসেবে বর্তমানে এখানেই আছে তারা। তাদের নাম মুসা আমান আর জরজিনা পারকার। মুসার বাবা সিনেমার লোক, অনেক বড় টেকনিশিয়ান। আর জরজিনার বাবা তো পৃথিবী বিখ্যাত লোক, মস্ত বিজ্ঞানী, মিস্টার জনাথন পারকারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?'

কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রবিন বলল; 'ওরা আমাদের বন্ধু।'

এলানের চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ গাঢ় হলো। 'তুমি না বলেছিলে, জিনা তোমার বোন?'

'বলেছিলাম, কারণ সেটা ছিল আমাদের পরিকল্পনার অংশ,' অস্বীকার করল না রবিন। 'জিনা সাজবে আমাদের বোন, আর মুসা অপরিচিত গেস্ট। জিনার হার চুরি হওয়াটাও পরিকল্পিত। নানা রকম সূত্র রেখে দিয়েছি জিনার ঘরে। এমন ভাবে সাজিয়েছি, যাতে গেস্টদের সবার ওপর সন্দেহ পড়ে, মনে হতে থাকে সবাই চোর।'

'উদ্দেশ্য ছিল,' কিশোর বলল, 'উইকএন্ড শেষ হওয়ার আগেই গেস্টদেরকে রহস্য সমাধানের সুযোগ করে দেয়া।'

'কালকে আমরা চোরের নাম ঘোষণা করতাম,' জানাল রবিন। 'তারপর দেখতাম, গেস্টদের মাঝে কে সঠিক সমাধানটা করতে পেরেছে।'

'ঠিকই বলছে ওরা,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। মুসা আর জিনা দাঁড়িয়ে আছে। মুসা বলল, 'এ কাজটা করার জন্যেই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন মিস্টার বোরম্যান।'

লম্বা ভদ্রলোককে দেখিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, 'মুসা, ইনি মিস্টার বোরম্যান। আসল। আমাদেরকে যে কাজ দিয়েছিল, সে নকল।'

মাথা নেড়ে বোরম্যান বললেন, 'সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তোমাদেরকে এক্ষুণি বের করে দেয়া উচিত ছিল আমার সীমানা থেকে। কিন্তু করলাম না, তার কারণ, মনে হচ্ছে, তোমাদের গল্পটা বানানো গল্প নয়।'

'আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন আপনি?' উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ।

'তা বলছি না,' ভুরুর ওপর থেকে ঘাম মুছলেন মিস্টার বোরম্যান। 'তবে কেউ যদি আমার ছদ্মবেশে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে, তাকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। নিজেদেরকে তো গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিচ্ছ তোমরা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মিস্টার বোরম্যান কি বলেন শোনার অপেক্ষায় রইল।

'তোমরা এখন সন্দেহভাজন,' বললেন তিনি 'পুলিশও তোমাদেরকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি। সমারসের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। নিজেদের সন্দেহমুক্ত করতে হলে আসল ডাকাতটাকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের। আমি এর শেষ দেখতে চাই।'

'আমরাও চাই,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'তোমাদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম,' বোরম্যান বললেন। 'লোকটাকে খুঁজে বের করো। না পারলে তখন তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হব আমি।'

কিশোর অবাক। 'অভিযোগ দায়ের করবেন! কিসের?'

'মাউনটেইন ইনে এসে ধাপ্পাবাজির।'

রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে কিশোরের মগজে। প্রথমবার তাদেরকে সেফ ভেঙে ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো, এখন বলা হচ্ছে ধাপ্পাবাজি! দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে দেখল, ওরাও রেগে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি রেগেছে জিনা। বেফাঁস কি বলে বসে সে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'বেশ, যে আমাদের এই বেকায়দায় ফেলেছে, তাকে না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না আমরা!'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা কাটা টুকরো বের করল মুসা। এগিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরল মিস্টার বোরম্যানের দিকে, 'এই যে, বিজ্ঞাপনের কপি।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে কাটিংটা মুসার হাত থেকে নিয়ে নিলেন মিস্টার বোরম্যান। 'আশ্চর্য! কাজটা যে করেছে, সে ভাল করেই জানত, আমি বাইরে চলে যাচ্ছি।' মুখ তুলে গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন তিনি। ভীষণ গম্ভীর। 'কিন্তু কি করে জানব, বিজ্ঞাপনটা তোমরাই দাওনি পত্রিকায়?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'যে দিয়েছে সেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই সব জানতে পারবেন।'

ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার বোরম্যান। 'তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলছি আমি। কিন্তু সাক্ষি-প্রমাণ সব যে তোমাদের দিকেই নির্দেশ করছে।'

'না, সে-জন্যে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না আমরা।'

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার বোরম্যান। 'যাক, এখন ডিনারের ব্যবস্থা করা হবে। খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দেয়া দরকার। রাতটা ভালমত কাটুক।'

*

পরদিন সকালে, মুসাকে সতর্ক থাকতে বলে হাঁটতে বেরোল কিশোর আর রবিন।

'আমাদের ঘরটাতে গোপন মাইক্রোফোন থাকতে পারে,' কিশোর বলল, 'সেজন্যেই কেসটা নিয়ে রাতে কোন আলোচনা করিনি।'

'এখানে তো আর মাইক্রোফোন নেই.' রবিন বলল। 'বলো, কি বলবে।'

'আলোচনার জন্যেই বেরিয়েছি,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। প্রথম কথা হলো, আমার ধারণা, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে এলান। বিজ্ঞাপন যে দেয়া হয়েছে, না জানার কথা নয় ওর। ওর সামনেই সবাই বলাবলি করেছে মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা। ও জানে না, এটা হতেই পারে না। বরং সবাইকে সহায়তা করেছে। বুঝতে পারছি না, আমাদের বিরুদ্ধে লাগল কেন সে? কেন আমাদের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলে মিস্টার বোরম্যানের কান ভাঙানি দিল?'

'মাথায় ঢুকছে না আমার,' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'হতে পারে, কারও হয়ে কাজ করছে সে।'

'কার?'

'জানি না!'

ঘাসে ঢাকা একটা টিলা ধরে নেমে চলল ওরা। খানিক দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কার বাড়ি?'

'দরজার সাইজ দেখে তো মনে হচ্ছে, ঘোড়ার,' জবাব দিল কিশোর। 'আস্তাবল।'

'ও, হ্যাঁ, এটার কথা তো বলেছিল বটে এলান,' রবিন বলল। 'ইদানীং আর ব্যবহার হয় না।'

'চলো তো, দেখে আসি।'

বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।

'মনে হচ্ছে, বহুকাল ধরে জানালাগুলোকে তক্তা মেরে রাখা হয়েছে, খোলা আর হয় না,' কিশোর বলল।

বাড়িটার কোণ ঘুরে এল দুজনে।

রবিনের হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'দেখো, একটা দরজা ফাঁক হয়ে আছে।'

'তারমানে ভেতরে কেউ আছে,' রবিন বলল।

পা টিপে টিপে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল ওরা। ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল। হঠাৎ কানে এল চাপা কণ্ঠ। তারপর টুংটুং শব্দ।

'শুনলে?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ধাতব কোন জিনিস পড়ে গেছে হাত থেকে!'

হাত নেড়ে রবিনকে এগোতে ইশারা করল কিশোর। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোল দুজনে, উঁকি দিল জানালা দিয়ে। কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু শব্দ বোঝা যাচ্ছে না।

জানালার একটা তক্তা আলগা দেখে সেটা ধরে টান দিল রবিন। আরেকটু ফাঁক করে দেখার জন্যে ভেতরে উঁকি দিল।

দরজা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ধুলো উড়ছে। নকল বোরম্যানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। ছায়ায় আড়াল হয়ে থাকা কারও সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে লোকটার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ঘুরে দৌড় মারল।

'দেখে ফেলেছে আমাদের!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'ধরো ওকে! দরজার দিকে যাচ্ছে!'

সামনের দিকে দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা। নকল বোরম্যানকে দেখল, ঘাসে ঢাকা জায়গাটা ধরে ছুটে যাচ্ছে পার্কিং লটের দিকে।

'জলদি করো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ব্যাটাকে পালাতে দেয়া চলবে না।'

কিন্তু ভারী শরীরের তুলনায় অনেক জোরে ছোটে লোকটা। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে, দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

টিলা বেয়ে উঠে পার্কিং লটের খোলা জায়গাটায় যখন পৌঁছল গোয়েন্দারা, চলতে আরম্ভ করেছে লোকটার গাড়ি। সামনে এগোতে গিয়ে হঠাৎ ডানে মোড় নিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। গতি বাড়ছে প্রতি সেকেন্ডে।

'সরো! সরো!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

গাড়ির দুই পাশে ঝাঁপ দিল দুজনে। শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল সামনের চকচকে ক্রোমের গ্রিলটা তীব্র গতিতে সরে যাচ্ছে মাথার কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে। গড়িয়ে আরও কয়েক ফুট সরে গেল ওরা। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল নিজেদের গাড়ির দিকে ।

'এখনও ধরা সম্ভব!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গাড়িতে উঠে পড়ে ইগনিশনে মোচড় দিল রবিন। ইঞ্জিন পুরোপুরি চালু হবার আগেই গীয়ার দিল সে। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল চাকা।

গেটের কাছে পৌঁছার আগেই মেইন রোড থেকে ছুটে এল একটা পুলিশের গাড়ি। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে রাস্তা বন্ধ করে দিল গোয়েন্দাদের।

'থামো, থামো!' রবিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ধাক্কা লাগবে!'

রবিনকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টান মারল স্টিয়ারিঙে। ডানে কাটার জন্যে। ব্রেক কষল রবিন। খোয়া বিছানো পথে কর্কশ আর্তনাদ তুলল রবারের চাকা। পেছনে ফোয়ারার মত খোয়া ছিটাতে লাগল। মাছের লেজ নাড়ার মত করে দু'পাশে ঝাঁকি খেতে লাগল গাড়ির পেছন দিকটা। থেমে গেল ভ্যান। সাদা রঙ করা ছোট একটা পাইনের গায়ে নাক ঠেকে গেছে। পেছনটা পুলিশের গাড়ি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

পেট্রল কার থেকে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল একজন পুলিশ অফিসার। অসহায় হয়ে গাড়িতে বসে রইল দুই গোয়েন্দা। মৃদু শব্দে চলছে ইঞ্জিনটা। গাড়ির দুই ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করল অফিসার। খোলা জানালা দিয়ে ঠেলে দিল ভেতরে।

তেরো

পুলিশ অফিসারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল দুজনে।

ধমকে উঠল অফিসার, 'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে না এলাকা ছেড়ে যেতে মানা করা হয়েছিল!'

নরম সুরে জবাব দিল কিশোর, 'আমরা তো যাচ্ছি না। একটা লোকের পিছু নিয়েছিলাম, যাকে ধরা গেলে এ কেসের সমাধানে সাহায্য হতে পারত।'

'সরি,' মাথা নাড়ল অফিসার। 'এখান থেকে বেরোতে দেয়া যাবে না তোমাদের। গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে যাও। আমারটা সরিয়ে দিচ্ছি।'

চেপে রাখা বাতাসটা ছেড়ে দিয়ে ফুসফুস খালি করে ফেলল রবিন। তারপর গাড়ি পিছাতে শুরু করল। গুঁতো খেয়ে গাছটার অনেকখানি থেঁতলে গেছে।

প্রচণ্ড হতাশায় জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল সে, 'পুলিশ আসার আর সময় পেল না! আচ্ছা, বলো তো ঘটনাটা কি? কালো গাড়িটাকে কেন থামাল না পুলিশ?'

'গেস্টদের শুধু থামানোর নির্দেশ আছে তার ওপর। ভেবো না। লোকটাকে ধরার সুযোগ পাব আবার,' কিশোর বলল। 'ওদের জরুরী মীটিঙে বাধা দিয়েছি আমরা। সুতরাং ফিরে সে আসবেই।'

'ভাবছি, অন্য লোকটা কে?'

'জানালার কাছে যাওয়ার আগে একটা ধাতব শব্দ পেয়েছিলাম। মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে। টুংটুং শব্দ।'

'একটা কয়েন হাত থেকে পড়লে ওরকম শব্দ হতে পারে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ সেই দ্বিতীয় লোকটা এলান?'

'তাই তো মনে হয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আপনমনে বলল কিশোর, 'মুদ্রা ঘোরানো লোকটার মুদ্রা দোষ। হয় ঘোরায়, নয়তো শূন্যে ছুঁড়তে থাকে।'

'নকল বোরম্যানের সঙ্গে কথা বলার সময় নিশ্চয় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করছিল, গেছে হাত থেকে পড়ে। আমরা যখন বোরম্যানের পিছু নিলাম, ও তখন লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলে চলে গেছে। চলো, গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা যাক। দেখা যাক, সে-ই ছিল কিনা।'

গাড়ি ঘুরিয়ে আঁকাবাঁকা ড্রাইভওয়ে ধরে হোটেলে ফিরে চলল রবিন।

*

হোটেলের লবিতে পৌঁছে দমকা হাওয়ার মত এসে এলানের অফিসে ঢুকল ওরা। কোথাও দেখা গেল না তাকে। পারলারেও নেই।

লম্বা হলের দিকে তাকাল ওরা। মুসাকে আসতে দেখল।

'এই যে, তোমরা এখানে,' কাছে এসে বলল মুসা। 'আর আমি ওদিকে খুঁজে

মরছি। কি খুঁজছ?'

'এলানকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখেছি,' মুসা জানাল। 'রান্নাঘরে। লাঞ্চের খাবার রেডি করার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে বাবুর্চিকে। আমিও একই কারণে গিয়েছিলাম।'

মুসার পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল কিশোর। তার পিছু নিল রবিন।

পেছন থেকে চিৎকার করে বলল মুসা, 'কোথায় যাচ্ছ?'

পেছন পেছন ছুটল সে-ও।

হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে রান্নাঘরের দরজার ভেতরে বসে আছে এলান। ছেলেদের দেখে বলে উঠল, 'আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না। আমি ব্যস্ত। হিসেব নিচ্ছি।' মাছি তাড়ানোর মত করে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ওদের তাড়ানোর চেষ্টা করল। 'তোমাদের সঙ্গে এখন আমার গোয়েন্দা গোয়েন্দা খেলার সময় নেই।'

'তা তো থাকবেই না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল কিশোর। 'তবে ভাল চান তো সময় বের করুন। নইলে পুলিশের কাছে যাচ্ছি আমরা।'

মিনিটখানেকের জন্যে বাবুর্চিকে বেরিয়ে যেতে বলল এলান। ছেলেদের দিকে তাকাল। 'বলো, কি বলবে?'

'এইমাত্র আস্তাবলের কাছ থেকে এলাম আমরা,' কিশোর বলল। 'দেখে এলাম নকল বোরম্যানকে।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো এলান। ভান করল কিনা, বোঝা গেল না।

'হ্যাঁ,' এলানের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'কারও সঙ্গে কথা বলছিল।'

'আর সেই "কারও"টা হলেন আপনি,' বলে ফেলল রবিন।

'আমি?' হেসে উঠল এলান। 'গত আধঘণ্টায় রান্নাঘর থেকেই নড়িনি আমি। বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

চাপা কঠিন স্বরে কিশোর বলল, 'দেখুন, আমাদের রহস্যময় লোকটি আস্তাবলে কারও সঙ্গে কথা বলছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথা বলতে বলতে তার হাত থেকে কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল, যেটার শব্দ কয়েনের মত।'

'মত! কয়েন কিনা সেটা তো শিওর নও,' এলানের মুখ দেখে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। বলল, 'আর শব্দ শুনলেই প্রমাণ হয় না আমিই কয়েন ফেলেছি? আমাকে ফাঁসানোর জন্যে যে কেউ করে থাকতে পারে কাজটা। যেমন, তোমাদের ঘরে খাটের নিচে রেখে এসেছিল।'

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। 'মিস্টার উইকেড, সত্যি বলছেন, খানিকক্ষণ আগে আপনি আস্তাবলে ছিলেন না?'

উঠে দাঁড়াল এলান। 'না, ছিলাম না। প্লীজ, যাও এখন। আমাকে কাজ করতে দাও। সময়মত খাবার দিতে না পারলে গেস্টরা আমাকে আস্ত রাখবে না।'

কিশোররা বেরোতেই বাবুর্চিকে ডাকল এলান। খানিক দূরে অপেক্ষা করছিল সে।

রান্নাঘর থেকে সরে এসে পেছনের দরজার দিকে এগোল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'লাঞ্চের সময় যে হয়ে এল।'

'আস্তাবলটা দেখে আসি আরেকবার,' কিশোর বলল। 'ভেতরে না ঢুকলে

বুঝতে পারব না, দ্বিতীয় লোকটা কে ছিল।'

*

আস্তাবলের দরজা, যেটা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছিল নকল বোরম্যান, সেটা এখনও খোলা। ঘরের বাতাসে চুরুটের গন্ধ।

মেঝেতে ঝুঁকে কি যেন দেখছে রবিন।

'পেলে কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দুই সেট পায়ের ছাপ,' জবাব দিল রবিন। 'ভাগ্যিস মেঝেতে ধুলো রয়েছে!' আঙুল তুলে সাদা পাউডারের মত মিহি ধুলোর কণা দেখাল সে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। 'নোড়ো না!'

মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল মুসা আর কিশোর।

'দেখো!' মেঝেতে গোল একটা চিহ্নের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'দেখি, দরজাটা আরেকটু ফাঁক করো তো, আলো আসুক।'

দরজাটা ফাঁক করে ধরল মুসা। সকালের কড়া রোদ ঘরে ঢুকল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘর। রবিনের পাশে দাঁড়াল কিশোর। রবিন কি দেখেছে দেখার জন্যে ঝুঁকে তাকাল।

পুরু হয়ে জমে থাকা ধুলোতে একটা গোল ছাপ। বড় মুদ্রাটুদ্রা হবে। হয়তো রূপার ডলার।

'কয়েনই পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। আশেপাশে তাকিয়ে উল্টে রাখা একটা টিনের বালতি চোখে পড়ল তার। 'এই তো পাওয়া গেছে! প্রথমে ওটার ওপর পড়াতেই এত জোরে শব্দ হয়েছে। কিন্তু ফেললটা কে? এলান তো স্রেফ অস্বীকার করল।'

'অপরাধী কি আর অপরাধের কথা এত সহজে স্বীকার করে,' রবিন বলল। 'কিন্তু এমন কিছুই পাইনি আমরা এখনও, যেটা দিয়ে প্রমাণ করা যায়, সেফের জিনিসপত্র চুরিতে এলানেরও হাত রয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এলানের ওপর এখন কড়া নজর রাখা দরকার আমাদের।'

'চলো, হোটেলে ফিরে যাই,' রবিন বলল। 'অনেক কাজ বাকি।'

'তার মধ্যে একটা হলো লাঞ্চ,' নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বলল মুসা। 'এখান থেকেই সুগন্ধ আসছে আমার নাকে।'

'চুরুটের এই দুর্গন্ধের মাঝেও?' হাসল রবিন।

'যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন জায়গা থেকে খাবারের গন্ধ পাই আমি,' হাসিমুখে জবাব দিল মুসা।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

ডাইনিং রূমে যখন ঢুকল, টেবিলে খাবার দেয়া হয়ে গেছে। ওদের দেখে টিটকারি দিয়ে বলল জন, 'হায়রে কপাল, আসামীদের সঙ্গে বসে খেতে হয়! কেন যে ছেড়ে দিল পুলিশ!'

'আমরা আসামী নই!' সহ্য করতে না পেরে রেগে উঠল রবিন।

'বাপরে, রাগ কত! ব্যাপার কি? সামান্য একটা রসিকতাও সহ্য করতে পারো

না?'

'এটা কোন রসিকতা হলো না,' কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'কিন্তু আমার তো মনে হলো, আজকের সবচেয়ে বড় রসিকতা এটা,' খুঁচিয়েই চলল জন। যেন ইচ্ছে করেই, ওদেরকে রাগানোর জন্যে। 'তা ছাড়া এখনও তোমরা সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্তি পাওনি।' টেবিলে বসা অন্য গেস্টদের সমর্থন চাইল সে, 'তাই না?'

অনেকেই মাথা ঝাঁকাল।

জন বলল, 'কি ব্যাপার, ফিলিপ, তুমি বিশ্বাস করো না? তুমি কি বলতে চাও, এই দুজন ডাকাতি করেনি?'

'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোয়েন্দা কখনও তার মনের কথা ফাঁস করে না,' ফিলিপ বলল। 'আমার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। দারুণ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে যাচ্ছি আমি। বলব। বলে চমকে দেব সবাইকে। আগে শেষ হোক।'

'বাপরে, একেবারে ছ্যানছ্যান করে ওঠে আধুনিক শার্লক হোমস!' ফিলিপকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না জন।

প্রসঙ্গটা তিক্ততার দিকে চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল জিনা, 'জন, আপনি এখনও জানাননি আমাদের, আমার হারটা চুরি যাওয়ার পর আপনার চিউয়িং গামের মোড়ক আমার ঘরে এল কিভাবে?'

কাঁধ সোজা করে ফেলল জন। 'সেটা বলার প্রয়োজন মনে করছি না আমি। তুমি যেমন জানো না কি করে গেল, আমিও জানি না। এর বেশি বলতে পারব না আমি।'

'এখন কি বুঝলেন?' ভুরু নাচাল জিনা। 'কে বেশি ছ্যানছ্যানে?'

জবাব দিতে না পেরে খাবারের প্লেটের দিকে মুখ নামাল জন। চামচ নাড়াচাড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রেগে গেছে সে-ও।

'যাই হোক, আর বড়জোর দু'ঘণ্টার মধ্যেই মিস্ট্রি উইকএন্ড শেষ, রহস্যটারও সমাধান হয়ে যাচ্ছে,' ইভা বলল। 'আমার ঘড়ি আর ক্যামেরা, জিনার হার, অফিসের সেফ থেকে নেয়া টাকা-পয়সা, সব ফেরত পাব। প্রশ্ন হলো, কে করল কাজটা?' ব্যাপারটাকে এখনও খেলাই ভাবছে ইভা।

গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'ইভা, আপনি কি এখনও মনে করছেন এটা খেলা?'

'নিশ্চয়!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইভার মুখ।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, হতাশার। 'বাকি সবাইও কি খেলা ভাবছেন?'

ফিলিপ বলল, 'খেলা ভেবে মজা পাওয়ার জন্যেই তো টাকা দিয়েছি আমরা, এখন অন্য কিছু ভাবতে যাব কেন? আমি প্রথম থেকেই অনুমান করতে পেরেছি, কার কাজ। প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলাম। সেটাও পেয়ে গেছি। অতএব...'

হাসল কিশোর। 'আমরাই নিশ্চয় আপনার সন্দেহ তালিকার শীর্ষে?'

জবাব দিল না ফিলিপ। মুচকি হাসল।

ইভা বলল, 'যা-ই বলো, ওই পুলিশগুলো সাংঘাতিক অভিনেতা, একেবারে

আসলের মত লাগল।'

শুকনো হাসি দেখা গেল রবিনের মুখে। 'সত্যি সাংঘাতিক, তাই না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

খাওয়ার বাকি সময়টাতে আর তেমন কোন কথা হলো না। পরে, সবাই যখন এক জায়গায় বসে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনায় রত, আস্তে করে ওখান থেকে উঠে নিজেদের ঘরে চলে এল রবিন আর কিশোর।

'এলানের ওপর চোখ রাখব না?' জানতে চাইল রবিন।

'মুসাকে বলে এসেছি রাখার জন্যে,' কিশোর বলল। 'আমাদের ঘরটায় আরেকবার চোখ বোলানো প্রয়োজন মনে করছি, সেজন্যেই এলাম। বার্গলার কিটটা যে এনে রেখে গিয়েছিল, সে কোন সূত্র ফেলে যেতে পারে। ভালমত আরেকবার দেখা দরকার, কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'আমি আর পারব না, ভাই!'

'শুধু আর একবার। এসো।'

খুঁজতে শুরু করল দুজনে। খুব সাবধান রইল, যাতে কোন কিছু চোখ না এড়ায়। অবশেষে বাথরুমে এসে জিনিসটা চোখে পড়ল রবিনের। সাদা টাইলের মেঝেতে, বাথ ম্যাটের নিচে. সামান্য ছাই।

চুরুটের ছাই!

'আগে দেখলাম না কেন?' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'ম্যাটের নিচে ঢাকা ছিল, কি করে দেখব? তখন তো আর উল্টে দেখিনি।'

'পুলিশের চোখে পড়ল না কেন?'

'পুলিশ কি আর এখানে খুঁজেছে? বার্গলার কিটটা পেয়ে গিয়েই ওরা ওদের কর্তব্য-কর্ম সাঙ্গ করেছে। আর কোথাও খুঁজে দেখার কথা ভাবেওনি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। 'এখন কি করব?'

'জিনা যে নোটটা পেয়েছে দরজার নিচে, তোমার কাছে আছে না?' হাত বাড়াল কিশোর।

উঠে বসে পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। বের করে দিল কিশোরকে। নিজের সুটকেস থেকে আরেকটা কাগজ বের করে আনল কিশোর।

'কি ওটা?'

'নকল বোরম্যানের দেয়া নির্দেশাবলী, ভুলে গেছ?'

'ওটা দিয়ে কি হবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'নোটের লেখার সঙ্গে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখব।' টেবিলে কাগজগুলো বিছাল কিশোর। গভীর মনোযোগে দেখতে দেখতে বলল, 'ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেবে, প্লীজ?'

কিশোরের সুটকেস থেকে বের করে এনে দিল রবিন। 'নাও।'

পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল রবিন।

দুটো কাগজই টাইপ করা। লেখাগুলোর ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরে দেখতে লাগল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর মুখ তুলে তাকাল। 'এখন আমি শিওর। একই টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করা হয়েছে দুটো কাগজ।'

'সত্যি বলছ!' ভুরু উঁচু হয়ে গেল রবিনের।

'নিজেই দেখো,' গ্লাসটা রবিনের হাতে তুলে দিল কিশোর।

কাগজ দুটো দেখতে লাগল রবিন।

'বড় হাতের অক্ষরগুলো দেখো ভাল করে,' বলে দিল কিশোর। 'কোন মিল দেখতে পাচ্ছ?'

ক্ষণিকের জন্যে মুখ ফেরাল রবিন। 'হ্যাঁ। সামান্য ওপরে টোকা দেয়।'

'এর কারণ, যন্ত্রটার শিফটে কোন গোলমাল আছে।'

হাসি ফুটল রবিনের মুখে। 'তারমানে, এক টাইপরাইটার তো বটেই, টাইপিস্টও একই লোক।'

'এক লোক হোক বা না হোক, মেশিন একটাই…'

দরজায় টোকা পড়ল। উঠে গিয়ে খুলে দিল কিশোর। মুসা ঢুকল।

'কি হলো?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'তুমি চলে এলে যে? এলানের ওপর না নজর রাখতে বলা হয়েছে।'

'হারিয়ে ফেলেছি,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল মুসা।

'হারিয়ে ফেলেছ মানে?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'রান্নাঘরে এক মিনিটের জন্যে গিয়েছিলাম পানি খেতে,' মুসা বলল। 'ফিরে এসে দেখি, নেই।' রবিন আর কিশোরের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। 'কিন্তু তোমাদের কি হয়েছে?'

টাইপরাইটারটার কথা জানাল কিশোর।

চোয়াল ডলতে ডলতে মুসা বলল, 'তারমানে এই হোটেলেরই কোনখানে রয়েছে মেশিনটা!'

রবিনের বিছানার কিনারে বসে পড়ল মুসা। গভীর ভাবে ভাবছে কিছু। মিনিটখানেক পর বলল, 'আমি ভাবছি, হোটেলে প্রথম ঢোকার সময়টার কথা। লবিতে মালপত্র সব পড়ে আছে। ওগুলোর পাশে একটা টাইপরাইটারও দেখেছিলাম। ওপর থেকে এসে মেশিনটা নিয়ে গেল…'

হঠাৎ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল বেডসাইড ল্যাম্পটা। বোমার শেলের টুকরোর মত উড়তে শুরু করল যেন ভাঙা কাঁচের টুকরো।

চোদ্দ

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঘরের মধ্যেও প্রতিধ্বনি তুলে গেল গুলির শব্দ। দ্বিতীয় গুলিটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

'আমাদের লক্ষ্য করেই চালিয়েছে,' নিচুস্বরে বলল কিশোর।

'কি করা যায়?' রবিনের প্রশ্ন। 'সারাক্ষণ এখানে শুয়ে থাকব নাকি?'

'আমাকেই সই করেছিল,' কম্পিত কণ্ঠে মুসা বলল। 'কানের কাছ দিয়ে শাঁ

করে চলে গেল। আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ!'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' কিশোর বলল। 'মাথা তুলো না। রবিন, এসো আমার সঙ্গে।' মুসাকে ইশারা করল অনুসরণ করতে।

বুকে হেঁটে জানালার কাছে এগিয়ে চলল দুজনে। জানালার কাছে পৌছে দুই পাশের দেয়াল ঘেঁষে উঠে বসল। খড়খড়ির দড়ি খুলে দিল। ঝপ করে নেমে এল জানালার খড়খড়ি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'মুসা, উঠতে পারো এবার। জানালার দিক থেকে সরে থাকো। মনে হচ্ছে, তোমাকেই ওর লক্ষ্য। বলা যায় না, দেখতে না পেয়ে খেপে গিয়ে আন্দাজে গুলি চালানো শুরু করতে পারে লোকটা।'

উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিতে লাগল মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পরের বার মিস্ত্রি উইকএন্ডের কথা শুনলেই সেলাম। বাগানে বসে বরং বদখত আগাছা সাফ করব। তা-ও আর চোরের অভিনয় করতে আসব না।'

কিন্তু তার দিকে নজর নেই আর কিশোরের। জানালার দিকে মুখ। ঝুঁকি নিয়েও দেখার চেষ্টা করছে বাইরে।

'সাবধান!' রবিন বলল। 'লোকটার নিশানা কিন্তু যথেষ্ট ভাল।'

খড়খড়ির একটা কোনা ধরে নাড়া দিল সে। অপেক্ষা করল। গুলি হলো না দেখে আস্তে করে কোনাটা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। 'লম্বা একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি,' জানাল সে। 'সম্ভবত ওটার আড়ালে থেকেই গুলিটা করেছে সে। তবে এখন নেই।'

'ভালমত দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লুকানোর ওই একটা জায়গাই দেখতে পাচ্ছি। তারমানে আমরা নিরাপদ।'

'আপাতত,' রবিন বলল।

মুসার দিকে তাকিয়ে টাইপরাইটারের প্রসঙ্গ টেনে আনল আবার কিশোর। 'কাকে দেখেছ নিয়ে যেতে?'

'জন ম্যাক্‌করমিক,' মুসা বলল। 'এলান গেছে তখন আমার রূমের চাবি আনতে। এ সময় জন এসে মেশিনটা তুলে নিয়ে গেল। বিড়বিড় করে এলানকে গালাগাল করছিল, দোতলায় মাল পৌছে দিয়ে আসার জন্যে পেকসকে পাঠাচ্ছে না বলে।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'জনের তাহলে একটা টাইপরাইটার আছে!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'পোর্টেবল। পুরানো। কেসটার অবস্থা কাহিল, প্রচুর টেপটুপ খাওয়া।'

'পুরানো বলেই শিফট খারাপ,' রবিন বলল।

উঠে গিয়ে বিছানার কিনারে বসল কিশোর। প্যান্টের উরুতে হাত মুছে নিয়ে ঘনঘন চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে। 'আরেকটা সূত্র পাওয়া গেল।'

'কি করবে, ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এখন তো বোঝা গেল, জিনার নোটটা কে লিখেছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, বোঝা যায়নি। জনের টাইপরাইটার আছে বলেই

প্রমাণ হয় না, সে লিখেছে। আর ওটা দিয়েই লেখা হয়েছে কিনা, সেটাও জানা বাকি।'

'কিভাবে জানবে? তাকে তো আর জিজ্ঞেস করা যাবে না, এই মিয়া জন, এই লেখাগুলো তুমি লিখেছ নাকি?'

'না, যাবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসা যায়। মেশিনটা দিয়ে কয়েকটা বাক্য টাইপ করে আনতে পারলে ভাল হত।'

'চলো, চুপচাপ গিয়ে ঢুকে পড়ি তার ঘরে,' পরামর্শ দিল রবিন।

'সে-ও যদি তখন ঘরে ঢোকে?' মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

সতর্ক হয়ে গেল মুসা। 'আরি! আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

'একটা কাজ করতে পারবে?'

'দেখো, এখনও গুলির শব্দ যায়নি আমার কানের কাছ থেকে। আবার সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটুক, তা-ই চাও?'

'গোয়েন্দাগিরি করতে এলে ঝুঁকি তো থাকবেই,' কিশোর বলল।

'তা তো থাকবেই,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'তোমাদের ঘরে এলাম আরাম করে নিশ্চিন্তে বসে একটু কথা বলতে, এখানেও শান্তি নেই। ঝুঁকি তো সবখানেই।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'আমি যা করতে বলব, সেটা না করলে ঝুঁকি বাড়বে ছাড়া কমবে না।'

'কেন?'

'কারণ, শত্রু ধরাও পড়বে না, এখান থেকে আমাদের বেরোতেও দেবে না পুলিশ; সুযোগ মত এসে ভাল করে নিশানা করে আমাদের মেরে রেখে যাবে রাইফেলধারী স্নাইপার।'

'খাইছে! এ ভাবে তো ভাবিনি! কি করতে বলো আমাকে? জনের ঘরে ঢুকে...'

'না, সেটা তোমার করা লাগবে না,' কিশোর বলল। 'তোমার কাজটা সহজ। নিচে নেমে জনকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে আড্ডা জমাবে। আসতে যেন না পারে। প্রয়োজনে তর্কও বাধাতে পারো,' হাসল কিশোর। 'ঝগড়া শুরু করে দিতে পারো। যা মন চায় তোমার কোরো, কেবল ওপরে আসতে দেবে না। আমরা গিয়ে এই সুযোগে ওর টাইপরাইটারটা দেখে চলে আসব।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে। 'এ কোন কাজ হলো নাকি। খামোকা ভয় পাচ্ছিলাম। এমন ঝগড়া শুরু করব তার সঙ্গে, সারাদিনেও উঠতে চাইবে না। জানো না বোধহয়, মানুষকে রাগিয়ে দিতে আমি ওস্তাদ।'

মুসার কথার ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। মুসাও যোগ দিল তাতে।

'আমরা আসছি তোমার পেছন পেছন,' কিশোর বলল। 'দেখতে, সত্যি তুমি আটকাতে পারলে কিনা জনকে। তারপর চুপচাপ আবার উঠে চলে আসব ওপরতলায়। বুদ্ধিটা কেমন মনে হচ্ছে?'

'অতি চমৎকার!' স্বীকার করতে বাধ্য হলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

পারলারে পাওয়া গেল জনকে। টেলিভিশন দেখছে। হলে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর আর রবিন, ওর চোখের আড়ালে। এগিয়ে গেল মুসা।

'এখানে বসে বসে কি করছ, জন?' মুসাকে জিজ্ঞেস করতে শুনল দুজনে। 'আমি তো ভেবেছিলাম, সবার মত তুমিও গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছ।'

'করে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জন। 'অপরাধী কারা, জানাই তো আছে আমার। আমি বসে আছি, সুযোগের জন্যে। আসুক সুযোগ, ক্যাঁক করে টুঁটি চিপে ধরব।'

'এতই সোজা?'

'সোজা না তো কি···!'

হলে দাঁড়িয়ে রবিনের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল কিশোর। মুচকি হেসে বলল, 'আটকে ফেলেছে। চলো।'

নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো আবার দুজনে। দোতলায় উঠে দেখল, জনের ঘরে ঢুকছে কাজের বুয়াটা।

'ভালই হলো! একটা টেপ নিয়ে এসোগে, জলদি!' রবিনকে বলল কিশোর। 'আমার সুটকেসে পাবে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটাও আনবে।'

বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে এল রবিন। টেপটা হাতে নিয়ে জনের ঘরে উঁকি দিল কিশোর।

হাতে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যেতে দেখল বুয়াকে।

স্ট্রাইকার*প্লেটের ওপরে টেপ আটকে দিল কিশোর। যাতে বুয়া বেরিয়ে এসে দরজা লাগালেও তালাটা না আটকায়। তারপর রবিনকে নিয়ে ফিরে এসে নিজেদের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পরেই জনের ঘর থেকে বেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকতে শুনল বুয়াকে। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপচাপ এসে দাঁড়াল জনের দরজার সামনে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। টেপটা খুলে নিল সে। ভেতরে ঢুকল দুজনে।

'দারুণ বুদ্ধি করেছিলে!' রবিন বলল।

'চুপ করে থাকো। এখন কথা বলার সময় নয়।'

ঘরের চারপাশে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের চঞ্চল চোখ। টাইপরাইটারটা দেখতে পেল ছোট রাইটিং টেবিলের ওপর।

দুজনেই এগিয়ে গেল ওটার দিকে। টেপ খাওয়া ঢাকনাটা মেশিনের ওপর থেকে সরাল কিশোর। জ্যাকেটের পকেট থেকে এক তা সাদা কাগজ বের করে রোলারে ঢোকাল। 'জিনার মেসেজে যা লেখা ছিল, সেই কথাগুলোই লিখব।'

লিখতে সময় লাগল না। কাগজটা বের করে মিলিয়ে দেখে নিল সে। অবিকল এক।

'এবার পেয়েছি ব্যাটাকে!' বলে উঠল রবিন। 'জনই লিখেছিল ওই হুমকি দেয়া নোট।'

'ও লিখেছে কিনা শিওর না,' কিশোর বলল। 'তবে এই মেশিন দিয়ে লেখা

হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনের একজন সাহায্যকারী থাকতে পারে। নকল বোরম্যান, কিংবা এলান।'

ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন। 'দেখব নাকি, আর কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছে কিশোর। কিন্তু লোভ সামলাতে পারল না। 'দেখা যেতে পারে। তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

একই দিকে রওনা হলো দুজনে। আলমারীর দিকে।

'বাহ্, দুজনের একই দিকে রোখ,' হাসল কিশোর।

'তাই তো হবে,' রবিনও হাসল। 'জনের জুতোর তলার প্যাটার্ন দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।'

দুই জোড়া জুতো পাওয়া গেল জনের আলমারীতে; এক জোড়া ব্ল্যাক ড্রেস লোফার, আরেক জোড়া স্নীকার। স্নীকার জোড়া তুলে নিয়ে সোল পরীক্ষা করল কিশোর। তারপর উঁচু করে ধরল রবিনের দেখার জন্যে।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ, ওয়্যাফল-গ্রিড!'

'সাইজেও মনে হচ্ছে ঠিক আছে,' কিশোর বলল।

অবাক লাগছে রবিনের। 'তারমানে সব কিছুর পেছনে জনের হাত ছিল...'

'এবার পেয়েছি বাগে!' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ভীষণ চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। মনে হলো, বাজ পড়ল মাথায়।

দরজায় দাঁড়ানো জন। তার পেছনে এলান, হাতে উদ্যত পিস্তল।

'এবার পেয়েছি কায়দামত,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল জন। 'চুরি করতে ঢুকেছিলে, না?' এলানের দিকে তাকাল। 'কি বলেছিলাম!'

'তাই তো দেখতে পাচ্ছি,' নিষ্ঠুর হাসি হেসে পিস্তলটা কিশোর আর রবিনের মাঝামাঝি জায়গায় তাক করল এলান, যাতে নড়লেই গুলি করতে পারে। 'খুব ভাল হলো। এ ভাবে হাতেনাতে ধরতে পারব, কল্পনাই করিনি।'

জনের দিকে তাকাল কিশোর। রাগত স্বরে বলল, 'খুব ভাল করেই জানেন, আপনার ঘর থেকে কিছু নিইনি আমরা।'

হেসে উঠল জন। 'কিন্তু পুলিশ জানে না। ওদের খাতায় এখনও তোমরা সন্দেহমুক্ত নও। তার ওপর হাতেনাতে ধরা পড়লে আমার ঘরে চুরি করতে এসে। সাক্ষি থাকলেন মিস্টার উইকেড।'

নিষ্প্রাণ একটা হাসি দিল এলান। 'বহুকাল জেলে পচানোর জন্যে যথেষ্ট

রবিন বলল, 'আমাদের কাছেও এমন কিছু জিনিস আছে, যেটা প্রমাণ করবে ইভার ঘরে চুরি করতে ঢুকেছিল জন।'

'তাই নাকি?' হাসি মুছল না জনের। 'পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। করবে আমাদের কথা।'

'আপনি আমাদের ফাঁসিয়েছেন, জন,' শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর। 'সেটা আমরা যেমন জানি, আপনিও জানেন।'

'বুঝতে তাহলে পেরেছ,' সদম্ভে বলল জন। 'তবে অনেক দেরি করে ফেললে। তোমাদের মত বদ্ধিমান তিন টিকটিকি আমার ফাঁদে ধরা দেবে কল্পনাই

করতে পারিনি! সত্যি, নিজের ক্ষমতার জন্যে গর্বই লাগছে।'

'কেন করলেন এ কাজ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমাদের এ ভাবে ফাঁসিয়ে দিয়ে লাভটা কি হলো আপনার?'

'লাভ! ব্যারনের কথা মনে আছে?' জনের কণ্ঠে চাবুকের মত আছড়ে পড়ল যেন প্রশ্নটা।

'ব্যারন!' কিশোর বলল, 'ব্যারন মানে সেই যে ক্রিমিন্যালদের নেতা, রুয়ানডার ডিগনিটি এমপরার? শয়তানে আগুন জ্বালায়—এ ভয় দেখিয়ে...'

'হ্যাঁ, সেই ব্যারন,' বাধা দিয়ে বলল জন। 'সে আমার ভাই। এখন জেলে পচছে। তোমাদের কারণে।'

'ব্যারন আপনার ভাই?' অবাক হলো রবিন।

'হ্যাঁ। আমার ভাই।'

'সে-জন্যেই আপনি আমাদের পেছনে লেগেছেন?' কিশোর বলল। 'প্রতিশোধ?'

'হ্যাঁ,' জন বলল। 'সময় নিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করেই আমি এগিয়েছি। প্ল্যান সাজিয়েছি। যাতে কোনভাবেই মুক্তি না পাও তোমরা। প্রথমে ভাইয়ের জেল হবার খবরটা শুনে এত রাগা রেগেছিলাম, মনে হয়েছিল, পিস্তল নিয়ে ছুটে এসে গুলি করি। কিন্তু তাতে চিরকালের জন্যে আমারও জেল হয়ে যেত। শেষে মাথা ঠাণ্ডা করলাম। মনে হলো, আমি জেল খাটব কেন? তারচেয়ে তোমাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে জেলে যাওয়ার মজাটা টের পাওয়ালেই তো পারি।'

'এ কাজটা আপনার কাছে ন্যায় মনে হয়েছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ন্যায় মানে? রীতিমত কাব্যিক,' জন বলল। 'চুরির দায়ে তোমরা তিনজন জেলে যাবে, তিন গোয়েন্দার খ্যাতি চিরকালের জন্যে ধুলোয় মিশে যাবে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে তোমাদের বাবা-মায়ের, এরচেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? ভাবনাটা পাগল করে তুলেছিল আমাকে, কাজে পরিণত করার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম।' শয়তানিতে ভরা সন্তুষ্টির হাসি ফুটল জনের ঠোঁটে।

'নকল বোরম্যানের অভিনয় করেছিল কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওয়াগনার,' জন বলল। 'আমাদের পারিবারিক বন্ধু। ভাইয়ের সঙ্গে জেলে দেখা হয় তার। বন্ধুত্ব হয়। প্যারোলে বেরিয়ে আসে। জেলে থাকতেই আমার ভাইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে, বেরিয়ে এসে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে।'

'হুঁ, বুঝলাম,' রবিন বলল। 'ওয়াগনার জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দুজনে মিলে আলোচনা করে আমাদের ফাঁসানোর বুদ্ধি বের করেছেন।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল জন। এলানকে দেখিয়ে বলল, 'এলান আমার ভাইয়ের কাছে কিছুদিন কাজ করেছিল। সেফের তালা ভাঙতে তার মত ওস্তাদ খুব কমই আছে। শুনলাম, জেল থেকে বেরিয়ে মাউনটেইন ইনে চাকরি নিয়েছে সে। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। ভাবলাম, তাকে কাজে লাগাব। তার সাহায্য পাব জেনেই তোমাদেরকে এই হোটেলে এনে ফাঁসানোর বুদ্ধিটা করলাম।'

'এই এলাকার হোটেল-ডাকাতিগুলোর জন্যে তাহলে আপনারাই দায়ী?'

জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, সেটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মত,' স্বীকার করল জন। 'কয়েকটা কাজ হয়েছে তাতে। ডাকাতির তদন্ত করার কথা বলে তোমাদের আগ্রহী করা গেছে। সেই সঙ্গে নগদ কিছু টাকাও এসেছে আমাদের হাতে। এলানকে যখন পেয়েই গেলাম, টাকা রোজগারের ধান্দাটা ছাড়ব কেন? জানি তো, শেষ পর্যন্ত সব দোষ চাপবে তোমাদের ঘাড়ে। আমরা মুক্ত পাখি।'

'তাহলে মিস্ট্রি উইকএন্ডের আর কি দরকার ছিল?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'একটা কারণ, তোমাদের জন্যে টোপ দেয়া।'এ ধরনের একটা খেলার কথা শুনলে লাফিয়ে উঠবে তোমরা। সঙ্গে সঙ্গে আসতে রাজি হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কারণটা হলো অনেকের মাঝখানে পানি ঘোলা করে পুলিশের নজর অন্য দিকে সরানো।'

'হুঁ! রকি বীচ থেকেই অনুসরণ করে এসেছেন আমাদের,' কিশোর বলল। 'মোটর সাইকেলে করে। আর আমরা গাধারা হাঁটতে হাঁটতে এসে আপনাদের ফাঁদে ধরা দিয়েছি!' নিমের তেতো ঝরল কিশোরের কণ্ঠ থেকে।

'হেঁটে কি হে?' অট্টহাসি হাসল জন। 'বলো, লাফিয়ে এসে পড়েছ।'

'আমার মাথায় বাড়ি মেরেছিল কে?' জানতে চাইল রবিন।

'ওয়াগনার,' জন বলল। 'তবে ইচ্ছে করে মারেনি। একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল, বেহুঁশ না করে আর কোন উপায় ছিল না বেচারার।'

'আমার খাবারে বিষও নিশ্চয় আপনিই মিশিয়েছিলেন,' জনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'বোঝাতে চেয়েছিলেন, যেন এখানে আমাদের আসাটা বিশেষ কোন একজনের পছন্দ নয়। মাকড়সাটা ছেড়ে দিয়ে এসেছিল এলান, ওই একই কারণে। জিনাকে সেদ্ধ করতে চেয়েছিল।' জনকে জিজ্ঞেস করল সে, 'এ সব খোঁচাখুঁচিগুলো কেন করেছিলেন? আমাদের নজর ভিন্ন দিকে সরিয়ে রাখার জন্যে?'

'না, তোমাদের জেদ বাড়ানোর জন্যে,' জন বলল। 'আমি বুঝে গিয়েছিলাম, যতই এ সব করতে থাকব, তোমরাও গোঁয়ারের মত রহস্য ভেদের চেষ্টা করতে থাকবে। আর করতে করতেই এমন কোন ভুল করে বসবে, যাতে আমাদের সুবিধে হয়–এই যে এখন যেটা করলে।'

'জানালা দিয়ে গুলি চালিয়েছিল কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল এলান। 'আমি করেছি। চাইলে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু চাইনি। শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদের।' নিজের হাতের পিস্তলটার দিকে ইশারা করে বলল, 'তবে এখন আর শুধু ভয় দেখাব না...'

হঠাৎ দরজায় এসে উদয় হলো মুসা। এলান আর জনের পেছনে। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি! ওকে ব্যস্ত রাখার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু এলান এসে ডেকে নিয়ে গেল...'

ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেল এলান। আর তার এই মুহূর্তের ভুলটার সদ্ব্যবহার করে ফেলল কিশোর। পা উঁচু করে কারাতের এক লাথিতে পিস্তলটা ফেলে দিল এলানের হাত থেকে। খটাং করে মেঝেতে পড়ল পিস্তলটা।

কিশোর আবার সোজা হবার আগেই লাফ দিয়ে সামনে চলে এল জন। কিশোরকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। শুরু হলো গড়াগড়ি, ধস্তাধস্তি।

পেছন থেকে এলানকে জাপটে ধরল মুসা। এক হাত মুচড়ে পেছনে নিয়ে এল পিঠের ওপর, আরেক বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে শুরু করল। ভয়ানক প্যাঁচ। দম আটকে গেল এলানের।

এই সুযোগে মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রবিন। ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার! কেউ কিছু করতে যাবেন না আর। জন, উঠে আসুন।'

কিন্তু কিশোরকে ছাড়ল না। প্রচণ্ড আক্রোশে ঘুসি মারতে লাগল শরীরের যেখানে সেখানে।

হুমকি দিল আবার রবিন। কিন্তু শুনল না জন। বুঝে গেছে, যত যা-ই করুক, গুলি অন্তত করবে না রবিন।

কিন্তু দরজার কাছ থেকে যখন আরও একটা কণ্ঠ গর্জে উঠল, গুরুত্ব না দিয়ে আর পারল না জন।

পনেরো

পেকস এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা শটগান। পাশে দাঁড়ানো আসল মিস্টার বোরম্যান।

'তোমাদের কথা সব শুনেছি আমরা,' পেকস বলল। ধমকে উঠল, 'এলান! জন! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। সামনের দেয়ালটার কাছে গিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে। যাও!'

এলানকে ছেড়ে দিল মুসা।

নির্বিবাদে আদেশ পালন করল দুই অপরাধী।

হাসিমুখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল পেকস। 'একেই বলে দাবার ছক পাল্টে যাওয়া। কি বলো?'

'আপনারা কি জানতেন, আমাদের ফাঁসানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হেসে এগিয়ে এসে রবিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন মিস্টার বোরম্যান। 'স্বীকার করছি, প্রথমে তোমাদের বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু পেকস আমাকে বোঝাল। তখন ভাবলাম, যে ভাবে চলছে, চলতে থাকুক। নিজেদের গরজেই গোয়েন্দাগিরি করে আসল অপরাধীকে ধরে ফেলবে তোমরা। গোয়েন্দা হিসেবে সত্যি তোমাদের তুলনা হয় না। অকারণে বিখ্যাত হওনি।'

'আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ কুখ্যাত হয়ে,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর।

কিশোরের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন মিস্টার বোরম্যান। 'শুধু ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া আর কি বলব তোমাদের, বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এ এলাকার হোটেল মালিকদের একটা মস্ত উপকার করলে তোমরা। ডাকাতির রহস্য ভেদ করে, ডাকাতদের ধরে দিয়ে।'

'সব ঠিকঠাক মত শেষ হওয়ায় আমাদেরও এখন খুব খুশি লাগছে,' কিশোর

বলল।

পেকস বলল, 'মিস্টার বোরম্যান, পুলিশকে খবর দিন। বলুন, ওদের জন্যে দুটো উপহারের ব্যবস্থা করেছে ডিটেকটিভ পেকস।'

'ডিটেকটিভ?' অবাক হয়ে পেকসের দিকে তাকাল কিশোর।

ওয়ালেট খুলে ব্যাজ বের করে দেখিয়ে দিল পেকস। 'এখানে ছদ্মবেশে চাকরি নিয়েছিলাম আমি, ডাকাতিগুলো শুরু হওয়ার পর। আমি জানতাম, পুলিশের খাতায় এলানের রেকর্ড আছে। তার ওপর নজর রাখার জন্যেই এখানে কাজ নিয়েছিলাম আমি। সন্দেহ হলেও বুঝতে পারছিলাম না, সে এ সবের পেছনে আছে কিনা।'

'তা তো হলো,' রবিন বলল, 'কিন্তু জনের দোস্ত বুড়ো ওয়াগনারটার কি হবে? সে তো এখনও মুক্ত।'

হাসল পেকস। 'থাকবে না বেশিক্ষণ। এতক্ষণে তাকে ধরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুলিশ। তার পেছনে যে পুলিশ লেগে গেছে, সেটাও জানে না সে। কাজেই ধরা পড়তে দেরি হবে না।'

*

কিছুক্ষণ পর, জন আর এলানকে যখন ধরে নিয়ে গেল পুলিশ, জিনা আর মুসার দিকে ফিরল কিশোর। স্বস্তি দেখতে পেল ওদের চোখে। হেসে বলল, 'প্রাণ খোয়ানোর মত বহু বিপদে পড়েছি জীবনে। কিন্তু ইজ্জত খোয়ানোর অবস্থা এই প্রথমবার হলো। বাঁচলাম বহু কষ্টে।'

সেদিনই, আরও পরে, লবিতে জমায়েত হলো সবাই। বহু প্রশ্ন জমা হয়ে আছে তাদের মনে। জানার জন্যে উন্মুখ। কাজেই তাদেরকে পারলারে এসে বসতে অনুরোধ করল কিশোর।

'যতটা মনে করেছিলাম, তারচেয়ে অনেক বেশি জটিল আর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এই মিস্ট্রি উইকএন্ডটা,' কিশোর বলল। 'মজার ব্যাপার হলো, রহস্যের অর্ধেকটা ভুয়া, বাকি অর্ধেকটা আসল।'

'পরিকল্পনাটা কার?' জানতে চাইল ইভা।

হাসল কিশোর। 'ভুয়া রহস্যটা আমাদের বানানো—আমি, রবিন, মুসা আর জিনা বসে বানিয়েছি। আমাদের ভাড়া করে আনা হয়েছিল একটা নকল রহস্যের জন্ম দিতে। তা-ই দিয়েছিলাম। জায়গায় জায়গায় সূত্রও ফেলে রেখেছিলাম।'

'তাই তো বলি!' ইভা বলল। 'আমার ক্যামেরা আর ঘড়ি চুরিটাও তাহলে ভুয়া?'

'না, ওটা আসল,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনার জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। চোরগুলোকে যেহেতু ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জিনিস আপনি পাবেন।'

'তারমানে সত্যি ডাকাতি হয়েছিল আমার ঘরে!' চিৎকার করে বলতে গিয়েও কণ্ঠস্বর তাড়াতাড়ি খাদে নামিয়ে ফেলল ইভা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগল তার। জিজ্ঞেস করল, 'এই আসল ডাকাতিটা কার কাজ?'

'এলান।' কি ভাবে কি ঘটেছে খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে তাকে কথা

জুগিয়ে দিল মুসা আর রবিন।

'বার্গলার কিটটা কে রেখেছিল তোমাদের ঘরে?'

'ওয়াগনার। আস্তাবলে লুকিয়ে থাকত সে। পুরো অপারেশন পরিচালনা করছিল ওখানে থেকে। তাকে সহায়তা করত জন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'আমার ঘরে চুরুটের ধোঁয়ার রহস্যটা ভেদ হলো এতক্ষণে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'ভুল করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল ওয়াগনার। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা আমাদের ঘরে রাখতে চেয়েছিল। যখন বুঝল, ওটা তোমার ঘর, সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল।'

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ফিলিপ। সঙ্গে দুজন পুলিশ অফিসার। মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে আপনার চোর, অফিসার। অ্যারেস্ট করুন ওকে। জিনার হারটা ও-ই চুরি করেছে।'

কেউ বাধা দেবার আগেই এসে মুসার হাত মুচড়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল দুই অফিসার।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'এটা কি করলেন?'

'ভেবেছিলে, পার পেয়ে যাবে,' সাফল্যের হাসি হাসল ফিলিপ। 'অত সহজ না। ফিলিপের কাছ থেকে মুক্তি নেই। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে কেমন ধরে ফেললাম, দেখলে তো?' খালি একটা ক্যান্ডির বাক্স বের করে দেখাল সে। 'এটাই তোমার কাল হলো। সবচেয়ে বড় সূত্র।'

তাকিয়ে আছে সবাই ওর দিকে। শোনার জন্যে।

সবার মুখের দিকে এক এক করে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, 'জিনার ঘরে পেয়েছি এটা। তোমার ভোজনপ্রীতি আমার নজর এড়ায়নি। খাবারের প্রতি অতিরিক্ত লোভ তোমার জারিজুরি আজ সব খতম করে দিল। প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার, তোমার ওপর। জিনার হারটা চুরি করার সময় ক্যান্ডির বাক্সটা নজরে পড়েছিল তোমার। লোভ সামলাতে না পেরে খেয়ে ফেলেছিলে সব। জিনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছে, একটা ক্যান্ডিও ছুঁয়ে দেখেনি সে। তাহলে কে খেল? বুঝলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ না।'

হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। জিনাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ ফিলিপ। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল ভুলটা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও! তারমানে বলতে চাইছ, ভুয়া রহস্য ছিল ওটা? তোমরা চেয়েছিলে, খালি বাক্সটা পেয়ে গিয়ে আমি মুসাকেই সন্দেহ করি?'

হাসতে শুরু করল সকলে।

উঠে গিয়ে ফিলিপের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'তবে রহস্যটা আপনি ঠিকই ভেদ করে ফেলেছেন, ফিলিপ। সত্যিকারের জবাবটাই জেনেছেন। আসল হলে মুসার জেল খাটা এখন কেউ ঠেকাতে পারত না।'

হাসল ফিলিপ। তবে উজ্জ্বল নেই আর হাসিটা। বলল, 'হ্যাঁ, ভুয়া অপরাধের শুদ্ধ সমাধান!'

হাসল কিশোর। 'দুঃখ কেন, ফিলিপ? টাকা তো দিয়েছিলেন সাজানো অপরাধ সমাধান করার জন্যেই। আসল না হওয়াতেই কি এত হতাশা?'

অবশেষে হাসি ফুটল ফিলিপের মুখে। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। যাই হোক, পয়সাটা তো উসুল হলো। তা ছাড়া, গোয়েন্দা হিসেবে আমি যে খুব ভাল, প্রমাণ হয়ে গেল সেটাও।'

–: শেষ :–

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০